তটিনী তরঙ্গে

প্রফুল্ল রায়

মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

দ্বিতীয় মুদ্রণ, ভাদ্র ১৩৭২

—ছ টাকা—

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও ক্যাশ প্রেস, ৬৩।বি মদন মিত্র লেন, কলিকাতা ৬ হইতে শ্রীপ্রভাতকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত

রমাপদ চৌধুরী

শ্রদ্ধাস্পদেষু

কথামুখ

রূপের হাট ঘরে ঘরে। রসের হাট মনে মনে।

কিন্তু অপরূপের হাট! সে কোথায়? সে কেমন?

রসিক সুজনেরা বলে অপরূপের হাট।

এ নাম কিন্তু আদৎ না। এ জায়গাটার সাবেক নাম ছিল অন্য, হাল আমলেরও একটা নাম আছে।

মোগল-পাঠানের আমলে এর নাম ছিল শাহী বাজার। তার আগের কথা কেউ জানে না। ফরাসী আমলে এর নাম হল ফরাসী বাজার। ইংরেজ এসে নাম বদলে দিল ইংলিশ বাজার। এখন এর নাম রানীর হাট।

সব নাম ছাপিয়ে রসিক সুজনদের সেই নামটাই মনে ধরে। অপরূপের হাট!

অপরূপের হাট! বাহারের নাম।

এ জায়গাটা যে কোথায়, ইতিহাস ভূগোলে তার হদিস নেই, পুঁথিপুরাণে তার উল্লেখ নেই।

তবু এ জায়গাটা আছে।

এর শিয়র ঘেঁষে গেরুয়া জলের একটি নদী আছে, যার নাম রূপসী। এখানে পাঠানের বরুজ-গম্বুজ আছে, মোগলের মিনার আছে, ফরাসীদের গির্জে আছে, ইংরেজের কেল্লা আছে।

এখানকার নামমাহাত্ম্য যত, স্থানমাহাত্ম্য তার চেয়ে তিল পরিমাণ কম নয়।

পুঁথিপুরাণে এর কথা না থাক। তবু অপরূপের হাটকে নিয়ে এখানকার মানুষগুলোর গরিমার শেষ নেই। বিশেষ করে সিদ্ধিনাথ পাড়ুইর।

সিদ্ধিনাথ পুরনো কালের মানুষ। দুটো হাঁটুর ফাঁকে পাকা মাথাটা গুঁজে সে চোখ বোজে। চোখ বুজলেই সে মোগল-পাঠান, ইংরেজ-ফরাসী—পুরো অতীতটাই দেখতে পায়। চোখ বুজেই সে স্মৃতির তাপ পায়। স্মৃতির উত্তাপ বড় মধুর, বড় সুখ-স্বাদ। কুহেলীবিলীন অতীত থেকে অতি সন্তর্পণে খণ্ড খণ্ড ঘটনা, টুকরো টুকরো কাহিনী তুলে আনে সে।

বিড় বিড় করে সিদ্ধিনাথ বকে যায়, 'বুঝলে বাপ, এখেনে মোগল-পাঠান তাঁবু ফেলেছে। ফরাসী-ইংরেজে লড়াই হয়েছে। সে কি যে সে লড়াই, যেন সুন্দর-উপসুন্দর যুদ্ধু। আমার ঠাকুদ্দা সে যুদ্ধু নিজের চক্ষে দেখেছে।'

একটু দম নিয়ে আবার শুরু করে, 'একি যে সে জায়গা, দু পুরুষ আগে জন্মালে দেখতে, ইংরেজের কেল্লায় গড়ের বাদ্য বাজছে। চারপুরুষ আগে জন্মালে দেখতে, ফরাসী পাদ্রী সায়েবরা লোক ধরে ধরে খেরেস্তান (খ্রীষ্টান) করছে। আট-দশ পুরুষ আগে জন্মালে মোগল-পাঠানের তাঁবুই দেখতে পেতে। এ কি যে সে জায়গা মানিক, এখেনে কত মানুষ এয়েছে। শুধু কি এয়েছে; এসে ডুবেছে, মজেছে। এ যে অপরূপের হাট গো।'

এখানে কত রকমারি মানুষ এসেছে, লেখাজোখা নেই। মোগল-পাঠান এসেছে। তার আগে কারা এসেছিল, সে কথা সিদ্ধিনাথ জানে না। ফরাসী এসেছে। ইংরেজ এসেছে। গোরা সৈন্য এসেছে। পাদ্রী সাহেব এসেছে। আরো কত মানুষ যে এসেছে, কে তার হিসাব রাখে?

সাবেক আমলে যারা এসে এই অপরূপের হাট বসিয়েছিল, একে একে তারা বিদায় নিয়েছে। সময়ের বোঁটা থেকে যারা খসে পড়েছে কোন দিনই তাদের আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাদের সঙ্গে সঙ্গে তাদের যত দম্ভ, যত মাহাত্ম্য, যত মহিমা, সব গিয়েছে। আবছা একটি অতীত আর ক্ষীণ স্মৃতি ছাড়া কিছুই তারা রেখে যেতে পারে নি।

মোগল-পাঠান গিয়েছে।

তাদের বরুজ-গম্বুজ-মিনারগুলি ভেঙে ভেঙে পড়েছে। কাল তাদের স্মৃতিকে, অতীতকে, কীর্তিকে কিছুই দেয় নি। দিয়েছে শুধু জরা আর মৃত্যু।

ফরাসীরা গিয়েছে।

তাদের গির্জের চুড়ো ধ্বসে পড়েছে। ভাঙা গির্জের ভেতর রাত্রিবেলায় টিম টিম করে তেলের লণ্ঠন জ্বলে। বুড়ো ইংরেজ পাদ্রী হ্যালিডে সাহেব হোলি বাইবেলের পাতা উল্টোতে উল্টোতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন।

Hear the right, O Lord, attend unto my cry, give ear unto my prayer,

That goeth not out of feigned lips.

ইংরেজরা গিয়েছে।

তাদের কেল্লার ইটগুলি নোনা লেগে খসে খসে পড়েছে।

সে আমলের কেউ নেই। সে কালের সব দেউটি একে একে নিবেছে। তবু অপরূপের হাট এখনও জমে আছে।

এখন নতুন কালের নতুন মানুষ এসেছে।

রূপের হাট ভেঙে যায়। রসের হাটেরও এক-এক সময় তাল কাটে। কিন্তু অপরূপের হাট! এ হাট চিরদিন একই থাকে; একই নিয়মে জমে থাকে।

রূপ! তা সে রূপের কত বাহার! কত ঠাট!

কেউ স্বরূপ, কেউ কুরূপ, কেউ বিরূপ। কিন্তু অপরূপ? অপরূপ কোথায় মেলে?

রসের হাটে তো সবাই আনন্দ লোটে। রূপের হাটে তো সবাই সওদা করে। কেউ কেনে, কেউ বেচে। কিন্তু অপরূপের হাটে মানুষ কিসের খোঁজে আসে? কিসের লোভে? কিসের মোহে?

রূপ দেখে তো সবাই পাগল হয়। কিন্তু অপরূপকে দেখলে কী হয়, কে তার হদিস দেবে?

লোকের মুখে মুখে যে নামটা চালু, তা হল রানীর হাট। রসিক সুজনেরা বলে, অপরূপের হাট।

অপরূপের হাট কি শুধু একটা নাম, শুধু একটা স্থান? সে আরো কিছু। সে যে কি, কে তা বলে দেবে?

রূপসী নদীর পারেই কি শুধু অপরূপের হাট? অপরূপের হাট নেই কোথায়? তার বিকিকিনি, রূপের পসরা, রসের পসরা, তার মাহাত্ম্য, দীনতা, নীচতা নিয়ে স্থান কাল পার হয়ে অপরূপের হাট সব খানে সব কালে ছড়িয়ে আছে।

বাউল গেয়েছে:

ও গুরু,
ও আমার ঠাটের গুরু, নাটের গুরু,
আমার রসের গুরু, সাধের গুরু,
সেই রূপ দেখালি কই?

সারা জনম রূপ দেখলাম কত,
কেউ বা স্বরূপ, কেউ বা কুরূপ,
কেউ বা বিরূপ।

কিন্তু গুরু, সেই অপরূপ,

তারে দেখলাম কই ?

তারে পেলাম কই ?

এ কি শুধু বাউলের আক্ষেপ ! সব মানুষই তো সারা জীবন এই অপরূপকেই খুঁজে ফেরে।

অপরূপের হাট।

রসিক সুজনেরা সাধে কি আর এই নাম দিয়েছে ! অনেক বুঝে, অনেক দেখে, অনেক মজে, তবে এ নাম দিয়েছে।

কাহিনী

কে যায় ?

মালীর মেয়ে তিতাসী যায়।

যায় কৌথায় ?

নদীতে।

পরনে কালো কালো রেখ্‌কাটা হলুদ শাড়ি। শাড়িটা তিতাসীর অঙ্গে কি বশই না মেনেছে !

দেখায় কেমন ?

আজান বুড়ো এখন যদি তিতাসীকে দেখত !

বুড়োর প্রাণ যেন রসের হাট। তিতাসীকে দেখতে দেখতে তার ছানিপড়া অথর্ব পঙ্গু চোখ দুটো চিক চিক করে উঠত। চোখের উপর একটা হাত রেখে সে বলত, 'কে যায় গো ? রূপবতী, রসবতী, কোন্ যুবতী যায় ? তিতাসী না ? না না, তিতাসী না। দ্যাখ, দ্যাখ তোরা, বাঘিনী যাচ্ছে গো।'

কাঁখে টুকটুকে রাঙা মাটির কলসী।

চিকন মাজা দুলিয়ে দুলিয়ে ইংরেজদের কেল্লা ডাইনে রেখে, ফরাসীদের গির্জে বাঁয়ে ফেলে তিতাসী নদীতে চলেছে।

রূপ কেমন তিতাসীর ?

রূপ আছে বৈ কি। তার রূপে যত না বাহার, তার চেয়ে অনেক বেশী ধার, অনেক বেশী চকমকানি।

মাজা তামার মত রঙ ! সে রঙ থেকে অদ্ভুত এক জেল্লা ফুটে বেরোয়। থুতনির নীচে ছোট একটি জড়ুল। চোখের তারা দুটি ঈষৎ কটা ; অন্ধকারেও বুঝি ধিকি ধিকি জ্বলে। সুপুষ্ট দুটি বুক ; খাটো আঙিয়া তাদের বাগ মানাতে পারে না। চিকন মাজার নীচে সুঠাম, মাংসল অববাহিকা। চলার তালে তালে সেই অববাহিকা দোল খেতে থাকে।

তিতাসীর দেহটি দীঘল। দীঘলই শুধু নয়, সে দেহে কেমন এক ধরনের বন্যতা যেন মিশে আছে।

তিতাসীর রূপে চোখ জুড়োয় না; বুকের ভেতর কেমন যেন জ্বালা ধরে।

তার যত না রূপ, দেমাক তত। এই রূপের নেশায়, দেমাকের নেশায় বুঁদ হয়ে তিতাসী চলেছে।

কাল রাত্রে এদিকটায় তুমুল ঝড়বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে।

এখন কার্তিক মাস। সময়টা ঝড় তুফানের পক্ষে সুদিন নয়। তবু কি খামখেয়াল যে ভর করল নদীর উপর, আকাশের উপর!

আকাশ আর নদী ক্ষেপে উঠেছিল।

এখানে থেকে সমুদ্র খুব দূরে নয়। পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে।

আজকাল উত্তর দিক থেকে বাতাস বইতে শুরু করেছে। উত্তরের বাতাস দক্ষিণে ছুটে যায়।

অন্য অন্য দিন সমুদ্রের মাথায় যে গাঢ়, নিরেট মেঘের টুকরাগুলি জমতে থাকে, উত্তুরে বাতাস তাদের তাড়িয়ে তাড়িয়ে দক্ষিণে, আরো দক্ষিণে, সমুদ্র যেখানে আরো বড়, আরো উদার, আরো গহন এবং আরো ব্যাপ্ত হয়ে আছে, সেদিকে নিয়ে যায়।

কিন্তু কাল যে কি হল!

উত্তরের বাতাস দক্ষিণমুখী হল না। তার বদলে দক্ষিণের বাতাসই উত্তরে ছুটল। আর সেই বাতাস কাল বিকেল থেকে সমুদ্রের মেঘগুলিকে সরাসরি এখানে হাজির করতে শুরু করেছিল।

রানীর হাটের মাথায় মেঘগুলি স্তূপাকার হয়ে গেল, জমাট বাঁধল তার পর আকাশজোড়া বিরাট মৃদঙ্গটায় গুরু ঘা পড়ল।

আসল খেলা আরম্ভ হয়েছিল সন্ধ্যের পর থেকেই।

সারা রাত নদীটা ডেকেছিল। তার অথৈ অতল থেকে একটা গোঁ গোঁ গম্ভীর গর্জন ঠেলে বেরিয়ে পড়ছিল।

শুধু কি নদী, আকাশটা আড়াআড়ি ফেড়ে খাড়া ঝিলিক ছুটছিল। কড় কড় শব্দে বাজ গর্জাচ্ছিল।

নদী আর আকাশ মেতে উঠেছিল। রানীর হাটের উপর কতটা হঠকারিতা করা যায়, সম্ভবত এই নিয়ে তারা পাল্লা দিচ্ছিল।

নদীতে ষাঁড়াষাঁড়ির বান ডেকেছিল। মেঘগুলো ফুলে ফুলে ফেঁপে ফেঁপে উঠছিল আর অঝোরে বৃষ্টি ঝরাচ্ছিল।

সারাটা রাত প্রকৃতির হঠকারিতা চলল। ভোরের দিকে আকাশ শান্ত হল, নদীর আক্রোশ পড়ল।

কোমর দোলাতে দোলাতে তিতাসী চলেছে।

রাত্রির ঝড়-তুফান রানীর হাটকে নাস্তানাবুদ করে গিয়েছে।

পথের দু পাশে সারি সারি শিশু আর শিরীষ গাছ। কালকের ঝড় গাছগুলির মাথা মুচড়ে রেখে গিয়েছে।

পথঘাটের যা দশা হয়েছে!

শিশু আর শিরীষ গাছের ডালপালা, পাতা ছত্রাকার হয়ে আছে। কালকের ঝড় যত রাজ্যের ঘরের চাল, বাঁশের খুঁটি, টুকরো টুকরো টিন, শন উড়িয়ে এনে পথের উপর স্তূপাকার করে রেখেছে।

রানীর হাটের পথগুলি মেটে, কোন কোনটা সুরকির। কালকের বৃষ্টিতে মাটি আর সুরকি থকথকে হয়ে গিয়েছে।

কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই তিতাসীর।

থকথকে কাদা আর সুরকি মাড়িয়ে, ডালপালা ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে রূপের দেমাকে অস্থির হয়ে চলতে চলতে শেষ পর্যন্ত সায়েবঘাটে এসে পৌছল তিতাসী।

এখনও ঠিক সকাল হয় নি।

সূর্যটাকে আকাশের কোথাও এখন খুঁজে পাওয়া যাবে না।

কালকের জের আজও মেটে নি। আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া টুকরো টুকরো মেঘ এখনও আটকে আছে।

আশ্চর্য! নদীটাকে আজ আর চেনাই যায় না।

কার্তিক মাসের নদীতে এমনিতেই টান ধরে। ঠিক মাঝামাঝি একটা চর জাগতে শুরু করে। দু পার থেকে জল অনেকখানি নেমে যায়। দেখা দেয় বিন্নাবন, শর আর কন্টিকারির ঝোপ। কাদাখোঁচা পাখিগুলি হাঁটু পর্যন্ত ঠ্যাং কাদায় ডুবিয়ে চোখা ঠোঁট খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কি যেন খুঁজে মরে।

বছরে এক বার মাত্র ঢল নামে রূপসী নদীতে, এক বারই মাত্র যৌবন আসে। সেই বর্ষার সময়। তখন দু পার ছাপিয়ে নদী ছুটতে থাকে।

বর্ষার সেই উত্তেজনা হেমন্তে আর থাকে না। বর্ষায় যে রূপসী দ্রুতবহ, খরধার, হেমন্তে সে-ই স্থির, মন্থর, ক্লান্ত গতি। নদী তখন তির তির করে বয়। তখন তার না থাকে স্রোত, না থাকে ঢল, না থাকে মাতামাতি।

কাল সকালেও হেমন্তের নিঃস্রোত, তিরতিরে নদী দেখে গিয়েছে তিতাসী।

কিন্তু আজ?

ঝড়-তুফানের কারসাজিতে রাতারাতি নদীর চেহারাটা বদলে গিয়েছে। হেমন্তের রূপসী কি এক ভোজবাজিতে বর্ষার রূপসী হয়ে গিয়েছে।

কাল রাত্রে ষাঁড়াষাঁড়ির বান ডেকেছিল। দু তীর ছাপাছাপি করে রূপসীতে এখন ঢল নেমেছে। সেই ঢলে কত ঢলানি।

বিন্নাবন, শরঝোপ কোথায় তলিয়ে গিয়েছে। কার্তিকের প্রথম দিকে যে চরটা ফুটি ফুটি করে, এখন তার চিহ্ন পর্যন্ত নেই। এই হেমন্তে আবার যৌবন পেয়েছে রূপসী।

সায়েবঘাটের উপরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে রয়েছে তিতাসী। অবাক হয়ে নদীর দিকে তাকিয়ে আছে।

মাটি-গোলা লাল জল পাক খেতে খেতে ছুটেছে।

নদীর দিকে চেয়ে চেয়ে বুঝি বা তিতাসী ভাবে, রূপসী তো তাদের মতই যুবতী।

'তিতাসী-তিতাসী—

কে যেন ডাকল।

চমকে উঠল তিতাসী। টালুমালু করে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল।

'এই যে লো—'

গলার স্বরেই চেনা গেল, কামিনী-বৌ।

সায়েবঘাটের উপরের ধাপে দাঁড়িয়ে রয়েছে তিতাসী। একেবারে নীচের ধাপে, যেখানে নদীর জল পাক খাচ্ছে, সেখানে বসে রয়েছে কামিনী।

তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এল তিতাসী। বলল, 'হেই গো ভাই-বৌ—'

'কী বলছিস?'

'রাত থাকতেই নদীতে এয়েছিস!'

'ও লো আমার সাধের ননদী—'

তিতাসীর গালে আস্তে একটা টুসকি মারে কামিনী। তার পর নিজের থুতনিটা ঘুরিয়ে অদ্ভুত রহস্যময় গলায় হেসে ওঠে, 'রাত থাকতেই কেন নদীর ঘাটে আসি, তুই তো সবই জানিস ভাই—'

'না না, কিচ্ছু জানি না।'

'নেকী।'

খিক খিক করে হাসতেই থাকে কামিনী। হঠাৎ হাসিটা থামিয়ে দেয় সে। বলে, 'জ্বালা জুড়োতে আসি। বড় জ্বালা তিতাসী। সারা রাত যে জ্বালায় জ্বলি, পুড়ি, সে জ্বলুনি নেবাতে আসি। অঙ্গ যে খাক হয়ে যায়।'

তিতাসী কিছুই বলে না।

এবার ফিস ফিস করে কামিনী বলে, 'কিন্তুক ভাই, জ্বলুনি যে জুড়োয় না। ওপরটা যতই ডোবাই, ভেতরটা যে ততই পোড়ে। পুড়ে পুড়ে যে আঙরা (অঙ্গার) হয়ে যায়।'

কামিনীর গলাটা বড় গাঢ় শোনায়।

অনেকক্ষণ কেউ আর কিছু বলে না।

এক সময় সকাল হয়ে যায়।

আজ আবার উত্তুরে বাতাস দিয়েছে। রানীর হাটের মাথায় যে ছেঁড়া ছেঁড়া টুকরো টুকরো মেঘগুলি ভাসছিল, উত্তুরে বাতাস তাদের তাড়িয়ে তাড়িয়ে দক্ষিণমুখী নিয়ে চলেছে। এক টুকরো ঝকঝকে নীল আকাশ দেখা দিয়েছে।

সকালের প্রথম রোদ নদীর গেরুয়া জলে দোল খাচ্ছে।

কামিনী ডাকল, 'তিতাসী—'

'কি বলছ ভাই-বৌ?'

'মাথাটা পিঠটা এট্টু ঘষে দে দিকিনি। ঐ গামছায় সাজিমাটি রয়েচে।'

কামিনী পিঠ ঘুরিয়ে বসল। গামছার খুঁট থেকে সাজিমাটি বার করে কামিনীর পিঠ আর মাথা মাজতে বসল তিতাসী।

আরামে অস্ফুট একটা শব্দ করল কামিনী 'আঃ!'

বড় তরিবত করে মাথা পিঠ মেজে দিচ্ছে তিতাসী।

কামিনী বলল, 'তোর হাতটা কি ঠাণ্ডা লো তিতাসী, সব জ্বালা যে জুড়িয়ে যায়। দে, দে ভাই, আমার সব্ব অঙ্গের জ্বলুনি-পুড়ুনি নিবিয়ে দে। ভাল করে ডলে দে, মেজে দে।'

বেলা বাড়তে থাকে।

রোদের তেজও বাড়ে।

উত্তুরে বাতাসে দাপট আছে। এখন কোথাও এক টুকরো মেঘের চিহ্ন নেই। আকাশের দিকে তাকিয়ে বুঝবার যো নেই, কাল এদিকে তুমুল ঝড়-তুফান হয়ে গিয়েছে। নদীর দিকে তাকিয়ে বোঝার উপায় নেই, এই নদীতেই

কাল ষাঁড়াষাঁড়ির বান ডেকেছিল।

নদীতে আজ ঢল আছে, উজানী স্রোত আছে, কিন্তু মাতামাতিটা নেই।

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল কামিনী, 'হেই গো মা গোসানী—'

তিতাসী চমকে উঠল। বলল, 'কি হল ভাই-বৌ—'

'হুই, হুই ছাখ—'

'কোথায়, কী লো ভাই-বৌ?'

চারদিক আতিপাতি করে খুঁজতে থাকে তিতাসী। কিছুই তার চোখে পড়ে না।

টেনে টেনে সুর করে কামিনী বলে, 'চোখ থাকতে আঁধা (অন্ধ)। হুই ছাখ না লো মাগী। নজরের মাথা কী খেয়েছিস?'

একটা হাত ডান দিকে বাড়িয়ে দেয় কামিনী।

বেশ খানিকটা দূরে নদীর কিনার ঘেঁষে একটা বিন্নাবন। বিন্নাবনের ঠিক পাশেই গেরুয়া রঙের নরম কাদা থকথক করছে। সেই কাদায় কালোমত কি একটা যেন পড়ে রয়েছে।

তিতাসী ফিস ফিস করে বলল, 'ওটা কী লো ভাই-বৌ?'

'কি জানি, ঠিক বুঝতে পাচ্চি না।'

চোখের উপর একটা হাত রেখে কামিনী নিরিখ করতে থাকে। অনেকক্ষণ পর বলে, 'একটা মানুষ বলেই মনে হচ্চে।'

'হুই কাদার ভেতর মানুষ আসবে কোত্থেকে? কী যে বলিস ভাই-বৌ!'

কামিনী বলে, 'হ্যাঁ লো, মানুষই। হুই ছাখ না, মাথা, হাত, পা—মানুষের আদরাই (আদল) তো আসচে।'

তিতাসী আর কিছু বলে না। একদৃষ্টে দেখতে থাকে।

হঠাৎ কামিনী তাড়া লাগাল। তিতাসীর একটা হাত ধরে টান মেরে দাঁড় করিয়ে দিল। বলল, 'চ—'

'কোতায়?'

'হুই মানুষটাকে দেখে আসি।

'না না, আমি যাব না।'

এক ঝটকায় কামিনীর হাত থেকে নিজের হাতটা ছুটিয়ে নেয় তিতাসী।

অবাক হয়ে কামিনী বলে, 'হল কী তোর?'

'ডর লাগে।'

'ডর লাগে।'

মুখের অদ্ভুত এক ভঙ্গি করল কামিনী, 'ভরুনীর বেটির ডর ধরেচে! খুব হয়েচে। নে চ।'

'না।'

'না কি লো মাগী? দিনমান, রোদ ফুটফুট করচে। এখন ডরের কি হল!'

'মড়া না কি! কী পড়ে রয়েচে কে জানে?'

'চ না, দেখেই আসি।'

তিতাসীর কোন ওজর, কোন বাহানাই আর খাটল না। কামিনী আবার তার হাত ধরল। তারপর টানতে টানতে নিয়ে চলল।

গেরুয়া রঙের নরম কাদা। পা ফেললেই হাঁটু পর্যন্ত ঢুকে যায়।

পা টেনে টেনে বিন্না ঝোপটার কাছে এসে পড়ল দুজনে।

সায়েবঘাট থেকে কামিনী যা দেখেছিল, ঠিক তা-ই। সত্যি সত্যি একটা মানুষ।

মানুষটা চিত হয়ে পড়ে রয়েছে। পা দুটো কাদার ভেতর গাড়া। বুক, পিঠ, মাথা, মুখ—সমস্ত দেহ থকথকে গেরুয়া কাদায় মাখামাখি। মানুষটার মাথার কাছে নৌকোর ভাঙা একটা গলুই, এক টুকরো পাটাতন, এক খণ্ড পোড়া বাঁশ ছড়িয়ে আছে।

'হেই গো মা গোসানী—'

লাফ মেরে তিন পা পিছিয়ে এল তিতাসী। ভয় ভয় তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠল 'হেই গো বাপ, মড়া—'

বিচিত্র মন কামিনীর। তার ভয়ডর নেই। কোন দিকে লক্ষ্যও নেই। তার মধ্যে অদ্ভুত এক পুরুষালি আছে। নদীর পারে এদিক-সেদিক দেখতে লাগল সে। না, একটা লোকও চোখে পড়ল না।

ডান দিকে নদীর পার ধরে খানিকটা এগিয়ে গেলেই শ্মশান। শ্মশানের ঠিক উপরেই উঁচু একটা টিলা। টিলার মাথায় গোলপাতার একখানা ঘর। এই ঘরটা আজান বুড়োর চায়ের দোকান।

সেদিকেও একবার তাকাল কামিনী। কিন্তু না, দিন বুঝেই আজ আজান বুড়ো দোকান খোলে নি।

কারুকে যে ডাকবে এমন একটা লোক কোথাও খুঁজে পেল না কামিনী।

নিরাশ হয়ে চোখ দুটো নদীর পার থেকে ঘুরিয়ে আনল সে। কিছুক্ষণ একদৃষ্টে মানুষটার দিকে তাকিয়ে রইল।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে কেমন যেন মনে হল কামিনীর। আর মনে হবার সঙ্গে সঙ্গে কাদার ভেতর যতটা দ্রুত সম্ভব, পা ফেলে ফেলে মানুষটার কাছে ছুটে এল।

মানুষটার বুকের উপর একটা হাত রাখল কামিনী। হাত রেখেই চমকে উঠল। বুকটা খুব আস্তে, ধুক ধুক করে ওঠানামা করছে।

এবার হাতটা নাকের কাছে আনল। অনেকক্ষণ পর পর তির তির করে গরম নিশ্বাস পড়ছে।

কামিনী ফিস ফিস করে বলল, 'হেই গো মা গোসানী, মড়াটা জ্যান্ত যে গো।'

তিন পা পিছিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল তিতাসী। ভয়ে তার কাঁপুনি ধরেছিল। কামিনীর ফিসফিসানি সে শুনতে পেয়েছে। শোনার সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠেছে।

এতক্ষণ ভয়ে কাঁপছিল তিতাসী। এখনও সে কাঁপছে। কাঁপুনির বেগ তার বেড়েই চলেছে। তবে এখন সে কাঁপছে ভয়ে নয়, উত্তেজনায়।

কাঁপা গলায় তিতাসী বলল, 'কী বলচিস ভাই-বৌ?

'শিগগির ইদিকে আয়। মড়াটা এখনও বেঁচে রয়েচে।'

তিতাসী এগিয়ে এল। বলল, 'এটাকে নিয়ে এবার কী করবি?'

'তাই তো কী করব? মড়াটার জ্ঞান নেই, কেমন বেহুঁশ হয়ে পরে রয়েচে। এটাকে নিয়ে কী করি?'

এক মুহূর্ত কি যেন ভাবল কামিনী। কপালে আড়াআড়ি কতকগুলো দাগ ফুটে বেরুল। ভাবতে বসলেই তার কপালে এমন দাগ ফোটে।

তিতাসী আবার বলল, 'কী করবি ভাই-বৌ?'

কামিনী হচ্ছে সেই জাতের মানুষ, যারা নিমেষে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছে যায়। দৃঢ়, স্থির গলায় সে বলল, 'মড়াটা যখন আমার হাতেই এসে ঠেকেচে, তখন বাঁচাব। নিঘ্‌ঘাৎ বাঁচাব। হেই মা গোসানী, মুখ তুলে চাস মা। আমার মুখ রাখিস।'

দু হাত জোড়া করে কপালে ঠেকায় কামিনী। তার পরেই ব্যস্ত হয়ে ওঠে। তিতাসীকে তাড়া লাগায়, 'ধর না লো মাগী, মড়াটাকে ঘাটে নে যাই।'

মাথার দিকটা ধরল কামিনী, পায়ের দিকটা তিতাসী।

কাদা থেকে লোকটাকে খানিকটা তুলে কামিনী বলল, 'আপদটার হাড়ের ওজন আছে। ছেঁচা ওজন। গতর দেখচিস তিতাসী, সাতটা বাঘে খেয়ে ফুরোতে পারবে না।'

বলেই খিক খিক করে হেসে উঠল কামিনী।

তিতাসী হ্যাঁ না, কিছুই বলল না।

লোকটাকে টানতে গিয়ে দুজনে হিমশিম খেয়ে গেল। তাদের গা বেয়ে ঘাম ছুটল।

এক সময় থকথকে কাদার উপর দিয়ে টেনে হিচড়ে, হাঁপাতে হাঁপাতে হয়রান হয়ে লোকটাকে সায়েবঘাটে এনে ফেলল দুজনে।

লোকটার হুঁশ নেই, সাড় নেই। বেহুঁশ হয়ে সায়েবঘাটের সিঁড়িতে পড়ে রইল সে।

কামিনী আর তিতাসী—দুই যুবতী নদীর পার থেকে একটি পুরুষ মানুষকে কুড়িয়ে পেল।

॥ ২ ॥

পুব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ, যে দিকে তাকানো যায়, আকাশটা ধনুকের মত বেঁকে আছে। রানীর হাটের আকাশে কোথাও এখন এক টুকরো মেঘ নেই।

সূর্যটা পুবদিকের আকাশ বেয়ে অনেকটা উপরে উঠে এসেছে। রোদের তেজ বাড়ে। রূপসার জলে ছোট ছোট গেরুয়া ঢেউগুলো চিক চিক করে।

নদীর পারে সারি সারি শিশু আর কড়ি গাছ। উত্তুরে বাতাস পাক খেয়ে খেয়ে গাছগুলির মাথায় ভেঙে পড়ছে।

তিতাসী বলল, 'এবার কী করবি ভাই-বৌ ?'

'ছাখ কি করি।'

আর কথা বাড়াল না কামিনী-বৌ।

কাদামাখা বেহুঁশ লোকটা সায়েবঘাটের সিঁড়িতে পড়ে রয়েছে। তাকে নিয়ে পড়ল সে। জল দিয়ে কাদা ধুতে লাগল।

কামিনীর দেখাদেখি তিতাসীও লোকটার গা থেকে কাদা তুলতে লাগল।

কামিনী কাদা ধোয় আর বলে, 'মিনসে কাদা মেখেচে দেখ। হেথায় যেন ঘরের মাগ রয়েচে, সোহাগ করে আদর করে অঙ্গের কাদা ধুয়ে দেবে।'

বলে আর খিক খিক করে হাসে। হাসির দাপটে বুক, পিঠ, কোমর—সমস্ত দেহে ঢেউ খেলে যায় কামিনীর।

কামিনীর হাসির ধরনই যেন কেমন। সর্বাঙ্গ দিয়ে সে হাসে।

কাদা ধুয়ে দেবার পর লোকটার যে চেহারা বেরুল, তা একটি জোয়ান সুপুরুষের চেহারা। গায়ের রঙ গোরা, চওড়া বুক, নাকটা ঈষৎ থ্যাবড়া, বেশ বড় বড় দুটো চোখ, জোড়া রোমশ ভুরু। বুকের ঠিক মাঝখানে কয়েক গাছা কালো রোঁয়া।

মুগ্ধ চোখে তিতাসী তাকিয়ে আছে। মুখে কিছুই বলছে না।

কামিনীর চোখজোড়া মাছের আঁশের মত চকচক করছে। ঠিক চকচক করছে না, ধিকি ধিকি জ্বলছে। ফিস ফিস, প্রায় অস্ফুট গলায় সে বলল, 'হেই গো মা, মিনসের রূপ কি গো! এই নাক, এই চোখ, এই মুখের ছাঁদ, অঙ (রঙ)। ড্যাকরা হেথায় থাকলে জ্বলিয়ে পুড়িয়ে মারবে।'

কামিনীর গলা এত অস্ফুট যে, তিতাসী তার কথাগুলো শুনতেই পেল না।

তিতাসী কিছুই বলছে না। সে শুধু তাকিয়েই আছে।

কামিনী হল রঙ্গিনী জাতের মেয়েমানুষ।

এবার সে লোকটার বুকে পিঠে নরম হাত ডলে ডলে ঘষে ঘষে তাপ দিতে লাগল।

লোকটার জ্ঞান এখনও ফেরে নি।

বুক পিঠ ডলে ডলে তাপ দেয় কামিনী আর বলে, 'ঘরের মাগের মত কত সোহাগ কচ্চি। এবারে উঠে বস মিনসে। আর কত বেহুঁশ হয়ে পড়ে রইবে!'

তাপ পেয়ে লোকটা একটু একটু নড়তে লাগল। এতক্ষণ তির তির করে নিশ্বাস পড়ছিল। এখন জোরে জোরে শ্বাস পড়ছে।

এত যত্নের সুফল ফলেছে। এত সেবা, এত খাটুনি বিফলে যায় নি। আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল কামিনী, 'হেই গো মা গোসানী, মুখ রেখেছিস মা। মিনসে নড়চে, ড্যাকরা বেঁচেই উঠল বুঝি।'

আরো খানিকটা পর চোখ মেলল লোকটা। ঘোর ঘোর, টকটকে লাল চোখ। দু পিণ্ড রক্ত যেন জমাট বেঁধে আছে। কিছুই সে দেখতে পাচ্ছে না। কিছুই বুঝছে না। শুধু বেহুঁশ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

কামিনী ঝুঁকে পড়ল। বলল, 'এখন কেমন লাগচে গো মিনসে!'

লোকটা জবাব দিল না।

এবারও কিছু বলল না লোকটা। আগের মতই তাকিয়ে রইল।

কামিনী অস্থির হয়ে উঠল। লোকটার কাঁধ ধরে আস্তে একটা ঝাঁকানি মেরে বলল, 'কিছু বল মিনসে। চোখ মেললে, এবারে মুখ খোল। বড় গুমোর করে বলেচি, তোমাকে বাঁচাবো। বেঁচে উঠে আমার মুখ রাখো।'

বড় বড় কয়েকটা শ্বাস ফেলল লোকটা। বুকটা তোলপাড় হতে লাগল। গলা দিয়ে গোঁ গোঁ করে গোঙানির মত আওয়াজ বেরুল।

কামিনী বলল, 'হল কি তোমার? খুব কষ্ট হচ্চে?'

লোকটা চোখ বুজে ফেলেছে। অসাড় হয়ে পড়ে রয়েছে।

কামিনী ককিয়ে উঠল, 'হেই মা গোসানী, মুখ রাখলি না মা। মিনসে যে আবার চোখ বুজল। নিদেন এল না কী?'

নদীতে পা ডুবিয়ে সায়েবঘাটের এক পাশে চুপচাপ বসে রয়েছে তিতাসী। সে কিছু বলছে না। একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে সব দেখছে, সব শুনছে।

অনেকটা সময় কেটে গেল।

গেরুয়া ঢেউগুলি এখন জলছে। বাতাসটা হঠাৎ পড়ে গিয়েছে। নদীর পারের শিশু আর কড়ি গাছগুলি ঝিম মেরে রয়েছে। তুটো শঙ্খচিল ছোট ডানায় বিরাট আকাশ মাপতে মাপতে দক্ষিণ দিকে, সমুদ্র যেদিকে, উড়ে চলেছে।

এক সময় লোকটা খুব দ্রুত, ঘন ঘন, বারকয়েক শ্বাস টানল। হাঁ করে অস্ফুট, অদ্ভুত একটা শব্দ করল। তারপর তু হাতের ভর দিয়ে গোঙাতে গোঙাতে উঠে বসল।

তুই হাঁটুর ফাঁকে থুতনি রেখে লোকটার দিকে তাকিয়ে ছিল কামিনী। চমকে মুখটা তুলে পা ঘষতে ঘষতে সামনে এগিয়ে এল।

সায়েবঘাটের সিঁড়িতে ঠেসান দিয়ে আচ্ছন্নের মত বসে রয়েছে লোকটা। ঘাড় ভেঙে মাথাটা ডান পাশে কাত হয়ে আছে।

কামিনী ডাকল, 'হেই গো পুরুষ—'

প্রথম প্রথম লোকটা জবাব দিল না। অনেকক্ষণ পর ঘোর ঘোর রক্তাভ চোখ মেলে তাকাল। তাকিয়েই আবার চোখ বুজল।

কামিনী আবার বলল, 'হেই গো মিনসে, কথা কইবে তো!'

আবার চোখ মেলল লোকটা। বিড় বিড় করে কি যে বলল, ঠিক বোঝা গেল না।

এবার এক কাণ্ডই করে বসল কামিনী। লোকটার মুখ দু হাতে তুলে ধরে বলল, 'কী বলছ ?'

খুব আস্তে, দুর্বল, ক্ষীণ স্বরে লোকটা শুধলো, 'এ কোন্ জায়গা ?'

'রানীর হাট।'

'রানীর হাট! রানীর হাট!'

বিড় বিড় করে বার দুই নামটা আওড়াল। তার পর, চুটিয়ে নেশা করার পর মানুষ যেমন বুঁদ হয়ে থাকে, ঠিক তেমনি বসে রইল লোকটা।

আগের মতই জলে পা ডুবিয়ে সায়েবঘাটের এক কিনারে চুপচাপ বসে রয়েছে তিতাসী। কিছুই সে বলছে না। একদৃষ্টে কামিনী আর লোকটার রকম-সকম দেখছে।

সায়েবঘাটে এখন ভিড় লেগে গিয়েছে।

জুড়োন বুড়ী এসেছে। পলানের মাউই এসেছে। হিমি, বিন্দি, রাধীরা এসেছে। চান করতে জল নিতে এসেছে সবাই।

নদীর ঘাট ভরে গিয়েছে।

সবাই অবাক হয়ে দেখছে, তিতাসী আর কামিনী, রানীর হাটের দুই যুবতী গোরা রঙের অচেনা এক পুরুষকে নিয়ে সায়েবঘাটের শেষ সিঁড়িতে মেতে আছে।

কাঁখের কলসীটা টিপ করে নামিয়ে হঠাৎ তর তর করে নীচে নেমে এল জুড়োন বুড়ী। বলল, 'হেই লো কামিনী-বৌ, এ গোরাচাঁদ কে লো ?'

লোকটার গায়ের রঙ গোরা। তাই বুঝি জুড়োন বুড়ী রঙ্গ করে 'গোরাচাঁদ' বলল।

কামিনী বলল, 'দেখছ তো বুড়ী, এ এক মিনসে।'

'কেন গেরো পাকাচ্ছিস ? সত্যি কথাটা বল না লো। এ মিনসে কে ?'

বিচিত্র এক হাসিকে টিপে টিপে মারে কামিনী। বলে, 'এ মিনসে পরম অতন (রতন) গো।'

'মর ছুঁড়ি!'

যে হাসিটা এতক্ষণ টিপে টিপে মারছিল, এবার সেটা খিল খিল করে মেতে উঠল। সর্বাঙ্গ নাচিয়ে হেসে উঠল কামিনী।

বিরক্ত, তীক্ষ্ণ গলায় জুড়োন বুড়ী বলল, 'আ মরণ, ছুঁড়ি যে হেসেই মলি।'

'সাধে কি আর হাসি গো। ভেতর থেকে কে এক মুখপোড়া যেন দিনরাত সুড়সুড়ি দেয়।'

বলে আর হাসে কামিনী।

'খুব হয়েচে। হাসি থামা দিকিনি বাপু। তোর হাসি দেখলে অঙ্গ আমার জ্বলে যায়।'

জুড়োন বুড়ী বলতে থাকে, 'সত্যি করে বল দিকিনি, এটাকে পেলি কোতায়?'

'কাকে? তোমার এই গোরাচাঁদকে?

'হ্যাঁ লো মাগী, হ্যাঁ।'

'কুড়িয়ে পেলম গো বুড়ী—'

'আবার ঢঙ কচ্চিস?'

জুড়োন বুড়ী মুখিয়ে উঠল।

কামিনী জুড়োন বুড়ীর একটা হাত ধরে বলল, 'মাইরি বুড়ী, মিছে কথা বলচি না। তোমার বরের দিব্যি, বিশ্বাস কর। তোমার গোরাচাঁদকে কুড়িয়েই পেলাম।'

'কোতায় পেলি?

'হুই হোথায়, কাদার ভেতর বেহুঁশ হয়ে পড়ে ছেল।'

হাত বাড়িয়ে বিন্নাবনের কাছটা দেখিয়ে দেয় কামিনী।

এবার আর জুড়োন বুড়ী না, চার পাশ থেকে হিমি, বিন্দি, রাধীরা ছেঁকে ধরল।

'মিনসের নাম কি লো?'

'ঘর কোথায়?'

'এখেনে এল কেমন করে?'

কামিনী বলল, 'কিছু জানি না। এতক্ষণ তো বেহুঁশ অগ্যেন (অজ্ঞান) হয়ে পড়ে ছেল। তিতাসী আর আমি গায়ের কাদা ধুয়ে ডলে ডলে ঘষে ঘষে এই তো সবে হুঁশ ফেরালুম।'

একটু থেমে আবার শুরু করল, 'এতক্ষণ সাধাসাধি করে মিনসের মুখ থেকে একটা কথা বার করতে পেরেছি।'

জুড়োন বুড়ী বলল, 'গোরাচাঁদ কি বলেচে?'

'এই জায়গাটায় নাম জিগ্যেস করেচে।'

আরো খানিকটা সময় কাটে।

সায়েবঘাটের সিঁড়িতে আচ্ছন্নের মত বসে রয়েছে লোকটা। জুড়োন বুড়ী, কামিনী, রাধী-বিন্দি-হিমি, এরা যে এত কথা বলছে, কিছুই যেন তার কানে ঢুকছে না। কিছুই সে শুনছে না।

হঠাৎ জুড়োন বুড়ীর চোখ পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে সে আঁতকে উঠল, 'গোরাচাঁদ যে ধুঁকচে লো। শিগ্‌গির ঘরে নে চল।'

কামিনী লোকটার পিঠে আস্তে একটা ঠেলা মেরে ডাকে, হেই গো মিনসে—'

'উঁ—'

'এট্টু হাঁটতে পারবে?'

ডাইনে বাঁয়ে মাথা নাড়ল লোকটা। তাতে হাঁ না, কিছুই বোঝা গেল না।

জুড়োন বুড়ী বলল, 'গোরাচাঁদকে কোতায় নে তুলবি, হেই কামিনী-বৌ?'

কামিনী বলল, 'এখন তো আমাদের ঘরে নে যাই। মা গোসানী যেখন আমার হাতেই ফেলেচে, তেখন ভাল করেই বাঁচাই। এট্টু তাজা হয়ে উঠলে মিনসেকে দূর করে দেব।'

জুড়োন বুড়ী আস্তে আস্তে বলে, 'কথার ছিরি কি মাগীর!'

এক সময় একটা হাত ধরল তিতাসী, আর একটা হাত ধরল কামিনী। পিঠের দিকটায় ঠেকনা দিল জুড়োন বুড়ী।

তিতাসী, কামিনী, জুড়োন বুড়ী—তিন জনের উপর সারা দেহের ভর রেখে সিঁড়ি ভেঙে সায়েবঘাটের মাথায় এসে উঠল লোকটা।

রাধী-বিন্দি-হিমিরা আগুপিছু জটলা করতে করতে চলেছে।

নদী-পারের সুরকির পথ ছেড়ে সবাই মেটে রাস্তায় এসে পড়ল। ডাইনে-বাঁয়ে পিছে মোগলদের বরুজ-গম্বুজ, পাঠানদের মিনার, ইংরেজের কেল্লা, ফরাসীর গির্জে পড়ে রইল।

তিনটে মেয়েমানুষ ঠেকো দিয়ে নিয়ে চলেছে। আচ্ছন্নের মত টলতে টলতে এগুচ্ছে লোকটা।

রাত্রির বৃষ্টির দৌলতে পথগুলো কাদাময়, পিছল। পিছল পথে টাল সামলে চলা বড় দুষ্কর।

আঁকাবাঁকা অনেকগুলো মেটে পথ পেরিয়ে জুড়োন বুড়ীরা একটা বড় মাঠের সামনে এসে পড়ল। মাঠটা সবুজ নধর ঘাস আর চোর-কাঁটায় ভরা। ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে বৃষ্টির জল জমে রয়েছে। রোদ লেগে জলটা চিক চিক করে।

মাঠ পার হলেই প্রথমে যা চোখে পড়ে, তা হল বিরাট একটা ইঁটের পাঁজা। খানিকটা দূর থেকে স্তূপের মত দেখায়।

কাছাকাছি এসে নিরীখ করলে ভুলটা ভেঙে যায়। তখন ইঁটের পাঁজাটা আর স্তূপ থাকে না। একটা ঘরের আকার নেয়।

উঁচু একটা ছাইগাদার পাশ দিয়ে সরু পথ। সেই সরু পথটা ঘরটার সামনে পৌঁছে দিল।

কাছাকাছি এসে ঘরটার অস্পষ্ট একটা চেহারা বোঝা যাচ্ছিল। আরো কাছে এসে সেই চেহারাটা স্পষ্ট হল।

চারদিকে আলগা আলগা ইঁট সাজিয়ে চারটে দেওয়াল খাড়া করা হয়েছে। কোন গাঁথনি নেই। ইঁটগুলো ক্ষয়া ক্ষয়া, নোনা লাগা, শ্যাওলা পড়া। আলগা ইঁটের ফাঁক দিয়ে সুযোগ বুঝে অশ্বত্থের চারা সরু সরু শিকড় গজিয়ে ফেলেছে। উপরে পচা ধসা হোগলার চাল।

ইঁটের ঘরটার লাগোয়া আরো একটা খুপরি আছে। চৌকো চৌকো পেটানো টিন, পীচবোর্ড, চট আর পাতলা পাতলা কেরাসিন কাঠ দিয়ে চাল আর বেড়া বানানো হয়েছে।

সামনের দিকে একটু উঠোন। উঠোনে এক আস্তর নীলচে শ্যাওলা পড়েছে। এক কোণে উঁচু একটা ছাইগাদা। ছাইগাদার মাথায় দুটো ফলন্ত পেঁপে গাছ। আর এক কোণে একটা মাদার গাছ। গাছটার চেহারা বড় নিঃস্ব, বড় করুণ। এই কার্তিক মাসেই তার সব পাতা ঝরে গিয়েছে। নিষ্পত্র সরু সরু ডালপালা আতুর ভঙ্গিতে আকাশের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে গাছটা।

মাদার গাছটার ঠিক পাশেই একটা জামরুল গাছ। এই গাছটায় নতুন পুরনো, অজস্র পাতা। হাজার পাতার জিভ মেলে সে রোদের আসর শোষে। এত পাতা, দেখে মনে হয়, গাছটা বুঝি সবুজ ঘাঘরাই পরেছে। মাদার গাছের নিঃস্বতা এই জামরুল গাছটা পূরণ করে দিয়েছে।

ইঁটের চালাটার সামনে একটু দাওয়া।

দাওয়ায় বসে বড় বড় ফোঁড় তুলে কাঁথা শেলাই করছিল সুখী বুড়ী এই বয়সেও তার চোখে ধার আছে।

মাথায় পাটের ফেঁসোর মত রুক্ষ চুল। মাঝে মাঝে শেলাই বন্ধ রেখে চুলের ভেতর থেকে হাতড়ে উকুন আর লিক বার করে। নখের মাথায় রেখে টিপে টিপে মারে।

কাঁথায় ফোঁড় তোলার সময় পিঠটা বেঁকে ভুমড়ে গিয়েছিল, উবু হয়ে পড়েছিল সুখী বুড়ী। পায়ের শব্দে আর চেঁচামেচিতে মুখ তুলে সিধে হয়ে বসল।

ভুরুর উপর একটা হাত রেখে সুখী বুড়ী তাকিয়ে রইল। দেখল তিতাসী, জুড়োন আর কামিনী-বৌ গোরা গোরা চেহারার এক জোয়ান পুরুষকে উঠোনে এনে তুলেছে। তাদের পেছনে রানীর হাটের যত ডবকা ছুঁড়ীর ভিড়। তাদের কেউ গুজ গুজ করছে, কেউ খুক খুক করে হাসছে। রসের কথা বলে, হেসে কেউ কেউ বা ঢলেই পড়ছে।

সুখী বুড়ী অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

কামিনী এগিয়ে এসে তার একটা হাত ধরে। ডাকে, 'হেই গো শাউড়ি—'

'হুঁ—'

সুখী বুড়ী অস্ফুট একটা শব্দ করল। এত অবাক হয়ে গিয়েছে যে, মুখ দিয়ে তার কথা সরছে না।

কামিনী সুখী বুড়ীর পিঠে একটা ঠেলা মেরে বলল, 'শাউড়ি গো, দেখেচ?'

'দেখলম তো।'

এবার অনেকটা ধাতস্থ হয়েছে সুখী বুড়ী। আস্তে আস্তে সে বলল, 'দেখলম তো। তা হ্যাঁ লা বৌ—'

কথা পুরো না করেই সুখী বুড়ী থামল।

'কি কইচ শাউড়ি?'

'কইছিলম, এটাকে কোত্থেকে জুটিয়ে আনলি?'

'হুই নদীর পারে কাদায় বেহুঁশ হয়ে পড়ে ছেল। সেথেন থেকে তুলে আনলম।'

'ভাল।'

'মিনসে এখেনে রইবে।'

'ভাল।'

সুখী বুড়ীর দু পাটিতে একটা দাঁতও নেই। নিদাঁত মাড়ি বার করে সে হাসল। সে হাসিতে শব্দ নেই।

সুখী বুড়ী আর একবার বলল, 'ভাল লো বৌ, ভাল। খুব ভাল।'

বলেই কাঁথাটার উপর ঝুঁকে পড়ল। সূঁচে সুতো পরিয়ে বড় বড় ফোঁড় তুলতে লাগল। তিতাসী-কামিনীরা নদীর পার থেকে যে অচেনা লোকটাকে তুলে এনেছে, তার সম্বন্ধে আর কোন কৌতূহল নেই সুখী বুড়ীর। তার সব কৌতূহল মিটেছে। কোন ব্যাপারেই সে বিস্ময় মানে না।

টিন-ভাঙা, কাঠ, পিচবোর্ডের যে খুপরিটা, সেটার সামনেও একটু দাওয়া মত আছে। কামিনী-বৌ সেখানে চট বিছিয়ে লোকটাকে শুইয়ে দিল।

তিতাসী আর কামিনী—দুই যুবতী নদীর পারে একটি পুরুষকে কুড়িয়ে পেল। সরাসরি তাকে ঘরে এনে তুলল।

যুবতীর মনে কি আছে, কে জানে!

॥ ৩ ॥

উত্তুরে বাতাসের মুখে মুখে খবরটা উড়ল।

আজান বুড়োর দোকান থেকে ফরাসীদের ভাঙা গির্জে—রানীর হাটের সবাই জানল। মালীর ঝি তিতাসী আর কামিনী-বৌ নাকি নদীর পার থেকে গোরা গোরা রঙের এক সুপুরুষ জোয়ান মদ্দকে তুলে এনেছে।

পৃথিবীর হট্টগোল থেকে এ জায়গাটা অনেক দূরে। এমনিতে বেশ শান্ত আর নির্বিরোধ। কিন্তু মাঝে মাঝে দু চারটে ঘটনা ঘটে যায়, যাতে এই রানীর হাটের তিরতিরে, ঢিমে তালের জীবন আচমকা অস্থির হয়ে ওঠে।

এখন বিকেল।

আকাশটা যেন ময়ূরের মত পেখম মেলেছে।

কালকের মেঘের ছিটেফোঁটাও নেই। তার বদলে আকাশ জুড়ে বেগুনী, নীল, সবুজ—গাঢ়, উজ্জ্বল কতকগুলি রঙ এক সঙ্গে মিশে গিয়েছে। জ্বলছে।

আকাশের বাহার খুলেছে।

উত্তরের বাতাস ছুটেছে দক্ষিণে। বাতাসের এলোপাথাড়ি বাড়ি খেয়ে জামরুল গাছের পুরনো হলদে পাতা খসে খসে পড়ছে। পাতাগুলো উঠোনের আঠালো কাদার সঙ্গে মাখামাখি হচ্ছে।

উঁচু ছাইগাদাটার পাশে ক্রিং ক্রিং করে শব্দ হল।

সাইকেলের বেল বাজছে।

তিতাসী আর কামিনী ইঁটের ঘরের দাওয়ায় বসে ছিল।

কামিনী চেঁচিয়ে উঠল, 'কে র‍্যা ড্যাকরা ?'

'আমি রে, আমি—'

গলার স্বরেই চেনা গেল, বুড়ো পাদ্রী হ্যালিডে সাহেব।

এবার নরম আর বেশ আদরের স্বর ফুটল কামিনীর গলায়, 'হেই মা গোসানী! তুমি, সায়েব খুড়ো ?'

'হ্যাঁ রে মেয়ে, হ্যাঁ—'

'এসো এসো—'

উঠোনের মাঝখানে দীর্ঘ এক পুরুষ মূর্তি এসে দাঁড়াল। মেরুদণ্ডটা অটুট, সিধে। গায়ের রঙ এক সময় ধবধবে ছিল। এদেশের কড়া রোদে চামড়া জ্বলে তামা-রঙ ধরেছে। মাথার চুল ঈষৎ লালচে। হনু দুটো ফুঁড়ে বেরিয়েছে।

সারা দেহে ঢোলা, সাদা সারপ্লিস। পায়ে লাল ক্যাম্বিশের জুতো। গলায় কালো কারে রুপোর ক্রুশ ঝুলছে। মাথায় ফেল্টের টুপি।

দুটো হাত আর মুখটা ছাড়া বাকী শরীরটা সারপ্লিসে ঢাকা। মুখ আর হাতের চামড়া কুঁচকে গিয়েছে। বোঝা যায় হ্যালিডে সাহেবের উপর বয়স স্থায়ী ছাপ ফেলতে শুরু করেছে।

কামিনী বলল, 'উঠোনেই দাঁড়িয়ে রইবে সায়েব খুড়ো ?'

'না না, এই যাচ্ছি।'

কার্তিকের রোদে অনেকটা পথ সাইকেল চালিয়ে এসেছে। কপালে ঘাম আর লাল ধুলো জমেছে। আঙুল দিয়ে ধুলোমাখা ঘামের আস্তরটা কাঁচিয়ে ফেলল হ্যালিডে সায়েব।

দাওয়ায় একটা ছেঁড়া চাটাই পেতে দিয়েছে কামিনী। সেটার উপর হাত-পা ছড়িয়ে বেশ আরাম করে বসল।

কামিনী বলল, 'কদ্দিন পর তুমি এলে সায়েব খুড়ো!'

এ অঞ্চলের মেয়ে পুরুষ—সবাই হ্যালিডে পাদ্রীকে সায়েব খুড়ো ডাকে।

হ্যালিডে পাদ্রী তিরিশটা বছর এই রানীর হাটে ফরাসীদের ভাঙা গির্জেটার মধ্যে কাটিয়ে দিল। বিশ-পঁচিশ মাইল জুড়ে যতগুলো গ্রাম-গঞ্জ আছে, যতগুলো মানুষ আছে, তাদের সবার সঙ্গে তার সখ্য, আত্মীয়তা। সব

বাড়িতেই তার গতি অবাধ। তার কাছে সব দুয়ারই খোলা। মানুষগুলো হ্যালিডে সায়েবের কাছে শুধু ঘরেরই না, মনেরও সদর-অন্দর খুলে দিয়েছে।

কোন্ বীজধানটা বুনলে ভাল ফসল ফলবে, কোন্ পাত্রের হাতে দিলে মেয়ে দুধে ভাতে, সুখে সোহাগে থাকবে ; রোগে-শোকে, সুখে-দুঃখে সব সময় সবাই হ্যালিডে সায়েবের মুখ চেয়ে আছে। তাকে ছাড়া এদিকের মানুষের একদণ্ড, এক মুহূর্তও চলে না।

এ দিকের ভাষার আঞ্চলিক টান পুরোপুরি রপ্ত করে ফেলেছে হ্যালিডে সায়েব। তিরিশটা বছর কাটিয়ে এ দেশের সুখ-দুঃখের ভাগীদার হয়ে উঠেছে সে। আজান বুড়ো, সুখী বুড়ী কি কামিনী-তিতাসীর মতই এদেশের একজন হয়ে গিয়েছে।

কামিনী আবার তাড়া লাগায়, 'হেই গো সায়েব বুড়ো, কথা কইচ না কেন? এ্যাদ্দিন আস নি কেন?'

হ্যালিডে সায়েব বলল, 'আসি কেমন করে? বিবির বাজারে কলেরা লেগেচে। রুগী নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলাম যে, ইদিক পানে তাই আসতে পারি নি। চৌপর দিন ওষুধপত্তর নিয়ে ছোটাছুটি করেছি।'

এর পর ছুটকো-ছাটকা, ইতি-উতি দু-চারটে কথা হল।

হ্যালিডে পাদ্রী শুধোয়, 'তোর শাউড়ি কোথায় রে মেয়ে? ঘরে তো দেখচি না।'

'শাউড়ি গেচে বাদায়। গোবর কুড়োতে।'

এবার হ্যালিডে সায়েব তিতাসীকে নিয়ে পড়ল। বলল, 'হ্যাঁ রে তিতাসী, কথা কইচিস না কেন? মুখটা অমন প্যাঁচার মত করে রয়েচিস?'

তিতাসী একটু হাসল। বলল, 'কি কইব সায়েব খুড়ো?'

'কি কইবি, তা কি আমি বলে দোব?'

বলেই হ্যালিডে সায়েব কামিনীর দিকে তাকাল। বলল, 'হ্যাঁ রে কামিনী-বৌ, তিতাসী কি দিনরাত মুখ অমন হাঁড়ি করে রাখে?'

কামিনী কি বুঝল, সেই-ই জানে। মুখখানা কপট গম্ভীর করে সায় দিল, 'হ্যাঁ গো সায়েব খুড়ো, দিনরাত—'

'বুঝেচি—'

কামিনী একটু ঘন হয়ে বসে। ঘাড় কাত করে তিতাসীর দিকে, একবার তাকিয়ে বলে, 'কি বুঝেচ সায়েব খুড়ো?'

'তিতাসীর একটা বে (বিয়ে) দিতে হবে। ওর মনে বরের ভাবনা লেগেচে !'

'লেগেচে ! তোমায় বলেচে !'

মুখ ভেঙচে হ্যালিডে সায়েবের হাতে সজোরে একটা চিমটি বসায় তিতাসী। তার পর মাথাটা নামিয়ে চুপচাপ বসে থাকে। লজ্জায়, ঘামে মুখটা তার লাল হয়ে উঠেছে।

দু আঙুলে তিতাসীর থুতনিটা ধরে নেড়ে দেয় কামিনী। টেনে টেনে অদ্ভুত গলায় বলে, 'নাজুকলতা।'

কামিনীর বলার ভঙ্গিতে সহজ, দরাজ গলায় হো হো করে হেসে উঠল হ্যালিডে সায়েব। এ হচ্ছে সেই জাতের হাসি, যার ঝাপটায় মনের কপাটগুলি খুলে যায়। এই হাসির মধ্য দিয়ে বুকের অনেক গভীরে বড় কোমল, বড় নরম, একটি শিশুর মত প্রাণ দেখা যায়।

অনেক ঘুরে ঘুরে শেষ পর্যন্ত আসল কথায় এল হ্যালিডে সায়েব। বলল, 'হ্যাঁ রে কামিনী-বৌ, একটা কথা শুনলম—'

'কি শুনলে ?'

'শুনলম তিতাসী আর তুই নাকি নদীর পার থেকে কাকে কুড়িয়ে পেয়েচিস !'

'তোমায় কে বললে ?'

'আজান বুড়ো।'

হ্যালিডে সায়েব বলতে লাগল, 'বিবির বাজার থেকে নদীর পার ধরে ফিরছিলম। আজান বুড়ো ডেকে কথাটা বললে।'

কামিনী বলল, 'খপর (খবর) তা হলে বেশ ভাল করেই রটেচে ?'

হ্যালিডে পাদ্রী হাসল। বলল, 'খবর তো রটবার জন্তেই রে মেয়ে।'

একটু চুপচাপ। আবার সে শুরু করল, 'তা খবরটা সত্যি নাকি রে ?'

'হ্যাঁ গো সত্যি। তিন সত্যি।'

'তা সে কোথায় ?'

'হুই ছোট ঘরে। পাঁচ পো চালের ভাত খেয়ে মোষের পারা ভোঁস ভোঁস্ করচে ! বাব্বাঃ, কি ঘুম ! সাত জন্মে অমন ঘুম দেখি নি।'

হ্যালিডে সায়েব বলল, 'ওকে একবার ডাক না, এট্টু কথাবাত্তা বলে যাই। ওকে যখন ঘরেই তুলেছিস, তখন ও তো এই রানীর হাটের কুটুম। তা কুটুমের সঙ্গে এট্টু আলাপ করি। আজান বুড়োর মুখে শোনা ইস্তক লোকটাকে দেখতে ইচ্ছে করচে। ডাক, ডাক কামিনী-বৌ।'

'ডাকচি—'

কামিনী ছোট ঘরের দাওয়ায় গিয়ে উঠল।

বেড়ার গায়ে চৌকো একটা ফোকর। এই ফোকরই দরজা জানালার কাজ চালায়। ফোকরটার সামনে খসা খসা, ফেঁসে যাওয়া একটা চট ঝুলছে। এই চটটাই ঘরের কপাট।

চটটা ফাঁক করে কামিনী ডাকল, 'হেই যে গো এবেরে ওঠো দিকিনি। খুব ঘুমিয়েচ। বেলা হেলে পড়েচে।'

অনেক ডাকাডাকির পর লোকটা উঠল। তারপর সামনের ফোকরটার মধ্য দিয়ে গুঁড়ি মেরে টলতে টলতে বাইরে বেরিয়ে এল।

ঘুমের ঘোরে এখনও সে ঢুলুঢুলু। চোখ ছুটো লালচে। গালের কষ বেয়ে লাল পড়ছিল; শুকিয়ে সাদা একটা দাগ হয়ে গিয়েছে।

বাইরে বেরিয়ে জড়ানো গলায় লোকটা বলল, 'ডাকচ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই কখন থেকে ডাকচি। তোমার জন্য সায়েব খুড়ো এসে বসে রয়েচে। কথাবাত্তা কইবে!'

'সায়েব খুড়ো কে?'

লোকটার ঘুমের চটকা আস্তে আস্তে কেটে যেতে লাগল।

কামিনী বলল, 'হুই যে, পাকা ঘরের দাওয়ায় রয়েচে। চল চল, সায়েব-খুড়োর কাছে চল দিকিনি!'

লোকটাকে সঙ্গে নিয়ে ইটের ঘরের দাওয়ায় এল কামিনী। আর একখানা ছেঁড়া চাটাই বিছিয়ে লোকটাকে হ্যালিডে সায়েবের মুখোমুখি বসাল।

হ্যালিডে পাদ্রী বলল, 'অনেক দিন বাদে আমাদের এই রানীর হাটে নতুন লোক এল। সেই পাঁচ বচ্ছর আগে এসেছিল জুড়োন বুড়ী। আজ তুমি এলে। এর ভেতর আর কেউ আসে নি।'

একটু থেমে আবার, 'তুমি আমাদের কুটুম গো।'

'কুটুম।'

একটা শব্দ করেই লোকটা অবাক হয়ে গেল।

'হ্যাঁ হ্যাঁ কুটুম।'

হ্যালিডে সায়েব উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, 'তা তোমার নামটি কি বাপু?'

'সখারাম।'

'পুরো নাম বল।'

'পুরো নাম!'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, সখারাম কি? নাপুই? গায়েন? না পাড়ুই?'

সখারাম এক মুহূর্ত কি যেন ভাবল। তার পর বলল, 'ওসব খপর আমি জানি না। বাপ-মা জানে।'

'বাপ মা কোথায় তোমার?'

'বাপ মা কি আর আছে! অমি যেখন মার পেটে তেখন ওলাওঠায় বাপ মরল! জন্মেই মাকে খেয়েছি। ও পাট আমার চুকেবুকে গেছে।'

হি-হি করে হেসে উঠল সখারাম। আবার বলল, 'আমি শুধুই সখারাম।' সাপুই না গায়েন, অতশত বলতে পারব নি বাপু।'

একপাশে চুপচাপ বসে ছিল কামিনী। এবার সে মুখ বাঁকাল। চাপা তীব্র গলায় বলল, 'মিনসের রকম দেখ না! হেই মা গোসানী।'

হ্যালিডে সায়েব ডাকল, 'হ্যাঁ গো সখারাম,—

'কি কইচেন?'

'বাপ-মা তো মরেচে, তা আর কে আছে? ভাই-বোন-জ্ঞাতি—'

'কেউ নেই, কিচ্ছু নেই। সব ধোয়ামোছা।'

কামিনী চাপা, রিনরিনে গলায় বলল, 'ঘরের মাগ নেই?'

'না গো, চাল নেই, চুলো নেই, মাগ পাব কোথায়? হি-হি—'

সখারাম অদ্ভুত শব্দ করে হেসে উঠল।

কামিনী আগের মতই বলল, 'মিনসের হাসি শুনলে অঙ্গ জ্বলে যায়। বাপ-মা, ভাই-বোন, সব্বাইকে খেয়ে মানষে অমন হাসিও হাসে!'

হ্যালিডে পাদ্রী শুধোল, 'সখারাম, তোমার ঘর কোথায়?'

'ঘরদোর কিছু নেই।'

হ্যালিডে পাদ্রী এবার বিস্ময় মানে। তিরিশ বছর সে রানীর হাটে কাটিয়ে দিল। জীবনে সে অনেক দেখেছে, অনেক শুনেছে। কিন্তু সখারামের মত এমন মানুষ কোন দিন দেখে নি। আস্তে আস্তে সে বলল, 'ঘরদোর নেই তো থাক কোথায়?'

'হি-হি—'

সখারাম হেসে হেসে ভেঙে পড়ে। 'ঘরদোর নেই তো থাক কোথায়?' এমন একটা হাসির কথা, কৌতুকের কথা সারা জীবনে আর শোনে নি সে।

হ্যালিডে সায়েব বিব্রত হল। বলল, 'হাসচ কেন? হাসার কি হল?'

'হেই গো বাবা, হাসব না ?

সখারামের হাসি থামে না। হাসতে হাসতেই সে বলে, 'থাকার আবার ভাবনা! কি যে বলেন সায়েব, এই পিরথিমীতে কত ঘর !'

হ্যালিডে সায়েব এবার আর কিছু বলে না।

সখারাম বলতে থাকে, 'এত ঘর থাকতে আবার থাকার ভাবনা !'

বড় আশ্চর্য কথা বলে সে। গলার স্বরটা অদ্ভুত শোনায়, 'জন্মে ইস্তক পরের ঘরে থেকেই তো এত বড় হলম, এত বয়স হল।'

'বল কী !'

হ্যালিডে পাদ্রীর গলায় বিস্ময় ফোটে।

'খাঁটি কথাই বলচি।'

এক মুহূর্ত কি যেন ভাবে সখারাম। তার চোখ দুটো সামনের ছাইগাদা পেঁপেগাছ, দূরের চোরকাঁটা আর ঘাসেভরা মাঠ, আরো দূরের আকাশ পেরিয়ে কোথায় যেন হারিয়ে যায়। অনেক, অনেকদূরে কোথাও হয় তো একটা ছবি দেখছে সে। সেই ছবিটার মধ্যে বিভোর হয়ে আছে।

আস্তে আস্তে গাঢ় গলায় সখারাম অনেক কথা বলে যায়। সেগুলো সাজিয়ে-গুছিয়ে নিলে বুঝি এমন শোনায়।

ঘরদুয়ার তার নেই। পৃথিবীতে এত ঘর থাকতে তার দরকারও নেই। সখারামের মনে ঘর না-থাকার জন্য দুঃখ নেই, ক্ষোভ নেই।

জন্মাবধি এখানে-সেখানে, এঘাটে-সেঘাটে ভেসে বেড়াচ্ছে সখারাম। কত জাতের কত মানুষের ঘরেই না সে মাথা গুঁজেছে। এখানে দু মাস ওখানে ছ মাস, সেখানে বড় জোর বছর খানেক কাটিয়ে আবার নতুন আশ্রয়ের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে। সখারামের স্বভাবের মধ্যে কোথায় যেন একটা অস্থির বেদের বাস! এই বেদেটা তাকে সুস্থির থাকতে দেয় না, অবিরত তাড়িয়ে নিয়ে ফেরে। কোথাও যে হাত পা ছড়িয়ে শিকড় মেলে 'দু দণ্ড জুড়োবে তার জো নেই। বেদেটা তাকে অজানার লোভ দেখিয়ে বার বার ঘর ছাড়া করে। অমনি সব মোহ, সব বাঁধন কেটে বেরিয়ে পড়ে সখারাম।

সখারাম হচ্ছে সেই জাতের মানুষ, যারা কোন দিন পেছন ফিরে চায় না, পেছনের কোন টানই যাদের বেঁধে রাখতে পারে না।

ঘুরে ঘুরে, অন্যের ঘরে থেকে থেকে সখারাম একটা সার সত্য খুঁজে পেয়েছে। পৃথিবীর সব ঘরই তো নিজের ঘর। পৃথিবীর সব মানুষই সু-মন, সু-জন।

তা যদি না হত, তাহলে জন্মাবধি এত ঘরে সে আশ্রয় পেল কেমন করে ?

সখারাম বলতে থাকে, 'অবুঝ অজ্ঞেয়ান (অজ্ঞান) যেখন ছিলম, তেখনকার কথা বলতে পারব না। যেখন জ্ঞেয়ান হল, চোখ ফুটল, পাখা গজাল, তেখন ছিলাম জিয়াগঞ্জে, সেখেন থেকে নবদ্বীপে এলম। নবদ্বীপ থেকে কাটোয়া। কাটোয়া থেকে ইটিণ্ডেঘাট। সেখেন থেকে চুঁচড়ো-নৈহাটি-ভাটপাড়া-ইটাগড় হয়ে এলম কলকেতা। কলকেতায় পাঁচ মাস থেকে চিত্তিরগঞ্জ।'

একটু দম নেয় সখারাম। মুখ তুলে সামনের দিকে তাকায়।

বাওর বাতাস হন্যে হয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণে ছুটেছে। জামরুল গাছের পাতা ঝর্ঝর্ ঝরে পড়ছে। পেঁপে গাছের মাথায় নিবু নিবু, নিস্তেজ আলো আটকে রয়েছে।

দিনটা ফুরিয়ে আসছে।

চারিদিক কেমন যেন নিরানন্দ, বিষণ্ণ।

তিতাসী, কামিনী, হ্যালিডে সায়েব—তিনটি মানুষ অবাক হয়ে সখারামের কথা শুনে যায়। রুদ্ধশ্বাসে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

হ্যালিডে পাদ্রী বলল, 'থামলে কেন সখারাম ? বল।'

সামনের দিকে তাকিয়ে ছিল সখারাম। উঁচু ছাইগাদা, পেঁপেগাছ আর অনেক দূরের আকাশ পেরিয়ে দৃষ্টিটাকে হারিয়ে ফেলে সে। দৃষ্টিটাই শুধু নয়, নিজেও যেন হারিয়ে যায়। বিকেলের এই নিরুত্তাপ, ম্লান আলোতে সেই ছবিটাই বার বার আকাশের ওপারে কোথায় যেন ফুটে উঠছে। দেখে দেখে সাধ আর মেটে না সখারামের।

কামিনী এবার তাড়া লাগায়, 'হেই গো মিনসে, অমন বোবা মেরে রইলে কেন ? যা বলছেলে, বলেই ফেল না—'

আগের মতই আকাশের ওপারে দৃষ্টিটাকে রেখে বসে থাকে সখারাম। বলতে বলতে যে খেইটা হারিয়ে ফেলেছিল, আবার সেটাকে খুঁজে নেয়।

সখারাম আবার শুরু করল। তার স্বরটা যেন অনেক দূর থেকে আসছে, 'চিত্তিরগঞ্জে সুবুদ্ধি জানাদের বাড়ি ছিলম ছ মাস। জানা মশাইরা আমায় বড় ভালবাসত গো। তেনারা লোক বড় ভাল ছেল।'

একটু বিমনা হয়ে পড়ল সখারাম। তার গলাটা কেমন যেন ভিজে ভিজে, আবছা শোনাল, 'তবু সব ছেড়েছুড়ে কাল রাতের বেলায় ভেসে পড়লাম। না ভেসেই বা করি কি ? আমার ভেতর কি একটা যেন আছে। সেটা দু দণ্ড

থির থাকতে দেয় না। খালি এ-ঘাট থেকে ও-ঘাটে ছুটিয়ে নে বেড়ায়। মন আমার কোথাও পা পেতে বসে না গো।'

কি এক খুশিতে সখারামের চোখ দুটো চকচক করতে থাকে।

অনেকক্ষণ চুপচাপ।

এবার হ্যালিডে সায়েব বলল, 'চিত্তিরগঞ্জ থেকে কোথায় যাচ্ছিলে সখারাম?'

'যে দিকে দু চোখ যায়।'

'যে দিকে দু চোখ যায়!'

হ্যালিডে সায়েব হাঁ করে রইল। একটা আশ্রয় ঠিক না করে কেউ যে এমন ভেসে পড়তে পারে, তা কে জানত?

জীবনে অনেক দেখেছে হ্যালিডে সায়েব, অনেক শুনেছে। কিন্তু এমন একটা অবিশ্বাস্য, অদ্ভুত কথা এই প্রথম শুনল।

সখারাম বলল, 'হ্যাঁ গো সায়েব, যেদিকে দু চোখ যায়, ভেসে যাই। ভাসতে ভাসতে যেখেনে নৌকো ভেড়ে দু-পাঁচ মাস জিরিয়ে নি। সে জায়গাটা দেখি, সেখেনকার মানুষগুলোকে চাখি। তার পর মন যেদিন বলে, ভেসে পড়, ভেসে পড়ি। হি-হি—'

সখারাম হেসে ওঠে।

হ্যালিডে সায়েব বলে, 'নিজের ঘর বাঁধলে না, কোথাও থিতু হয়ে বসলে না। এমন ভেসে ভেসে যাবে কোথায়?'

সখারাম বলল, 'সমুদ্দুরে।'

॥ ৪ ॥

সবে তো কার্তিকের শুরু।

হিম ঝরার রাত কি এখনই এসে গেল?

পেঁপে গাছের মাথায় শেষ বেলার বিষণ্ণ আলোটুকু আটকে ছিল, এখন তার চিহ্ন নেই। এখন আবছা, হিম হিম, আধো অন্ধকার।

উঁচু ছাইগাদাটা অস্পষ্ট। পেঁপে গাছের দীর্ঘ রেখা দুটি অন্ধকারে কবন্ধের মত দেখায়। ঘাসেভরা মাঠ পেরিয়ে অনেক দূরে ফরাসীর গির্জেটা এখন নিরাকার হয়ে গিয়েছে।

উঠোনের মাটি বৃষ্টিভেজা, শ্যাওলা-পিছল। সেখান থেকে সোঁদা-সোঁদা গন্ধ উঠে আসছে।

জামরুল গাছটার পাতা সর সর কাঁপছে। মাদার গাছটার সরু সরু ডালগুলোর ফাঁকে একটি দুটি করে তারা ফুটতে শুরু করেছে। অগুণতি তারা।

উত্তুরে বাতাসটা হঠাৎ বড় ঠাণ্ডা লাগছে।

পেঁপে গাছের মাথায় রোদ থাকতে থাকতেই সুখী বুড়ী বাদা থেকে ফিরে এসেছিল। ঝোড়া বোঝাই করে গোবর এনেছে। ছাইগাদাটার পাশে টাল সাজিয়ে রেখে সিধে ইটের পাঁজাটার ভেতর ঢুকে পড়েছে।

সুখী বুড়ীর কাঁখে বাতের ব্যথা, পেটে শূলের। বাদা থেকে ফিরে একটা চাটাই বিছিয়ে শুয়ে পড়েছে। কারো সঙ্গে একটা কথাও কয় নি।

হ্যালিডে সায়েব এখনও যায় নি।

চারটে মানুষ; তিতাসী, কামিনী, সখারাম আর হ্যালিডে সায়েব—ইটের ঘরের দাওয়ায় জড়োসড়ো হয়ে বসে রয়েছে।

কামিনীই প্রথম কথা বলল, 'হেই মা গোসানী, কাত্তিক মাস সবে পড়ল। এরি ভেতর বাতাস কি হিম—'

সখারাম সঙ্গে সঙ্গে সায় দিল, 'কাত্তিকে এত হিম, দেখবে, পোষ-মাঘে বাতাসের দাঁত বেরুবে। টিকতে পারবে না।'

'যা বলেচ মিনসে।'

হ্যালিডে পাদ্রী কিছুই বলল না। সখারাম আর কামিনীর কথায় তার কানও ছিল না। ছাইগাদাটার দিকে তাকিয়ে বসে ছিল সে।

অন্ধকার গাঢ় হয়েছে।

ছাইয়ের উঁচু ঢিবিটায় জোনাকিরা জ্বলছে, নিবছে। আলোর স্থঁচের মত অন্ধকারকে ক্রমাগত বিঁধে চলেছে।

হ্যালিডে পাদ্রীর চোখের সামনে ছাইগাদা, জোনাকি কি অন্ধকার—কিছুই নেই। একটা হঠাৎ ভাবনা তাকে পেয়ে বসেছে।

ভাবনাটা নির্দিষ্ট একটা রূপ এখনও পেয়ে উঠছে না। অনেকগুলো জোনাকির মত মাথার ভেতর একরাশ জড় অন্ধকারকে যেন ক্রমাগত বিঁধে যাচ্ছে।

একসময় অন্ধকারটা কেটে গেল। ভাবনাটা স্পষ্ট একটা আকার পেল।

রানীর হাটে তিরিশটা বছর কেটে গেল হ্যালিডে সায়েবের।

এই তিরিশ বছর ধরে এমন একটা মানুষকেই বুঝি সে খুঁজছে।

এখানে এসে হ্যালিডে সায়েব যাদের পেয়েছে, তাদের সকলেরই পাতা সংসার, সাজানো ঘর, আর আছে পিছুটান। সেই টান ঠেকান বড় দায়। সব ছেড়েছুড়ে বেপরোয়া, বেহিসেবী হয়ে কেউ যে তার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বে, না না, তিরিশ বছরের ভেতর এই রানীর হাটে এমন একটা মানুষকে সে খুঁজে পেল না।

হ্যালিডে সায়েব জানে, এই মানুষগুলো ঘর-সংসার-ছেলেপুলেদের ঘিরে ছোট মাপের একটি বৃত্ত রচনা করে থাকতেই ভালবাসে। ছোট সুখ, ছোট দুঃখ, ছোট উত্তেজনা—এই নিয়েই এরা খুশি, তৃপ্ত। ছোট গণ্ডিটির বাইরে এদের যাবার উপায় নেই, সাহসও নেই।

না না, হ্যালিডে সায়েব অকৃতজ্ঞ নয়।

সরলতা, বিশ্বাস, ভালবাসা, নির্ভরতা—এদের কাছে অনেক কিছুই পেয়েছে সে। ঘর-সংসারে ছোট বৃত্তটুকুর মধ্যে থেকে যতটুকু পেরেছে, তারা দিয়েছে। একটুও দ্বিধা করে নি।

তবু ক্ষোভ জমে আছে হ্যালিডে সায়েবের মনে। যা সে চায়, যেমন ভাবে চায়, ঠিক তা পায় না।

অনেক উৎসাহ, অফুরন্ত উদ্যম নিয়ে এখানে কাজে নেমেছিল সে। উৎসাহে এখনও ভাঁটা পড়ে নি, উদ্যম এখনও অটুটই আছে। তবু এক-এক সময় বড় ক্লান্তি আসে। একা, নিঃসঙ্গভাবে কত আর পারা যায়। কত দিক সামলানো যায়।

এক-এক দিন বড় বেশী শ্রান্ত হয়ে পড়লে উদাস গলায় বাইবেলের সেই পদ দুটো গুন গুন করে সে।

> Hear the right, O Lord, attend unto my prayer,
> That goeth not out of feigned lips.

ভাঙা গির্জেটার ভেতর অদ্ভুত এক বিষাদ থমথম করতে থাকে। হ্যালিডে সায়েবের স্বর বড় করুণ শোনায়।

হোলি বাইবেলের এই পদ দুটো তার বড় প্রিয়। গাইতে গাইতে হ্যালিডে পাদ্রীর মনে হয়, অনেক বয়স হয়েছে তার। রক্তের মধ্যে অদ্ভুত এক অবসাদ ছড়িয়ে পড়েছে। এবার সব দায়, সব দায়িত্ব কারো উপর চাপিয়ে তার ছুটি নেবার পালা।

কিন্তু এ দায়িত্ব কাকে দিয়ে যাবে?

তিরিশ বছর ধরে সেই মানুষটাকেই তো খুঁজে ফিরছে হ্যালিডে সায়েব।

অন্ধকার ঝিম ঝিম করেছে।

ঘাসেভরা মাঠটায় ঝিঁঝিঁদের একটানা বিলাপ শুরু হয়েছে।

অন্ধকারে সখারামের দিকে তাকাল হ্যালিডে সায়েব। চোখ দুটো চক চক করে উঠল।

এই মানুষটা, এই সখারামকেই বুঝি সে এতদিন খুঁজেছে। চালচুলো নেই, ঘর নেই, পিছুটান নেই, কোন কিছুর জন্য দুঃখ কি ক্ষোভ নেই, কি পেল কষে দেখে না, কি হারাল, যাচাই করে না, লাভ-লোকসান খতিয়ে দেখে না। চলতে চলতে সামনে যা পড়ে, নির্বিচারে মেনে নেয়। এই হল সখারাম।

সখারামকে তার চাই।

একটু ইতস্তত করল হ্যালিডে সায়েব। কেশে গলাটা সাফ করে নিল। আস্তে আস্তে ডাকল, 'কামিনী-বৌ—'

কামিনী সাড়া দিল, 'কি বলচ সায়েব খুড়ো?'

'বলছিলম—'

বলতে গিয়ে হ্যালিডে সায়েব থেমে গেল। সঙ্কোচ, ঠিক সঙ্কোচ না, কি একটা বাধা যেন সে কাটিয়ে উঠতে পারছে না।

'কি বলছেলে, বলেই ফেল না।'

কামিনী তাড়া লাগাল।

'বলছিলম, তোদের তো বাড়তি ঘরদোর নেই।'

'নেই তা কি হল?'

'তাই বলছিলম—'

ঝাঝালো গলায় কামিনী বলল, 'সেই তেখন থেকে তো বলছিলম বলছিলম করছ! তা কি কইবে মন খোলসা করে কয়েই ফেল।'

'তুই রাগ করবি না তো কামিনী-বৌ?'

'হেই মা গোসানী, আমার কি খেয়ে দেয়ে আর কম্ম নেই! শুদু শুদু তোমার ওপর রাগ করতে যাব কেন?'

খানিকটা চুপচাপ।

কি একটু ভেবে নিল হ্যালিডে সায়েব। তার পর বলল, 'নদীর পারে তোরাই তো সখারামকে কুড়িয়ে পেয়েচিস। তাই তোদের মতটা চাইচি।'

কামিনীর কেমন যেন সন্দেহ হল। স্থির গলায় সে বলল, 'কি মন নে আজ হেথায় এয়েচ সায়েব খুড়ো? কি আচে তোমার মনে? কি চাও?'

ফস করে হ্যালিডে সায়েব বলে ফেলল, 'সখারামকে তুই দিয়ে দে কামিনী-বৌ।'

'কাকে দোব ?'

তীক্ষ্ণ গলায় কামিনী চেঁচিয়ে উঠল।

'কাকে আবার ? আমাকে। আমার সঙ্গে গির্জেতে চলুক, সেখেনে অনেক ঘর, অঢেল জায়গা। সেখেনেই থাকবে সখারাম।'

অন্ধকারে বুঝি কামিনীর চোখ দুটো ধিকি ধিকি জ্বলে।

অদ্ভুত শান্ত গলায় সে বলল, 'মনে মনে এই ফন্দি এঁটেই বুঝি এখেনে এসেছিলে সায়েব খুড়ো ?'

চকিত হয়ে কামিনীর মুখের দিকে তাকাল হ্যালিডে সায়েব। বাঁশের খুঁটিতে ঠেঁস দিয়ে খাড়া হয়ে বসল। মুখে কিছুই বলল না।

কামিনী আবার বলল, 'না, তা হবে না। কিছুতেই না। তোমার গির্জেতে যত ঘরই থাক, যত অঢেল জায়গাই থাক, মিনসেকে অত সহজে ছাড়ব না।'

একটু চুপ করল কামিনী। এক বার সখারাম, এক বার তিতাসীর, আর এক বার হ্যালিডে সায়েবের দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখে নিল। চোখ কুঁচকে কি একটা জটিল ভাবনা ভেবে নিল। তার পর শুরু করল, 'হেই গো মা গোসানী, কত কষ্ট করে তিতাসী আর আমি মিনসকে বাঁচিয়েচি। মিনসের ধড়ে পেরাণ ধুকুপুকু আঁকপাকু করছেল। ডলে ডলে ঘষে ঘষে কত যত্ন করে পেরাণটাকে তাজা করে তুলেচি। অমনি অমনি মিনসের ওপর দখল ছাড়ব না। হ্যাঁ, সিদে কথা। কি বলিস তিতাসী ?'

কনুই দিয়ে তিতাসীকে আস্তে একটা ঠেলা দিল কামিনী।

তিতাসী বলে, 'তোর যা ইচ্ছে ভাই-বৌ।'

সখারাম কিছুই বলে না। দাওয়ার এক পাশে বসে হি-হি করে হাসে।

হ্যালিডে সায়েব বলল, 'আমার কথাটা শোন কামিনী-বৌ।'

'তুমি যাই বল সায়েব খুড়ো, মিনসেকে আমি ছাড়ব না। ও বায়না তুমি ছাড়।' হাঁপাতে হাঁপাতে কামিনী বলে, 'যে পেরাণটা বাঁচিয়েচি, সেটার ওপর আমার দখল আচে। কি বল গো মিনসে ?'

এবার সখারামকে ঠেলা দেয় কামিনী।

আগের মতই—সখারাম কোন কথা বলে না। শুধু হি হি করে হাসে।

কামিনী বিড় বিড় করে বকে যায়, 'পেরাণ বাঁচিয়েচি। আমার পেরাণে যা আচে, তা আগে করে নিই। তার পর মিনসেকে ছাড়ব। হেই মা গোসানী—'

বিব্রত হয়ে বসেছিল হ্যালিডে সায়েব। আস্তে আস্তে সে বলল, 'আমার কথাটাই শোন কামিনী-বৌ—'

'নতুন কথা থাকলে বল।'

'হ্যাঁ নতুন কথাই।'

হ্যালিডে সায়েব বলতে লাগল, 'তোদের ঘরে পুরুষ মানুষ কেউ নেই। সুখী বুড়ী, তিতাসী আর তুই—তিন জনই মেয়েছেলে। তুই আর তিতাসী তো কাঁচা বয়সী, সোমত্ত।'

'খাঁটি কথাই বলেচ গো সাহেব খুড়ো। তাতে হয়েচে কি ?'

তামাশা না ব্যঙ্গ, কামিনীর গলায় কি যে আছে, ঠিক বোঝা যায় না।

কামিনী বড় ডাকাবুকো, মুখফোড়। মুখে যা আসে স্পষ্টাস্পষ্টি বলে ফেলে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ রইল হ্যালিডে সায়েব। নতুন করে কোথা থেকে শুরু করবে, হয়তো মনে মনে সেটাই ভেঁজে নিচ্ছিল। সে বলল, 'কথাটা বুঝে ত্যাখ কামিনী-বৌ, ঘরে এখন যদি একটা জোয়ান মদ্দ পুষিস, দুন্নাম রটবে—'

'দুন্নাম—'

শব্দ করে হেসে উঠল কামিনী। অন্ধকারে দেখা গেল না, বিদ্রূপে অবজ্ঞায় তার ঠোঁট দুটো বেঁকে গিয়েছে। সে বলতে লাগল, দুন্নাম রটতে আর বাকী আচে যেন! যেদিন তিতাসীর ভাই লড়াইতে নাম লেখাল সেদিন থেকেই তো রটচে।'

হ্যালিডে সায়েব আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে।

কামিনী থামে না, 'যার জিবে বিষ আচে, সে তো ছোবল ঝাড়বেই। নিন্দে ঠেকাব কেমন করে ? কটা মুখ চাপা দোব ?'

'তবু—'

হ্যালিডে সায়েবের গলাটা বড় ক্ষীণ শোনায়।

'তবু আর কি সাহেব খুড়ো। সাত বছর ধরে আমাদের নামে নিন্দে রটচে। নিন্দে এখন আর গায়ে লাগে না। দুন্নাম আর গেরাহ্যিই করি না। নিন্দে-দুন্নাম-বদনাম—সব সয়ে গেচে।'

কামিনীর গলাটা ভারী হয়ে আসে।

'তুই যেখন দিবিই না, তেখন আর কি বলব। অনেক রাত হল। এবার উঠি।'

উঠতে উঠতে হ্যালিডে সায়েব সখারামকে বলল, 'হুই যে উঁচু গির্জে, ওখেনে

আমি থাকি। অবরে-সবরে যেও গো সখারাম।'

ঘাসেভরা মাঠের ওপারে হাত বাড়িয়ে ফরাসীদের গির্জেটা দেখিয়ে দিল।

'যাব।'

হি-হি করে হেসে উঠল সখারাম। কথায় কথায় তার হাসি। হাসি যেন সখারামের ব্যারাম।

হ্যালিডে সায়েব চলে গিয়েছে। মাঠের দিক থেকে সাইকেলের শব্দটা এখনও আসছে।

ডান হাঁটুর উপর থুতনিটা রেখে ঘাড়টা সামান্য কাত করে সখারামের দিকে তাকাল কামিনী। প্রায় নিঃশব্দে রিনরিনে গলায় হেসে উঠল।

কামিনীর হাসির অনেক পরত নীচে কি আছে, সে-ই জানে।

॥ ৫ ॥

কাল রাত্রেই কামিনী-বৌ পাকাপাকি ব্যবস্থা করে ফেলেছে।

ইটের পাঁজার বড় খোপটায় সুখী বুড়ী, তিতাসী আর সে রাত্রে শোবে। সখারাম থাকবে পাশের টিন-পিচবোর্ড-চটের খুপরিটায়।

ন্যাকড়ার একটা চিটচিটে পুঁটলি মাথার নীচে রেখে বাঁশের মাচানে শুয়ে রয়েছে সখারাম। বেশ খানিকটা আগেই তার ঘুম ভেঙেছে।

এখান থেকে সমুদ্র খুব দূরে নয়।

আজ আর উত্তুরে বাতাসটা নেই। সমুদ্রের দিক থেকে ঠাণ্ডা, ক্ষ্যাপা বাতাস ছুটেছে।

কার্তিক মাসের সবে শুরু। এর মধ্যেই বাতাসে হিম মিশতে শুরু করেছে। প্রচুর কুয়াশা পড়ছে।

কাপড়ের খুঁটটা শরীরে বেশ ঘন করে জড়িয়ে নিল সখারাম। চোখ বুজবার চেষ্টা করল। না, ঘুম ভাঙবার পর চোখ বুজে কাঁহাতক পড়ে থাকা যায়।

এবার ইতি-উতি তাকাতে লাগল সখারাম।

ঘরটার সামনে দিকে একটা ছোট ফোকর। এই ফোকরটাই এই ঘরের জানলা-কপাট। ফোকরটার উপর ছেঁড়া চট ঝুলছে। চটের ছেঁড়া ছেঁড়া গর্তগুলোর মধ্য দিয়ে বাইরে তাকাল সখারাম।

এখনও আলো ফোটে নি। ভাল করে সকালই হয় নি। কেমন যেন ছায়া-

ছায়া, আলো-আঁধারি।

চটের ফুটো দিয়ে ছাইটিবির পেঁপে গাছ দেখা যায়। পেঁপের পলকা ডালে একটা শামকল পাখি বসে আছে। পাখিটার সরু, লম্বা লেজটা তিরতির করে কাঁপছে।

আস্তে আস্তে চোখ দুটো ঘরের ভেতর আনল সখারাম। কোণে কোণে গাঢ় পেঁজা পেঁজা অন্ধকার।

অন্ধকারেও সখারাম দেখতে পেল।

তিন পাশে চট-পিচবোর্ড-কেরোসিন কাঠের বেড়ার ফুটো দিয়ে ধোঁয়ার মত সাদা কুয়াশা ঢুকছে। আর এক পাশে ইটের পাঁজা সাজানো। ইটের পাঁজাটা একসঙ্গে পাশাপাশি দুটো ঘরের দেওয়াল হয়েছে।

ঘরের একদিকে টাল দিয়ে মালপত্র রাখা হয়েছে। বোঁচকা-বুচকি, ভাঙা-ভাঙা একটা টিনের বাক্স, ছেঁড়া কাঁথা, পচা চট, প্যাকিং বাক্সের কাঠ, খান কতক নতুন নম্বরী ইট, একটা ফুটো কড়াই, মেটে বাসন। রাজ্যের জিনিস ডাঁই করা।

এক সময় চিত হয়ে শুল সখারাম। বুকের উপর দু হাতে তাল ঠুকতে ঠুকতে হঠাৎ খুশিতে গান জুড়ে দিল।

হেই গো গুরু,—
আবার ঘর তো পেলম,
আবার ঠাঁই তো পেলম,
মানুষ পেলম, মনও পেলম।
হেই গো গুরু—
দিবানিশি অষ্টপহর,
খুঁজি যারে এ-ঘর ও-ঘর,
হেই গো গুরু—
তারে পেলম কই?
তারে দেখলম কই?
হেই গো গুরু—

সখারামের গলাখানা খাসা।

গান সারা হবার পরও এই পিচবোর্ড-চট-কাঠের ঘরে করুণ, বিষণ্ণ একটু রেশ ঘুরতে লাগল।

বাইরে থেকে কামিনী ডাকল, 'হেই গো মিনসে—'

'হ্যাঁ—'

ধড়মড় করে উঠে বসল সখারাম। বাঁশের মাচানটা মচ মচ করে উঠল।

'এখনও শুয়ে রইবে? বেলা পহর চড়ে গেছে।'

এতক্ষণ বেড়ার ফুটো দিয়ে সাদা ধোঁয়ার মত সরু রেখায় কুয়াশা ঢুকছিল। এখন ফিনফিনে সোনার তার দেখা যাচ্ছে। চোখ কচলে সখারাম বুঝতে পারল, সোনার তার না, কার্তিকের প্রথম নতুন রোদ।

আর দেরি করল না সখারাম। মাচা থেকে নেমে সামনের ফোকরটা গলে বাইরে এল।

ইটের ঘরে দাওয়ায় বসে কামিনী আর তিতাসী চাটাই বুনছে। এক পাশে ডাঁই করা তালপাতা। ছাইগাদাটার পাশে সুখী বুড়ী গোবর ছানছে।

কামিনী বলল, 'এস গো মিনসে, এখেনে বস—'

ইটের ঘরেরর দাওয়ায় গিয়ে উঠল সখারাম। বাঁশের খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে হাত-পা মেলে বসল।

নরম গলায় কামিনী বলল, 'গান গাইছেলে—'

'তা গাইছিলম।'

'গলাটা তোমার ভারি মিঠে।'

হি-হি করে হেসে উঠল সখারাম।

'হাসলে যে?'

'হাসলম, ইচ্ছে হল। আমার ইচ্ছেটা ভারি বেয়াড়া—'

হাসতে হাসতেই তিতাসীর দিকে তাকাল সখারাম। দেখল, তিতাসীও কেমন যেন ঘোর ঘোর চোখে তার দিকে চেয়ে আছে।

চোখাচোখি হতেই চোখ নামাল তিতাসী। তড়বড় করে চাটাই বুনতে শুরু করল।

হাসিটা হঠাৎ থামিয়ে দিল সখারাম।

কোন দিকে নজর নেই সুখী বুড়ীর, কোন কথায় কান নেই। ছাইটিবিটার কাছে আপন মনে সে গোবর ছানছে। আর বিড় বিড় করে কি যেন বকছে। কি বকছে, সে-ই জানে। কোন কিছুতেই সুখী বুড়ীর কৌতূহল নেই। সুখে সে উদাস, শোকে উদাসীন। ব্যথা, যন্ত্রণা, আনন্দ—কোন অনুভূতিই বুঝি তার বাজে না। বোধগুলি তার বোবা, ভোঁতা।

চারপাশে নিস্পৃহতার বেড়া খাড়া করে নিজেকে সারাক্ষণ গুটিয়ে রাখে সুখী বুড়ী। পৃথিবীর সব হট্টগোল, সব ঝড়তুফান সেই বেড়ায় ঘা খেয়ে ফিরে যায়।

ক্ষ্যাপা বাতাস শূন্যে পাক খেতে খেতে উত্তরে চলেছে।

বেলা চড়ছে।

রোদের তেজ বাড়ছে, রঙ বদলাতে শুরু করেছে।

পেঁপে গাছের সরু ডালে সকালের সেই শামকল পাখিটা কখন যেন উধাও হয়েছে।

ঘাসেভরা মাঠের ওপারে, অনেক দূরে ফরাসীদের গির্জে-বাড়ি। গির্জের চুড়োতে একটা কাঠের ক্রশ। সেদিকে তাকিয়ে ছিল সখারাম।

কামিনী ডাকল, 'হেই গো মিন্সে—'

সখারাম মুখ ফেরাল।

কামিনী বলল, 'একটা কথা বলছিলম—'

'বলে ফেল।'

'বলছিলম—'

একটু থামল কামিনী। এক বার কাশল। যে কথাটা বলতে চায়, মনে মনে তার মহলা দিয়ে নিল। পিঠটা সিধে করে বসল। তার পর শুরু করল, 'বলছিলম তিনটে পেরাণী (প্রাণী) নে আমাদের সোমসার (সংসার)। শাউড়ী, তিতাসী আর আমি।'

'সে তো দেখলম।'

'আমাদের সোমসারে আরো একজন ছিল।'

'কে সে?'

'তিতাসীর ভাই।'

কামিনীর স্বরটা এবার উদাস শোনায়, 'সাত বছর আগে লড়াইতে নাম লিখিয়ে কোতায় যে চলে গেল!'

কামিনী বুঝি একটা দীর্ঘশ্বাসই ফেলল। ঠোঁট দুটো তির তির করে কাঁপছে। ঢোঁক গিলে গিলে ঠোঁট কামড়ে কামড়ে সাত বছরের একটা পুরনো কান্নাকে অতি কষ্টে চাপল সে।

কামিনী বলতে লাগল, 'হুই যে গির্জে-বাড়িটা, তার ওপাশে কুঠির মাঠ।

সাত বছর আগে এক দিন ওখেনে বাদ্যি বেজে উঠল। এখনও সে আওয়াজ যেন শুনতে পাই। সব আমার মনে আছে গো মিনসে।'

'সাত-বছর আগের কথা সব মনে আছে!'

সখারাম অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

'সব মনে আছে। হুই কুঠির মাঠেই যে আমার সব্বোনাশ হল। সব্বোনাশের কথা কার আবার মনে থাকে না?'

কামিনী তার সর্বনাশের কথা শুরু করল।

সাত বছর আগে কুঠির মাঠে ঢ্যাপ্ ঢ্যাপ্ করে ঢাক বেজে উঠেছিল।

ঢাকের আওয়াজ পেয়ে রানীর হাটের মানুষগুলো সেদিকে ছুটল। সবার সঙ্গে কামিনী-বৌ, তিতাসী আর তিতাসীর ভাই শ্যামও ছুটল।

কুঠির মাঠে সে কি কাণ্ড।

কাণ্ড বলে কাণ্ড। একেবারে এলাহী কাণ্ড।

মস্ত মস্ত দুটো ঢাকে কাঠি পড়ছে। ঢ্যাপ্ ঢ্যাপ্ গম্ভীর শব্দটা কুঠির মাঠ পেরিয়ে, ফরাসীদের গির্জে-বাড়ি, মোগলদের বরুজ-গম্বুজ, পাঠানদের মিনার ছাড়িয়ে রানীর হাটের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ছে।

শহর থেকে ম্যাজিকলণ্ঠন কি সার্কেস এলে যেমন হয়, ভিড় লেগে যায়, ঠিক তেমনি ভিড় লেগেছে।

রানীর হাটের একটা মানুষও আর ঘরে নেই। বউ-বাচ্চা, বুড়ী-ছুঁড়ি, জোয়ান-বুড়ো—সবাই কুঠির মাঠে ছুটে এসেছে।

দূর থেকে মনে হয়, মেলা বসেছে।

সদর থেকে ম্যাজিস্ট্রেট সায়েব এসেছে।

শুধু কি ম্যাজিস্ট্রেট সায়েব, বিবির বাজার থানার দারোগা, এক জন গোরা সায়েব, তিন জন টিঙটিঙে কালো সায়েব—রকমারি সায়েব-সুবোতে কুঠির মাঠ ছেয়ে গিয়েছে।

এক পাশে দুটো পেল্লায় গাড়ি (রানীর হাটের লোকেরা এর আগে ট্রাক দেখে নি) দাঁড়িয়ে আছে।

এক সময় ঢাকের বাদ্যি থামল।

একটা টিঙটিঙে সায়েব কলের গান চালিয়ে দিল।

অনেকক্ষণ গান চলল। তার পর ম্যাজিস্ট্রেট সায়েব একটা টুলের

উপরে উঠে দাঁড়ালেন। সামনের দিকে ডান হাতটা বাড়িয়ে বলতে শুরু করলেন।

আজও, এই সাত বছর পরেও ম্যাজিস্ট্রেট সায়েবের কথাগুলো অবিকল শুনতে পায় কামিনী-বৌ। কথাগুলো বাজছে।

সাত সমুদ্দুর পেরিয়ে অনেক দূরে কোথায় নাকি লড়াই বেধেছে। সায়েব-সায়েবে লড়াই। হাজার হাজার মাইল দূরে এই রানীর হাটেও তার সাড়া পড়ে গিয়েছে।

ম্যাজিস্ট্রেট সায়েব বলছিলেন, 'তোমরা সবাই লড়াইতে নাম লেখাও। চাকরি পাবে, টাকা পাবে, পোশাক পাবে, সব পাবে।'

সেটা আকালের বছর।

জমিতে ফসল ফলে নি। যাও ফলেছে, সরকারী লোকেরা যুদ্ধের জন্য সব কিনে গুদামে মজুত করল।

ধান নেই, চাল নেই।

কচু ঘেঁচু, মেটে আলু, গুরমে আলু পুড়িয়ে, সেদ্ধ করে খেয়ে কতক মরল, কতক শহরে পালাল। যারা বাঁচল, ধুঁকে ধুঁকে টিঁকে রইল। তাদের দিকে তাকানো যায় না। জয়ঢাকের মত মস্ত পেট, কাঠিসার হাত-পা। নীরক্ত-নীল সারি সারি চেহারা।

রানীর হাটের কপালে এমন দুর্দিনও লেখা ছিল!

এমন যে আকাল, মানুষের পেটে দানা নেই, তবু লড়াইর নাম শুনে ভীরু গুঞ্জন উঠল, 'হেই গো বাবা, লড়ুইয়ে গিয়ে কি মরব? চ চ, ঘরের ছেলে ঘরে চ, এখেনে থেকে আর কাজ নেই।'

আধাআধি লোক কুঠির মাঠ ছেড়ে পালিয়ে গেল।

ম্যাজিস্ট্রেট তখন ধিক্কার দিচ্ছিলেন, 'তোমরা এত ভীতু! চিত্তিরগঞ্জ, বিবির বাজার, রূপাপুর—যেখানে গেছি, সেখানেই দলে দলে লোক লড়াইতে নাম লিখিয়েছে। আর তোমরা, ছিঃ—'

হাজার ধিক্কারেও যারা পালাচ্ছিল, তাদের আর ফেরানো গেল না।

বাকী লোকগুলো শ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল।

চার পাশ থম থম করতে লাগল।

ম্যাজিস্ট্রেট সায়েব অস্থির গলায় বলছিলেন, 'শুধু হাতেইফিরে যাব? একটা মানুষও কি পাব মা? রানীর হাটের একটা লোকও যুদ্ধে নাম লেখাবে না?'

ভিড়ের মধ্য থেকে একটা লোক বেরিয়ে এল। সরাসরি ম্যাজিস্ট্রেট সায়েবের সামনে গিয়ে বলল, আমার নামটা লেখান—'

কে? কে? কে?

অবাক হয়ে সবাই দেখল, খেয়াঘাটের মাঝি নিরাপদ।

নিরাপদর পর গেল যোগেন।

যোগেনের পর তিতাসীর ভাই শ্যাম গিয়ে নাম লিখিয়ে এল।

ভয়টা ভেঙে গিয়েছে।

এর পর লড়াইয়ের খাতায় নাম লেখাবার জন্য কাড়াকাড়ি হুড়োহুড়ি পড়ে গেল।

যাদের নাম লেখানো হয়েছে, ছুটো কালো সায়েব তাদের এক পাশে কাতার দিয়ে রেখেছিল।

এক সময় নাম লেখানো শেষ হল।

শ্যামদের সেই পেল্লায় পেল্লায় গাড়ি (ট্রাক) ছুটোতে তোলা হল। কুঠির মাঠের লাল ধুলো উড়িয়ে গাড়ি ছুটো এক সময় সদরের দিকে উধাও হয়ে গেল।

কেউ কথা বলছিল না।

তিতাসী না, কামিনী-বৌ না, এমন কি সুখী বুড়ীও না।

চুপচাপ তিন জন ঘরের দিকে ফিরছিল।

ফরাসীদের গির্জেটার কাছে আসতেই সন্ধ্যে নামল।

কামিনী-বৌ গির্জের চুড়োয় ঝাপসা ক্রশটার দিকে তাকাল। ক্রশটা চোখের জলে কতটা, আর সন্ধ্যের অন্ধকারে কতটা ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল, কে বলবে?

লড়াইয়ের খাতায় নাম লিখিয়ে সদরে যাবার দিন শ্যাম বলে গিয়েছিল, তিন দিনের মধ্যেই সে ফিরে আসবে।

ঠিক তিন দিনের মাথায় শ্যাম ফিরল।

এ শ্যামকে চেনা বড় দায়!

খাকির নতুন প্যাণ্ট, নতুন জামা, মাথার চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা, লাল কাপড়ের জুতো—সদর থেকে একেবারে নতুন মানুষ হয়ে শ্যাম ফিরল।

সুখী বুড়ী, তিতাসী, কামিনী-বৌ—তিন জন অবাক হয়ে দেখছিল।

শ্যাম হেসে ফেলল। বলল, 'দেখচিস কি হাঁ করে! মস্ত চাকরি পেয়েচি। তিন কুড়ি দশ টাকা মাস মাইনে। জামা-কাপড়-খোরাকি, সব আলাদা।'

হাত-পা নেড়ে নেড়ে অনেক কথা বলল শ্যাম, অনেক কিছু বোঝাল।

কামিনী-বৌরা কিছু বুঝল, কিছু বুঝল না। শুধু হাঁ করে শ্যামের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

এবার শ্যাম বলল, 'কাল চাকরিতে লাগতে হবে। সেই আসাম মুল্লুকে যেত হবে। কালই রওনা হব।'

শ্যামের চোখ-মুখ উৎসাহে যেন জ্বলছে।

সুখী বুড়ী এতক্ষণে মুখ খুলল, 'হেই বাবা, আসাম কোথায় রে।'

'সে অনেক দূর। রেলগাড়িতে দু-আড়াই দিনের পথ।'

'হেই বাপ, হোথায় গে কাজ নেই। ঘরের ছেলে ঘরেই থাক।'

শ্যামকে তখন নেশায় পেয়েছে। আস্তে আস্তে সে বলল, 'কি কইচিস মা? চারদিকে আকাল, ঘরে বসে রইলে সবাই শুকিয়ে মরব।'

'মরি মরব। তবু তুই ঘরেই থাক বাপ।'

অবুঝ, আকুল গলায় সুখী বুড়ী বলল।

'সেটি হবার জো নেই মা। লড়াইয়ের খাতায় নাম লিখিয়েচি। না গেলে সায়েবরা ধরে নে যাবে।' একটু থেমে শ্যাম বলল, 'আগাম মাইনে পেয়েচি। এই নে টাকা ধর।'

সুখী বুড়ীর মুঠোয় চল্লিশটা টাকা পুরে দিল শ্যাম।

সুখী বুড়ী আর কিছু বলল না। শোর তুলে কাঁদতে লাগল।

তখন কামিনী-বৌ আর তিতাসীর কতই বা বয়স! সুখী বুড়ীর দেখাদেখি তারাও আলুথালু হয়ে লুটিয়ে লুটিয়ে কান্না জুড়ে দিল।

কিন্তু কোন মতেই শ্যামকে ঠেকানো গেল না।

সে যুদ্ধে গেল।

শ্যাম যাওয়ার পর প্রতি মাসে নিয়ম করে পঞ্চাশ টাকা আসতে লাগল।

পাঁচ মাস টাকা এল। খান দুই চিঠি এল মণিপুর থেকে।

তার পর হঠাৎ এক দিন টাকা আর চিঠি আসা বন্ধ হয়ে গেল।

'সাতটা বছর পেরিয়ে গেল, কবে নাকি যুদ্ধ থেমে গেচে। তবু সে ফিরল না। আমার সব্বোনাশ হল গো মিনসে।'

কামিনী-বৌর গলাটা ধরা ধরা, কান্নায় ভেজা। চোখের গাঢ় কালো মণি দুটো তার চিক চিক করছে।

তিতাসী ঘাড় গুঁজে তালপাতা নাড়াচাড়া করছে। মুখটা তার দেখা যাচ্ছে না।

কামিনী এবার সুখী বুড়ীকে ডাকল, 'হেই গো শাউড়ী—'

এক মনে গোবর ছানছিল বুড়ী। ডাক শুনে মুখ ফেরাল। শান্ত গলায় বলল, 'কি কইচিস বৌ?'

'কইছিলম, তোমার ছেলে তো দুখানা চিঠিই দিয়েচে!

'তা তো তুই জানিস।'

'তার পর থেকেই তো তার খোঁজখপর নেই। তাই না গো?'

একটু থামল কামিনী। আপন মনে বলতে লাগল, 'সাত বছর পুরল, তবু সে ফেরে না! ভগমান কপালে কি আঁক কষেচে, কে জানে?'

গোবর ছানতে ছানতে নির্দাঁত ফোকলা মুখে হঠাৎ খল খল করে হেসে উঠল সুখী বুড়ী।

চমকে বুড়ীর দিকে তাকাল সখারাম।

সুখী বুড়ী হাসছে না কাঁদছে, ঠিক বোঝা যায় না।

তার হাসি আর কান্না অবিকল এক রকম।

॥ ৬ ॥

অনেকদিন পর রানীর হাট চঞ্চল হল।

রানীর হাটের জীবন ময়ূরের মত নাচিয়ে নয়, নদীর মত ধারাল নয়। কেমন যেন মন্থর, নিস্তেজ, অলস।

এখানে বেগ নেই, ধার নেই, তাপ নেই।

দিন আর রাতগুলো এখানে বড় দীর্ঘ। এত দীর্ঘ যে খাওয়া-বসা-শোওয়া, গুলতানি এবং টানা ঘুম দিয়ে মেপে মেপেও ফুরনো যায় না।

কালেভদ্রে এমন কিছু ঘটে, যাতে রানীর হাটের জীবন ক্ষুব্ধ হয়, অস্থির হয়, চঞ্চল হয়।

সেই যুদ্ধের আমলে রানীর হাটের ঢিমে তেতালা জীবনে শেষবারের মত উত্তেজনা এসেছিল, ঢেউ উঠেছিল। শান্ত, ঘুমন্ত, নিরুদ্বেগ জায়গাটা হাজার বছরের ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছিল।

সেই এক বারই।

হাল আমলের লোকেরা সেই এক বারেরই খবর রাখে। মোগল পাঠান হার্মাদ-ফিরিঙ্গিদের আমলে কি ঘটেছিল, সে সব ব্যাপারে তাদের মাথা ব্যথা নেই। আসলে পুরনো কালের কড়ি তারা ধারে না।

কিন্তু চোখের সামনে যা ঘটছে, তার খোঁজ না রেখে উপায় কী?

সেই সেবার—

তারিখ-সাল হুবহু মনে আছে আজান বুড়োর। বাঙলা সন তের শ সাতচল্লিশ, সাতুই ভাদ্দর।

কুঠির মাঠে একসঙ্গে কয়েক জোড়া ঢাক বেজে উঠেছিল। ঢ্যাপ্-ঢ্যাপ্-ঢ্যাপ্—জোয়ান-বুড়ো, মেয়ে-মদ্দ, বৌ-বাচ্চা সবাই কুঠির মাঠে ছুটল।

কী ব্যাপার?

ব্যাপার বলে ব্যাপার! তাজ্জবের ব্যাপার!

সদর থেকে ম্যাজিস্ট্রেট সায়েব এসেছেন। শুধু কি ম্যাজিস্ট্রেট সায়েব, রকমারি সায়েবসুবো, পেল্লায় পেল্লায় লরি-গাড়ি-ট্রাকে কুঠির মাঠ ছেয়ে গিয়েছে।

কোথায় নাকি লড়াই বেধেছে!

সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পর্যন্ত এখানকার মানুষদের কল্পনার পাল্লা। সে সব পেরিয়ে অনেক, অনেক দূরে, যেখানে তাদের নির্জীব কল্পনা পৌছয় না, লড়াই শুরু হয়েছে।

রানীর হাটের জোয়ান ছেলেরা ফৌজে নাম লিখিয়ে যুদ্ধে চলে গেল।

রানীর হাট সরগরম হয়ে উঠল।

নদীর কিনার দিয়ে সুরকি-খোয়ার সড়ক সিধে সদরের দিকে ছুটল। সন্ধ্যে নামলেই রানীর হাট যেন নিশুতিপুর; গাঢ় অন্ধকারে সে তলিয়ে যায়। যুদ্ধের কল্যাণে নিশুতিপুরে হাজার বাতি জ্বলল।

রানীর হাটে বিজলী আলোর দাক্ষিণ্য এল।

হেই মা, গোসানী!

দেখতে দেখতে রানীর হাট কি হয়ে গেল!

মাইল তিনেক দূরে বিবির বাজারে মিলিটারিদের ছাউনি পড়ল।

লালমুখো সায়েবরা ধুলো উড়িয়ে জীপ-লরি-ট্রাক ছুটিয়ে রানীর হাটে আসে। ফৌজের জন্য শুধু কি জোয়ান ছেলেদেরই নিয়ে যায়!

না না—

চোখ বুজলে পরিষ্কার একখানা ছবির মত সব ফুটে উঠে। সেই দিনগুলো অবিকল দেখতে পায় আজান বুড়ো।

মানুষই শুধু নয়, হাঁস-মুরগি-পাঁঠা-ছাগল-ডিম-দুধ-মাছ—সব ট্রাক ভরে মিলিটারি ছাউনিতে চালান যেতে লাগল।

শুধু কি হাঁস-পাঁঠা আর জোয়ান মদ্দ ?

আরো আছে।

সব, সব জানে আজান বুড়ো। রানীর হাটের কোন্ কীর্তিটা জানতে বাকী আছে তার ?

রাত্রি যেই নামল, অমনি তেরপল-ঢাকা লরিতে চেপে এ এ-বাড়ির বউ, ও-বাড়ির ঝি, রানীর হাটের ডবকা বয়সের যুবতীরা চলল।

কোথায় চলল, তা কি আর আজান বুড়ো জানে না? সব জানে, সব জানে সে। জানতে বুঝতে কিছু বাকী নেই তার।

চায়ের দোকানের মস্ত উনুনটার পাশে বসে এক-এক সময় ভাবতে ভাবতে অবাক হয়ে যায় আজান বুড়ো।

যুদ্ধের জঠরটা কি পেল্লায়! হেই মা গোসানী।

এই রানীর হাটে যা ফলে, ধান-চাল-শাক-সব্জি-ফল-পাকুড়, যা জন্মায় হাঁস-পাঁঠা-মুরগি, মানুষ-মেয়েমানুষ—সব কিছু যুদ্ধের পেটে চলে যায়।

সেই যুদ্ধ এক দিন থামল।

উত্তেজনা, অস্থিরতা কর্পূরের মত উবে গেল। এখানকার জীবন চড়া তারে বাজছিল। হঠাৎ সেটা ঝিমিয়ে পড়ল।

কয়েক মুহূর্তের জন্য জেগে উঠেই রানীর হাট আবার হাজার বছরের অতল ঘুমে তলিয়ে গিয়েছে।

যুদ্ধে কার কতটা লাভ হয়েছে, কার কতটা ক্ষতি হয়েছে, সে সব খতিয়ে যাচিয়ে দেখার মত সময়ই নেই আজান বুড়োর। কারই বা আছে ?

তবে তার নিজের লাভ হয়েছে। নগদ লাভ, ডবল লাভ।

লড়াইর কল্যাণে হাঁস-মুরগি-মানুষের সব কিছুর দর চড়ল। খালি তার চায়ের দরটাই বাড়বে না? নিশ্চয়ই বাড়বে।

এক খুরি চা ছিল দু পয়সা। দাম বেড়ে হল চার পয়সা। পুরোপুরি ডবল।

এই দামটা এখনও চালু আছে।

এতেই আজান বুড়ো বেজায় খুশী

অনেক, অনেকদিন পর রানীর হাট আড়মোড়া ভাঙতে শুরু করেছে। তার নাড়ি চঞ্চল হয়েছে। আজান বুড়োর প্রখর ইন্দ্রিয়গুলো অনেক কিছুর আভাস পাচ্ছে।

রসিয়ে রসিয়ে বলবার মত কইবার মত একটা কাণ্ড ঘটেছে।

এতে অবশ্য আজান বুড়োর চায়ের দাম বাড়বে না। তবু সে খুশী হয়েছে। তাল ঠুকে ঠুকে গাইতে ইচ্ছা করছে, 'ধিনিক ধিনা, পাকা নোনা'—

॥ ৭ ॥

গোল পাতার চাল, হোগলার বেড়া, সামনের দিকে কঁ্যাচা বাঁশের ঝাঁপ—এই হল আজান বুড়োর চায়ের দোকান।

এক ধারে মস্ত এক উনুনে গনগনে আঁচে পেল্লায় একটা সিলভারের হাঁড়ি পুড়ছে। দিবারাত্রি অষ্টপ্রহর জল ফুটছে তো ফুটছেই। সাদা ধোঁয়া উড়ছে।

সিলভারের হাঁড়িটা পুড়ে পুড়ে কালো পাকা রঙ ধরেছে।

উনুনের ধার ঘেঁষে তিন সারি নীচু বাঁশের মাচান। খদ্দেররা ওখানে বসে চা খায়, আড্ডা মারে, গুলতানি পাকায়।

নদীর কিনারের খোয়া-সুরকির সড়কটার এক পাশে আজান বুড়োর চায়ের দোকান। আর একটা পাশ ঢালু হয়ে নদীতে মিশেছে।

ঢালু জমি কেটে সমান করে শ্মশান বানানো হয়েছে। শ্মশানের পাশে দুটো বিরাট বিরাট শিশু গাছ। শিশু গাছের নীচে সরকারী কুদঘাট, খেয়াঘাট। তার পরেই নদী।

এখন ঝিম দুপুর।

কুদঘাটের জমা-বাবু ঘুমুচ্ছে। খেয়াঘাটের মাঝিরা ঝিমুচ্ছে। গেরুয়া নদীটা দুপুরের রোদে ছুরির ফলার মত ঝলকাচ্ছে। শিশু গাছ দুটো ঝিম মেরে আছে। তাদের পাতা নড়ে কি নড়ে না। ক্লান্ত, অবসন্ন একটা জানোয়ারের মত লাল ধুলোর সড়কটা ধুঁকছে। কোথাও একটু বাতাস নেই। কেমন একটা দমবন্ধ অসহ্য গুমোট। তামাটে আকাশটা রোদে পুড়তে পুড়তে অনেকখানি নীচে নেমে এসেছে।

এ সময়টা খদ্দেরপত্তর থাকে না।

প্রাণে ফুর্তি জাগল কি গলার মধ্যটা খুচখুচ করে উঠল। তখন গলা ছেড়ে গাইতে ইচ্ছা করে আজান বুড়োর।

অনেক, অনেক দিন পর রানীর হাট চঞ্চল হয়েছে।

পা নাচিয়ে নাচিয়ে আজান বুড়ো গান জুড়ে দিল—

'ধিনিক ধিনা, পাকা নোনা—
ও ছুঁড়ি, তোর ফুলকো গালে
মারব ঠোনা,
ধিনিক ধিনা।'

মস্ত উনুনটার পাশে বসে পা নাচিয়ে নাচিয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত পয়লা খদ্দেরটি না এল, গেয়ে চলল আজান বুড়ো—

'ধিনিক ধিনা, পাকা নোনা—
দুধে পড়ল গরুর চোনা।
ধিনিক ধিনা,
পাকা নোনা।'

আজ একটু আগে আগেই খদ্দেররা এসে পড়ল।

আজান বুড়ো জানত, গুলতানি আজ আগেই জমবে।

যারা নিয়ম করে রোজ হাজিরা দেয়, তারা তো এলই। যারা মাঝে মধ্যে এক-আধ খুরি চা খেয়ে যায়, তারাও এল। যারা কোন দিনই আসে না, তাদেরও দু-চার জনের দেখা মিলল।

আড় চোখে এক বার দেখে নিল আজান বুড়ো।

সামনের সারি সারি মাচানে আর ফাঁক নেই। সবাই ঘেঁষাঘেঁষি করে বসেছে। কেউ কেউ জায়গা না পেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আড্ডাটা পেকে উঠল।

আজান বুড়োর চায়ের দোকান আজ সরগরম।

তারু ঘড়ুই বলল, 'বেশ কড়া করে এক খোরা চা দাও দিকিনি খুড়ো। চা খেতে খেতে মোজ করে জমানো যাক।'

শুধু তারু ঘড়ুই কেন, সবাই এক-এক খুরি চা দিতে বলল।

আজান বুড়ো বলল, 'দাম কিন্তুক নগদা দিতে হবে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ নগদাই দোব। আজ আর ধার-বাকী না।'

সবাই প্রায় একসঙ্গে বলল।

কলের মত হাত চলতে লাগল আজান বুড়োর। এক হাতে চা ছাঁকল, চিনি-দুধ মেশাল, আর এক হাতে খদ্দেরদের যোগান দিতে লাগল।

চা খেতে খেতে তারু ঘড়ুই বলল, 'খপর শুনেছ খুড়ো?'

'কিসের খপর?'

নিপাট ভালমানুষের মত জিজ্ঞেস করল আজান বুড়ো। কিছুই যেন জানে না, এমন ভঙ্গি করল বটে, তবু আজান বুড়োর মুখে-চোখে কৌতুক ফেটে পড়ছে।

কিছুটা অবাক হয়ে আজান বুড়োর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল তারু ঘড়ুই। তার পর আস্তে আস্তে বলল, 'কিছুই শোন নি?'

'না, কী শুনব?'

তারু ঘড়ুই বলল, 'রানীর হাটের সবাই শুনল, খালি তুমিই বাদ পড়লে খুড়ো? এ যে অবাক কথা!'

'মাইরি বলছি তারু, তোর মাথার দিব্যি। কিচ্ছু শুনি নি।'

ডাইনে-বাঁয়ে—দু পাশে ঘন ঘন মাথা ঝাঁকাতে লাগল আজান বুড়ো।

সারা দেহে চামচিকের মত খসখসে চামড়া আঁটা। মাংসের ছিটেফোঁটা নেই। মাথার সমস্ত চুল অসময়ে পেকে পাঁশুটে রঙ ধরেছে। অস্বাভাবিক ধারাল দুটো চোখের মধ্যে ভাঙা থ্যাবড়া একটা নাক। হনুর হাড় দুটো চামড়া ফুঁড়ে ঠেলে উঠেছে। নীচের ঠোঁটটা আলগা হয়ে ঝুলে পড়েছে। মেরুদাঁড়াটা বাঁকানো। বাঁ হাতটা আপনা থেকেই সব সময় অল্প অল্প কাঁপছে। এই হল আজান বুড়ো।

মদ বল, ভাঙ বল, গাঁজা বল, মেয়েমানুষ বল—এমন একটা বয়স ছিল, যখন কোন সাধ মেটাতে বাকী রাখে নি সে। শরীরকে শরীর বলে রেয়াত করে নি। তেমনি তার চড়া দামও দিতে হয়েছে। নেশা আর মেয়েমানুষ তার দেহটাকে খুবলে খেয়েছে।

রকমারি নেশা আর মেয়েমানুষ—ওই দুইয়ে মিলে ভেতরটা একেবারে ঝাঁঝরা করে ফেলেছে। আজকাল শরীরে আর কুলোয় না। গাঁজার নেশাটি ছাড়া বাকী সব কিছু ছাড়তে হয়েছে।

শরীর যা পারে না, মনের ভেতর সে সব অশ্লীল অপকর্মের ভাবনাগুলি আজকাল গেঁজিয়ে উঠতে থাকে। আজকাল আজান বুড়োর ভেবেই সুখ। সারা

দেহে কুকর্মের সীলমোহর এঁটে দিনরাত পেল্লায় উনুনটার পাশে বসে চুপচাপ সে ভাবে।

একনজর দেখলেই বোঝা যায়, একটি পাকা হেঁতেল ঘুঘু।

একদৃষ্টে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে তারু ঘড়ুই বুঝল, কিছুতেই নিজে থেকে কিছু বলবে না আজান বুড়ো। সব শুনবে, দেখবে। তার পর সে সব পেটের ভেতর পুরে কুলুপ আঁটবে।

তারু বলল, 'তুমি কিছুই জান না, এমন কথা বিশ্বেস করতে হবে? কাল তো তোমার চেখের উপরেই ঘটল! হেই সায়েব ঘাটে'—

ঘুরে গুলতানিটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'না কি বল তোমরা?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ—'

সকলে একসঙ্গে সায় দিয়ে উঠল।

'তাই নাকি, তাই নাকি? বলিস কী?'

আজান বুড়ো বলতে লাগল, 'বল বল, সব খুলে বল। শুনি, মনে হচ্চে বেশ রসালো খপর।'

'হ্যাঁ গো খুড়ো, খুব রসালো খপর। শোনই নি যেখন, তেখন কইচি। বুঝলে কি না—' বলতে বলতে তারু ঘড়ুই থামল।

'বল্ বল্—'

আজান বুড়োর তর আর সয় না।

'ডাকাবুকো মাগী দুটো, বুঝলে কি না—'

'ডাকাবুকো মাগী!'

চোখ কোঁচকালো আজান বুড়ো। চোখের উপর এক জোড়া মোটা রোমশ ভুরু। মনে হয়, দুটো শুঁয়োপোকা হুমড়ি খেয়ে আছে।

চোখ কোঁচকাবার সঙ্গে সঙ্গে ভুরু দুটো কুঁকড়ে গেল। বিড় বিড় করে আজান বুড়ো আবার বলল, 'ডাকাবুকো মাগী! বলিস কী?'

'শুধু ডাকাবুকোই না, ডবকা বয়সের দুই ছুঁড়ি—'

গুলতানির মধ্যে থেকে কে যেন বলে উঠল।

'বলিস কী, বলিস কী!'

আজান বুড়ো পা ছড়িয়ে জুত করে বসল। বলল, 'বল্ বল্, ডবকা বয়সের ডাকাবুকো ছুঁড়িদের কথা বল্। শুনে পেরাণ ঠাণ্ডা করি।'

আজান বুড়োর গলায় কেমন যেন গরগরে আওয়াজ। দু চোখ থেকে চাপা,

তীব্র খুশি যেন ঠিকরে বেরুচ্ছে।

তারু ঘড়ুই বলল, 'শ্যামের কথা মনে আচে তো খুড়ো?'

'কোন শ্যাম?'

যেন কত ভাবছে, এমন ভান করল আজান বুড়ো।

'কোন্ শ্যাম আবার? রানীর হাটে ক'টা শ্যাম আচে?'

হাত বাড়িয়ে পুব দিকটা দেখিয়ে দিল তারু ঘড়ুই। বলল, 'সাপুইদের শ্যাম। হুই গির্জে-বাড়ির পাশে ইটের পাঁজা। মনে পড়ছে?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। তা শ্যাম তো লড়াইতে গেচে।'

'তাতে সুবিধেই হয়েচে।'

'কার সুবিধে হল?

'কার আবার? শ্যামের মাগের আর বোনের।'

'কেন, করলে কী তারা?'

'পিথীমিতে কেউ যা না করে, তাই করলে! ছ্যা ছ্যা, ঘেন্নায় মরি। মেয়েমানুষের এত ডাকাবুকো হওয়া ভাল না।'

চা জুড়িয়ে আসছিল। লম্বা চুমুকে খোরাটা শেষ করে ফেলল তারু ঘড়ুই। আবার শুরু করল, 'নদীর পার থেকে একটা জোয়ান মদ্দকে তুলে একেবারে ঘরে ঢুকিয়েচে। এক রাত কাটিয়েও ছিল।'

'জোয়ান মদ্দটা এল কোত্থেকে?'

'পরশু যে ষেঁড়োষেঁড়ির বান ডেকেচিল, মনে হয় তাতে ভেসে এয়েচে।'

'বারে বা, কি খপর শুনলম! সকালে কার মুখ দেখে উঠেছিলাম! ধিনিক ধিনা, পাকা নোনা—'

হাঁটুর হাড়ে আঙুল দিয়ে তাল ঠুকতে থাকে আজান বুড়ো।

তারু ঘড়ুই ভেঙচে উঠল, 'ঐ এক কথা। ধিনিক ধিনা, পাকা নোনা! আগে সব শুনে লাও।'

'বল্ বল্—'

মুখ কাঁচুমাচু করে স্থির হয়ে বসল আজান বুড়ো।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, থির হয়ে বোস। সব শোন। তার পর গাইতে হয় গেও, নাচতে হয় নেচো।'

কথার ভেতর বাগড়া পড়ায় তারু ঘড়ুই বেশ চটেছে।

আজান বুড়ো বলল, 'ভুল হয়েচে বাপু, ভুল হয়েচে। এই নাক মলচি, এই

কান মুলচি। এই ঘাট মানলাম। হল তো?'

খুশি খুশি মুখে তারু ঘড়ুই শুরু করল, 'অনাছিষ্টির কথা শোন। দুটো ডবকা বয়েসের মেয়েছেলে। তাদের ভেতর এক জোয়ান মদ্দ। তা সে যদি জ্ঞেয়াতি-কুটুম কিচু হত! জ্ঞেয়াতি কুটুম কি! চেনাশোনাই নেই। নদীর পারে কুড়িয়ে পেলম তো ঘরে এনে তুললম। ছ্যা ছ্যা—'

কে যেন ফোড়ন কাটল, 'জ্ঞেয়াতি কুটুম নয়, তোমায় কে বলেচে?'

'কে র‍্যা নচ্ছারের ব্যাটা?

তারু ঘড়ুই ক্ষেপে উঠল।

'আমি লোটন—'

বলতে বলতে হি-হি করে হেসে উঠল লোটন।

লোটন খেয়া-পারানির মাঝি।

তারু ঘড়ুই বলল, 'গুয়োটা, তুইও এসে জুটেচিস?'

'সব্বাই জুটল, আমি বাদ থাকব?'

'তা কেন থাকবি মানিক, ইদিকে আয়।'

লোটন তারু ঘড়ুইর পাশে এসে ঘন হয়ে বসল।

তারু ঘড়ুই বলল, 'কী কইচিলি র‍্যা নচ্ছারের ব্যাটা? উই জোয়ান মদ্দটা শ্যামের মাগ আর বোনের কোন্ জন্মের কুটুম?'

হি হি করে হাসতে লাগল লোটন। টেনে টেনে বলতে লাগল, 'জোয়ান মদ্দ যে জোয়ান মেয়ের চের কালের কুটুম গো।'

লোটনের কথা শুনে গুলতানিটা খিসখিসিয়ে হেসে উঠল।

তারু ঘড়ুই খেঁকিয়ে উঠল; 'এই শালারা চুপ। খুব যে হাসচিস; সব কথা শুনেছিস? শুনলে হাত-পা পেটের ভেতর সেঁদিয়ে যাবে।'

হাসি থামল। সবাই বলল, 'কী ব্যাপার?'

'ব্যাপার আবার কি। উই শ্যামের বউ কামিনী—বুঝলে মাগীর চরিত্তির বড় খারাপ। যেদিন শ্যাম লড়াইতে গেল, সেদিন থেকেই জানি। জানতে বুঝতে কিচু আমার বাকী নেই। আঁধা তো লই, চোখে সব পড়ে। কালা তো লই, কানে সব ঢোকে। শ্যামের বউর লষ্টামি অনেক সয়েচি, আর না।'

তারু ঘড়ুইর গলা চড়তে লাগল, 'মাগী নিজে কি একা! শ্যামের বোনটাকেও লষ্ট করল। এই এক ঘর, বুঝলে কিনা, এই এক ঘর রানীর হাটের সব ঘর লষ্ট করবে। তোমরা দেখে লিও। দাগী আম, বুঝলে কিনা, দাগী আম আর দাগী

মাগী এক জিনিস। একটা মাগী সব কটাকে দাগ ধরাবে। আমার কথাটা তোমরা যাচাই করে নিও।'

হাঁটুতে থুতনি গেঁথে উনুনের পাশে বসে ছিল আজান বুড়ো। দুই ঠোঁটে চাবি আঁটা। চোখজোড়া চকচক করছে।

এবার মুখ খুলল আজান বুড়ো, 'কী হয়েচে তারু? কামিন-বৌ করেচে কী? অত গাঁক গাঁক করচিস!'

'অ্যাদ্দিন লুকিয়ে চুরিয়ে ঢাকা চাপা দিয়ে চালাচ্ছিল। এখন সবার চোখের সামনে আরম্ভ করেচে। ঘরে লাগর পুষচে!'

মনে মনে আজান বুড়ো বলল, 'ধিনিক ধিনা, পাকা নোনা।'

মনের কথা কিন্তু মনেই রইল। মুখ থেকে অন্য কথা বেরুল, 'বলিস কী?'

'হ্যা গো।'

উত্তেজনায় গলার শিরগুলো দড়ির মত পাকিয়ে উঠেছে। কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে। আঙুল দিয়ে ঘাম চেঁছে ফেলল তারু ঘড়ুই। ভাঙা, খ্যাস-খ্যাসে গলায় চিল্লাতে লাগল, 'সায়েব খুড়ো গিয়েচিল শ্যামের বাড়ি। কত করে সে বোঝালে, ঘরে পুরুষ মানুষ নেই। একজন অচেনা মদ্দকে রাখলে দুন্নাম রটবে। তার চেয়ে আমার সঙ্গে উই গির্জে-বাড়িতে গিয়ে থাক। তা শ্যামের বউ কী করল জান?'

'কী? কী? কী?'

চার পাশ থেকে সবাই ছেঁকে ধরল।

'সিধে সায়েব খুড়োকে হাঁকিয়ে দিলে। মাগী বললে, আমি মদ্দটার পেরাণ দিয়েচি। তাকে আমি ছাড়ব না।'

একটু থেমে তারু ঘড়ুই বলল, 'মেয়েমানুষের বুকের পাটা কত! তা যে যাই বল, শ্যামের বউকে অমনি অমনি ছাড়ব না। রানীর হাটের সবাইকে ডেকে বিচার বসাব। তোমাদের কী মত?'

'আমাদের মত আছে।'

সকলে একসঙ্গে সায় দিল।

এবার আজান বুড়োর দিকে তাকাল তারু। বলল, 'তুমি কী বল খুড়ো?'

আজান বুড়ো কিছু বলল না। তার শুকনো, কোঁচকানো মুখে দুর্বোধ্য, অদ্ভুত একটু হাসি ফুটল।

আজান বুড়োর মনে কী আছে কে জানে?

একসময় গুলতানিটা ভেঙে গেল।

তারু ঘড়ুই, লোটন, অনন্ত—একে একে সবাই চলে গিয়েছে।

সামনের গেরুয়া নদীটা আবছা হয়ে গিয়েছে। কুদঘাটে টিম টিম করে তেলের বাতি জ্বলছে। শিশুগাছ দুটো ঝাপসা দেখায়।

চারদিক কেমন যেন নিরানন্দ, বিষণ্ণ হয়ে গেল।

রাত্রি নামল।

জোনাকিগুলো আলোর ছুঁচের মত অন্ধকারকে ক্রমাগত বিঁধছে। ঠাণ্ডা, হিম হিম উত্তুরে বাতাস ছুটেছে। শ্মশানের দিক থেকে পোড়া মাংসের বোটকা গন্ধ আসছে।

খেয়াপারানির ঘাট থেকে একটা মিঠে গানের গলা ভেসে আসছে—

হেই গো নাগর,
অঙ্গে আমার বান ডেকেচে
চক্ষে তোমার ঘোর লেগেচে,
হেই গো মরদ—

একটুক্ষণ কান খাড়া করে শুনল আজান বুড়ো। নির্ঘাত লোটন গাইছে। মনে মনে তারিফ করল আজান। লোটন গায় বড় খাসা।

সবাই চলে গিয়েছে।

পেল্লায় উনুনটার পাশে কুঁজো ঘাড়ে উবু হয়ে বসে রয়েছে আজান বুড়ো। যুদ্ধের আমলে রানীর হাটের নিশুতিপুরে হাজার বাতি জ্বলেছিল। যুদ্ধ গেল তো সঙ্গে সঙ্গে সব জলুস ধুয়ে মুছে নিয়ে গেল। বিজলী বাতিগুলো আজকাল অকেজো হয়ে গিয়েছে।

রানীর হাট আবার যে-কে সে-ই হয়ে গেল। সেই গাঢ় চাপ চাপ ঘন অন্ধকারের নিশুতিপুর।

অন্ধকারের দিকে চেয়ে চেয়ে আজকের গুলতানির কথাগুলোই ভাবছিল আজান বুড়ো।

শ্যামের বউ আর বোন নদীর ধার থেকে এক জোয়ান মদ্দকে হুট করে ঘরে নিয়ে তুলেছে। ভাল ভাল। হ্যালিডে সায়েব তাকে গির্জে-বাড়িতে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, কামিনী-বৌ হাঁকিয়ে দিয়েছে। বেশ কথা।

তারু ঘড়ুই ক্ষেপেছে। রানীর হাটের সবাইকে ডেকে শ্যামের বউর বিচার করবে। খাসা মতলব।

তা হলটা কী ?

মাঝখান থেকে নগদ দামে আজ চা বিক্রী হয়ে গেল। ন-সিকে পয়সা মবলগ হাতে এসেছে।

প্রাণে ফূর্তির বান ডাকল আজান বুড়োর। হাঁটুর শুকনো, পাকা হাড়ে তাল বাজাতে বাজাতে পুরনো গানটা জুড়ে দিল—

ধিনিক ধিনা, পাকা নোনা,
দুধে পড়ল গোরুর চোনা
ধিনিক ধিনা—

॥ ৮ ॥

দাওয়ার খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে চুপচাপ বসে ছিল সখারাম।

চোখের সামনে কার্তিকের রোদ নিবে আসছে।

দূরে গির্জের চুড়োটা ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল সখারাম।

একঝাঁক তিতির পাখি ছোট ডানায় বড় আকাশ মাপতে মাপতে নদীর দিকে চলেছে। পাখিদের পিছু পিছু সখারামের চোখ দুটো অনেক দূর পর্যন্ত ধাওয়া করে গেল। এক সময় তিতিরগুলো গির্জে পেরিয়ে অনেক, অনেক দূরে কোথায় যেন হারিয়ে গেল।

চোখ দুটো আকাশ থেকে মাটিতে ফিরিয়ে আনল সখারাম।

ছাইগাদাটার পাশে বসে সুখী বুড়ী গোবর ছানছে আর বিড় বিড় করে বকছে। মাঝে মাঝে নিদাঁত ফোগলা মুখে হেসে উঠছে।

ঝিরঝিরে একটু হাওয়া দিয়েছে। ছাইটিবির মাথায় পেঁপে গাছ। পেঁপের নধর, সবুজ পাতাগুলি কাঁপছে।

ছাইটিবি আর গোবরের গন্ধে বাতাস মাত হয়ে আছে। সব ছাপিয়ে চার পাশ থেকে ভিজে ভিজে হাওয়া আর রোদেমাখা কার্তিক মাসের মিঠে সুঘ্রাণ উঠছে।

অলস চোখে তাকিয়ে ছিল সখারাম। নিজের কথাই ভাবছিল।

হেই মা গোসানী !

দু দিন আগেও সে কোথায় ছিল, আর আজ কোথায় এসে পড়েছে ! নদীতে

ষাঁড়াষাঁড়ির বান ডেকে নৌকোডুবি না হলে সে কি এখানে, কামিনী-বৌদের এই ইটের পাঁজায় এসে ঢুকত ?

হঠাৎ অন্য একটা ভাবনা সখারামের মাথায় এল।

শুধু কি এবারই, তার জীবনে কতবার যে ষাঁড়াষাঁড়ির বান ডাকল, সে হিসেব কে রাখে ? বানই যদি না ডাকবে, নৌকো ডুববে কেন ? আর নৌকো না ডুবলে ঘাটে ঘাটে, ঘরে ঘরে সে ঠাঁই পায় কেমন করে ?

জীবনভর তো এখানে-সেখানে ঘুরেই মরছে সখারাম !

মনের মধ্যে চিন্তাটা হঠাৎ ছিঁড়ে গেল।

ছাইগাদার পাশ দিয়ে রাজ্যের মুলি বাঁশ টেনে আনছে দু জনে ; তিতাসী কামিনী-বৌ।

কাঁচা বাঁশ। এইমাত্র ঝাড় থেকে কেটে আনা হয়েছে।

উঠোনের মাঝখানে বাঁশগুলো ডাঁই করে তিতাসী আর কামিনী-বৌ দাওয়ায় এসে বসল।

সুখী বুড়ী একবার বাঁশগুলোর দিকে তাকাল। তারপর পেছন ঘুরে আগের মতই গোবর ছানতে লাগল।

বাঁশ কেটে আনতে বেশ হয়রান হয়ে পড়েছে। আঁচল নেড়ে নেড়ে তিতাসী আর কামিনী-বৌ বাতাস খায়।

চুপচাপ। কেউ কথা বলে না।

একটু ধাতস্থ হয়ে কামিনী-বৌ ডাকে, 'হেই গো—'

'উঁ—'

একটু নড়ে-চড়ে বসল সখারাম। বলল, 'কিছু কইলে ?'

'কইলম তো। অমন মুখে কুলুপ এঁটে আছ কেন ?'

'কোতায় ? এই তো কথা কইচি।'

সখারাম বলতে লাগল, 'তা বাঁশ কেটে আনলে বুঝি ?'

'আর বুঝি কথা খুঁজে পেলে না ?'

কামিনী-বৌ ঢলে ঢলে হাসতে লাগল।

আড়চোখে সখারাম দেখল, ঠোঁট টিপে টিপে তিতাসী একঠা সূক্ষ্ম হাসিকে মেরে ফেলেছে। সে হাসিতে শব্দ নেই, কিন্তু ধার আছে।

কামিনী-বৌ এবার বলল, 'একটা কথা বলছিলম—'

'বলে ফেল।'

'হ্যাঁ, বলেই ফেলব।'

কপালে খাঁজ ফেলে এক মুহূর্ত কী যেন ভেবে নিল কামিনী-বৌ। কেশে গলাটা সাফ করল। তারপর শুরু করল, 'আমাদের ঘরদোর তো দেখলে?'

'দেখলম।'

'দেখছ তো, রাজপ্রাসাদ নয়। ন শ' পঞ্চাশ মন ধানও ওঠে না বছরে। দু-দশ বিঘে ভুঁইও নেই। বুঝতেই পারছ সব। কী বল?'

সরাসরি সখারামের মুখের দিকে তাকিয়ে কামিনী-বৌ বলতে লাগল, 'তিতাসীর ভাই ঘরে থাকলে এমন হাল হত নি।' একটু থেমে বলে, 'তা যে নেই, তার কথা ছাড়ান দ্যাও।'

সখারাম মুখ ফুটে কিছু বলল না। শুধু মাথা নাড়ল।

কামিনী-বৌ আবার বলল, গলাটা তার গাঢ় শোনাতে লাগল, 'ঘরে একটা পুরুষ মানুষ নেই। সাতটা বচ্ছর আমরা তিনটে অবোলা মেয়েছেলে কেমন করে যে পেটের ভাত, গায়ের কাপড় যুগিয়েছি, ভগমান জানে। তার ওপর দুন্নাম। ইদিকে দুন্নাম, উদিকে দুন্নাম। দুন্নামের ঠ্যালায় পথ চলতে পারি নি, কান পাততে পারি নি।'

'দুন্নাম কেন?'

অবাক হয়ে কামিনী-বৌর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল সখারাম।

আচমকা ছাইগাদার পাশ থেকে খলখলিয়ে হেসে উঠল সুখী বুড়ী। কী মনে করে হাসল, সে-ই জানে।

হাসির শব্দে সখারাম চমকে উঠল।

অল্প একটু হাসল কামিনী-বৌ। সখারামের মনে হল, সে হাসিতে অনেকখানি কান্না মিশে আছে।

ঝাপসা গলায় কামিনী-বৌ বলল, 'দুন্নাম যে কেন বটে, তা তুমি বুঝবে না মিনসে। হতে জোয়ান বয়সের মেয়েমানুষ, মাথার ওপর না থাকত একটা ব্যাটাছেলে, তবে বুঝতে কেন দুন্নাম বটে।'

সখারাম অস্ফুট একটা শব্দ করল। কী যে বলল, বোঝা গেল না।

এক-একসময় কামিনী-বৌকে কথায় পায়। আজ যেন তার কী হয়েছে।

সাত বছর হল যার সোয়ামী যুদ্ধে গিয়েছে, উঠতে-বসতে আগে-পিছে যার শুধু দুন্নাম সইতে হয়, তার মনে যে কত কথা জমে আছে, কে তার হিসেব রাখে?

সাত বছর মুখ বুজে আছে কামিনী-বৌ। দুঃখে দুঃখে বুকটা যখন ফেটে

চৌচির হয়েছে, যখন মনের ভেতর হাজারটা ব্যথা পেরেক ফুটিয়েছে, তখন হাতের কাছে এমন একটা মানুষ পায় নি যাকে দুটো কথা বলে কামিনী-বৌ জুড়োতে পারে।

আজ কথায় পেয়েছে কামিনী-বৌকে।

এত দিন সাত বছরের জমানো দুঃখকে বুকের মধ্যে কুলুপ এঁটে রেখেছিল। সেই কুলুপটা আজ খুলে গিয়েছে। নইলে যে সখারামের সঙ্গে মোটে দু দিনের জানাশোনা, তার কাছে মনের কথা, ঘরের কথা, সংসারের কথা এত ফলাও করে বলবে কেন কামিনী-বৌ!

কামিনী-বৌ বলতে লাগল, 'ইদিকে পেটের ভাত আর পরার কাপড়ের জন্যে তিতাসী, আমি আর শাউড়ি কী না করেছি! ডালা-কুলো বুনেচি; হোগলা দিয়ে ছ্যাটাই বুনেচি—বিবির বাজারের হাটে সে সব বেচে চাল কিনেচি। বাদা থেকে গোবর কুড়িয়ে এনে ঘুঁটে দিয়েচি। কেউ হয়তো বিইয়েচে। তার ছেলের জন্যে সেরখানেক চালের বদলে আস্ত একটা কাঁথা শেলাই করে দিয়েচি। আরো কত—'

বলতে বলতে হঠাৎ উদাস হয়ে গেল কামিনী-বৌ।

'বল না, কী বলছেলে—'

সখারাম তাড়া দেয়।

'কইব, সব কইব। আমাদের ঘরে যেথন একবার সেঁদিয়েই (ঢুকে) পড়েচ, তেথন একে একে সব শুনবে, সব দেখবে। কিচ্ছুটি বাকী থাকবে নি। এখন উঠি গো মিনসে। সাত বছরের দুঃখুর কথা একদিনে বলা যায়!'

কামিনী-বৌ উঠতে উঠতে বলল, 'সন্ধ্যে হল, পিদিম জ্বালতে হবে।'

গির্জেটার ওপারে সূর্যটা কখন টুপ করে নেমে গিয়েছে। আকাশে ছাই ছাই সীসের রঙ ধরেছে।

কামিনী-বৌ ইঁটের পাঁজাটায় ঢুকল। পিছু পিছু তিতাসীও।

বাঁশের খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল সখারাম।

রঙ মরে মরে আকাশটা কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে। পেঁপে গাছের মাথায় ফিকে ফিকে কুয়াশা জমতে শুরু করেছে।

আবছা আবছা অন্ধকারে সুখী বুড়ীকে ঠিকমত দেখা যাচ্ছেনা। ছাইগাদাটার পাশে কুঁজো পিঠে উবু হয়ে আপন মনে সে গোবর হাঁটকাচ্ছে।

সবে কার্তিকের শুরু। এর মধ্যেই হিম মিশে বাতাস ঠাণ্ডা আর ভারী হয়ে উঠেছে। বাতাসটা এতক্ষণ যেন খাপে আটকানো ছিল। হঠাৎ সেটা বেরিয়ে

সাঁই সাঁই করে ছুটতে শুরু করেছে।

কাপড়ের খুঁটটা গায়ে বেশ ঘন করে জড়িয়ে নিল সখারাম।

সীসে রঙের আকাশটা এখন কালো হয়ে গিয়েছে।

অনেক দূরে গির্জের মাথায়, প্রথম প্রথম সখারামের মনে হয়েছিল জোনাকি মিট মিট করছে। ভাল করে দেখে বুঝল, জোনাকি না তারা ফুটেছে।

উঠোনের একপাশে একটা জামরুল গাছ। জামরুলের পাতায় থোকা থোকা অন্ধকার জমে আছে। আগাগোড়া নিজের জীবনটার কথাই ভাবছে সখারাম।

জীবনভর তো ঘাটে অঘাটেই ঘুরে মরছে। সেই যেদিন জ্ঞান হল, বুদ্ধি ফুটল, সেদিন থেকেই তার ছোটা শুরু। উত্তর থেকে দক্ষিণে, সমুদ্রের দিকে ছুটে চলেছে সে।

নিজের বাপকে দেখে নি সখারাম। যে মা তাকে পেটে ধরেছিল, তার কথাও মনে পড়ে না। পরের বাপকে বাপ ডেকে, পরের মাকে মা বলে, পরের ঘরকে নিজের ঘর মেনে সে শুধু ছুটেই চলেছে।

সমুদ্র এখনও কত দূরে কে বলবে?

সারা জীবন কত জাতের কত ধাতের মানুষই না দেখল সখারাম। মানুষের কত খেলাই না দেখল। যাক্ গে সব! পুরনো কথা ভেবে কী হবে!

অন্ধকারে নিশব্দে একটু হাসল সখারাম।

পুরনো ভাবনাটা ঝেড়ে ফেললে কি সখারামের পিছু ছাড়ে! নিরিবিলি একটু বসল কি হাজারটা চিন্তা মাথার ভেতর পেরেক ফোটাতে শুরু করল।

অথচ তার ঘর নেই, সংসার নেই, বউ নেই, ছেলে নেই। তবু ভাবনা!

সখারাম গুন্ গুন্ করে গান জুড়ে দিল—

'মন,

তুই কত ভাবন ভাববি রে বল,

ভেবে ভেবেই হবি বিকল।

ভাবন ছেড়ে এবার রে তুই

খোঁজ রে লতুন ছল।

মন,

সারা জন্ম ভেবে ভেবে-এ-এ-এ—'

চোখ বুজে গলা ছেড়ে গাইছিল সখারাম।

হঠাৎ পিঠের ওপর ঠাণ্ডা একটা হাত এসে পড়ল। কেঁপে গলাটা থেমে গেল।

সুখী বুড়ী কখন যেন ছাইগাদার পাশ থেকে উঠে এসেছে। তার হিম হিম, কাঁপা কাঁপা আঙুলগুলো কেঁচোর মত সখারামের পিঠময় বেয়ে বেড়াচ্ছে।

হেই মা গোসানী!

পিঠটা সির সির করছে। চমকে ঘুরে বসল সখারাম।

নিদাঁত ফোগলা মুখে খিসখিসিয়ে হেসে উঠল সুখী বুড়ী। হাসির দাপটে তার জীর্ণ, দুর্বল দেহটা কাঁপতে লাগল।

দু দিন হল কামিনী-বৌদের এই ইটের পাঁজায় এসে ঢুকেছে সখারাম। এখন পর্যন্ত তার সঙ্গে কথা বলে নি সুখী বুড়ী।

অবাক হয়ে সুখী বুড়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল সখারাম।

মুখের শুকনো চামড়া কুঁচকে রয়েছে। গর্তের ভেতর ঘোলাটে চোখ দুটো বোঝা যাচ্ছে না। শনমুড়ি চুল বাতাসে উড়ছে। গা-ময় গোবরের গন্ধ। বুকের মধ্যে কেমন যেন ঘড়ঘড়ানি। সুখী বুড়ীকে দেখতে দেখতে বুকটা কেমন যেন ছম ছম করে উঠল সখারামের।

কিছু হয়তো বলতে চায় সুখী বুড়ী। শোনার জন্য উন্মুখ হয়ে রইল সখারাম।

অনেকটা সময় কেটে গেল। কিন্তু কিছুই বলল না সুখী বুড়ী। সখারামের পিঠে হাত রেখে দাঁড়িয়ে রইল।

এক সময় সখারামকে ছেড়ে ছাইগাদাটার দিকে চলে গেল সুখী বুড়ী।

রাত আরো গাঢ় হয়েছে।

একটা ডিবে জ্বালিয়ে টিপ করে দাওয়ায় এনে রাখল কামিনী-বৌ।

কেরোসিনের ডিবে। তার যত না আলো, তার চেয়ে হাজার গুণ বেশী ধোঁয়া। ডিবের আলোতে ঘন অন্ধকারটা ফেঁসে গিয়েছে। আবছা ঝাপসা, কুয়াশার মত একটু আলো। তাতে কিছুই স্পষ্ট নয়।

কামিনী-বৌ বলল, 'হাত-পা ধুয়ে এস ব্যাটাছেলে।'

'কেন?'

'ছাখো বাপু, এ তো রাজার ঘর লয়। যে তমস্ত (সমস্ত) রাত ঝাড় জ্বলবে।'

'ও।'

চুপচাপ খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে বসেই রইল সখারাম। উঠে হাত-পা ধুয়ে আসার কোন চাড়ই নেই তার।

কামিনী-বৌ এবার ঝেঁঝে উঠল, 'হল কী তোমার। উঠচ না যে!'

'অমন তাড়া দিচ্চ কেন ?'

'কথাটা না কইয়ে ছাড়বে না দেখচি। ঘরে পোড়াবার তেল (কেরাসিন) বাড়ন্ত। উই এক ডিবেই সম্বল। তাড়াতাড়ি হাত-পা না ধুয়ে এলে আঁধারে বসে খেতে হবে। বুঝেচ ?'

'বুঝলম।'

বিব্রত মুখে উঠে পড়ল সখারাম।

ইঁটের পাঁজাটার পেছনে ছোট একটা ডোবা। ডোবা থেকে হাত-পা ধুয়ে সখারাম যখন ফিরল, ডিবেটার তেজ মরে এসেছে। প্রচুর ধোঁয়া উঠছে। যে অন্ধকারটা ফেঁসে গিয়েছিল, আবার সেটা রিপু হতে শুরু করেছে।

দাওয়ায় ছেঁড়া চ্যাটাই পেতে দিল কামিনী-বৌ। সখারাম বসে বসে কোঁচার খুট দিয়ে হাত পা মুছতে লাগল।

কানা ভাঙা চটা ওঠা কলাইয়ের থালায় ড্যালা পাকানো কড়কড়ে খানিকটা ভাত, একটু ফ্যান্‌সা কালচে ডাল আর এক দলা সেঁচি শাক সেদ্ধ বেড়ে সখারামের সামনে রাখল কামিনী-বৌ।

ডিবের আলোটা দপ্ দপ্ করল বার দুই। ফট্ ফট্ একটু শব্দ হল। যেটুকু বা আলো পাওয়া যাচ্ছিল, একটা দমকা উত্তুরে বাতাস এসে তাও মুছে নিল।

এখন নিরেট, ঘন, ঠাস বোনা অন্ধকার।

কামিনী-বৌ বলল, 'ডিবেটা নিবল, আপদ চুকল। তা ভালই হল ব্যাটাছেলে, কী বল ?'

সখারাম সায় দিল, 'তুমি যেখন কইচ—'

'মাছ তো আর নি যে কাঁটা বাছতে হবে। নইলে গলায় বিঁধবে। বিউলির ডাল আচে ; সাপটে ভাত মেখে মুখে পোর, ঠিক গলা বেয়ে নেমে যাবে।'

কামিনী-বৌ হেসে উঠল।

একটুক্ষণ চুপচাপ।

কামিনী-বৌ আবার বলল, 'সায়েবখুড়ো তোমাকে নিতে চেয়েছেল। তেখন তুমাকে ছেড়ে দিলেই ভাল করতাম।'

'কেন ?'

চমকে অন্ধকারেই মুখ তুলল সখারাম।

'এখেনে তুমার কত কষ্ট। খাবার কষ্ট। থাকার কষ্ট। সায়েবখুড়োর সঙ্গে গেলে ভাল খেতে, গির্জের পাকা দালানে থাকতে।'

'ও।'

মুখ নামিয়ে আবার গরাসের পর গরাস মুখে পুরতে লাগল সখারাম। ভাত খাওয়ার হুস হাস শব্দ হতে লাগল।

এবার বেশ খানিকটা চুপচাপ কাটল। কেউ কিছু বলছে না। কামিনী-বৌ নয়, সখারাম তো নয়ই। অন্ধকার ইটের পাঁজাটার ভেতর তিতাসী খুট খাট শব্দ করে কী যে করছে, সে-ই জানে। ছাই গাদাটার পাশে সুখী বুড়ী গোবর ঘাঁটছে তো ঘাঁটছেই।

জামরুল গাছের মাথায় থোকা থোকা অন্ধকার বাতাসের ঘা খেয়ে নড়ে নড়ে উঠছে। পেঁপের লম্বা লম্বা ডাঁটাগুলো অল্প অল্প কাঁপছে।

সখারাম খেতে খেতেই আঁচ করল, কামিনী-বৌ কিছু একটা বলতে চায়। মনে মনে কথাটা বুঝি সে ভাঁজছে।

অন্ধকারেই কামিনী-বৌর মুখের দিকে তাকাল সখারাম। মুখটা ঠিক দেখা যাচ্ছে না। শুধু মুখ কেন, হাত পা মাথা, কামিনী-বৌর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। সামনা-সামনি খানিকটা নিরবয়ব অন্ধকার যেন জমাট বেঁধে বসে আছে।

সখারাম বলল, 'কিছু কইবে ?

কামিনী-বৌ থতমত খেয়ে গেল। কাঁপা কাঁপা কেমন যেন গলায় বলল, 'হ্যাঁ, তা' তা কইব, মানে—'

সখারাম হাসল। বলল, 'অমন করচ কেন ? মনে যা এয়েচে, মুখ দিয়ে বার করে ফেল। বল বল—'

'হ্যাঁ বলব।'

নিজেকে এবার সামলে নিয়েছে কামিনী-বৌ। আস্তে আস্তে সে বলতে লাগল, 'তুমার পেরাণ আমরা বাঁচিয়েচি। ঠিক কিনা ?'

'হ্যাঁ।'

'উই পেরাণটার ওপর এখন আমাদের জোর আছে।'

'তা আছে।'

'তাই কইছিলম, যদ্দিন তুমাকে এখেন থেকে যেতে না দোব, ত্যাদ্দিন যেতে পারবে না। বুঝলে ?'

কামিনী-বৌর গলাটা গাঢ় শোনায়।

'বেশ কথা, ভাল কথা, যাব না।'

'কথা দিলে ? কড়ার করলে ?'

মন্তর পড়ার মত সখারাম বলে ফেললে, 'কথা দিলম, কড়ার করলম।'

'তুমি মন্দ ছেলে, তুমার কথায় বিশ্বেস কী? এখেন থেকে বেরুলে তুমি যদি ফুড়ুত কর।'

'তবে তুমিই বল, কী করলে বিশ্বেস হবে?'

একটুক্ষণ কী যেন ভেবে নিল কামিনী-বৌ। তার পর সখারামের কাছে আরো একটু ঘেঁষে বসল। বলল, 'দিব্যি গেলে বল।'

'কিসের দিব্যি?

কামিনী-বৌ ফিস ফিস করে বলল, 'যার দিব্যি তুমার পেরাণ চায়—'

'যার দিব্যি খুশি!'

'হ্যাঁ।'

'বেশ—'

বিড় বিড় করে সখারাম কী যেন বলল।

হঠাৎ ছাইগাদাটার পাশ থেকে খল খল করে হেসে উঠল সুখী বুড়ী। সখারাম চমকে উঠল।

অন্ধকারেই সখারামের চমকানি টের পেল কামিনী-বৌ। কাঁপা কাঁপা গলায় সে ফিসফিসিয়ে উঠল, 'ডরাচ্চ কেন, শাউড়ি হাসচে। ও অমন হাসে। হাসি ওর ব্যামো। বুঝেচ?'

'বুঝলম।'

আরো অনেকটা সময় কেটে গেল। ছাইগাদাটার পাশ থেকে সুখী বুড়ী আর ইটের পাঁজাটার ভেতর থেকে তিতাসী দাওয়ায় এসে বসেছে।

সখারামের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। এঁটো হাতে সে চুপচাপ বসে আছে।

তিতাসী, সুখী বুড়ী আর কামিনী-বৌ—তিন জনে ভাত নিয়ে বসেছে।

কামিনী-বৌ বলল, 'অমনি অমনি বসে খেলে তো চলবে না, নইলে সোম্‌সার কেমন করে চলবে?' রোজগার-পাতি করতে হবে।

সুখী বুড়ীর দিকে ফিরে বলল, 'কী বল শাউড়ি?'

সুখী বুড়ী কৎ কৎ করে ভাত গিলছিল। ভাত গিলতে গিলতে কী যেন বলতে চাইল। সঙ্গে সঙ্গে বিষম খেল।

সখারাম বলল, 'বেশ কথা, ভাল কথা। রোজগার করব, তুমাদের সোমসার দেখব। পেরাণটা যেখন বাঁচিয়েচ, তখন তো তুমাদের কাচে আমার অনেক দায়।'

॥ ৯ ॥

তিতাসীদের সংসারের দায় মাথায় চেপেছে।

এবার থেকে রোজগার করতে হবে, উপায়ের খোঁজে বেরুতে হবে।

রোজগারের পথও দেখিয়ে দিয়েছে কামিনী-বৌ।

শনিবার শনিবার বিবির বাজারে হাট বসে। সারা হপ্তা তিতাসী, সুখী বুড়ী আর কামিনী-বৌ ধামা-কুলো-চাটাই বুনবে। শনিবারের হাটে গিয়ে সে সব বেচে আসবে সখারাম।

শনিবার ছাড়া হপ্তার অন্য দিনগুলো কি সখারাম বেকার বসে থাকবে? বেকার বসে থাকার জো আছে?

হপ্তার অন্য দিনগুলোর ব্যবস্থাও কামিনী-বৌ করে দিয়েছে।

খেয়াঘাটে তিতাসীদের একটা নৌকো ভাড়া খাটে।

নৌকোটা ভাড়া নিয়েছে গোকুল সাঁপুই। কড়ার ছিল দিনে আট আনা হিসেবে সে ভাড়া দেবে।

কিন্তু গোকুল ভারি সেয়ানা লোক। ফি রোজ তার কাছ থেকে ভাড়া আদায় করা এক ঝকমারি। কোন কোন দিন আদায়ও হয় না।

ঠিক হয়েছে, এবার থেকে সখারাম নৌকো বাইবে। সওয়ারী নিয়ে নদী পারাপার করবে।

আজ শনিবার।

চাটাই-ধামা-কুলো নিয়ে বিবির বাজারের হাটে চলেছে সখারাম।

এখনও ভাল করে সকাল হয় নি।

ফরাসীদের গির্জে পেছনে রেখে, মোগলের বরুজ বাঁয়ে আর পাঠানের গম্বুজ ডাইনে ফেলে নদীপারের সড়কে এসে উঠল সখারাম।

পুব দিকটা জুড়ে গাঢ়, সাদা কুয়াশার পর্দা ঝুলছে। কুয়াশা বিঁধে বিঁধে সোনার তারের মত রোদ আসতে শুরু করেছে।

নদীতে উজানের টান নেই। এখন ভাঁটি। তিরতিরে নিরুত্তেজ স্রোত রূপসীর গেরুয়া জলকে উত্তর থেকে দক্ষিণে, সমুদ্রে নিয়ে চলেছে।

পারের থকথকে, ঘন কাদায় দীর্ঘ, ধারাল ঠোঁট খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কাদাখোঁচা

পাখিগুলি বৃথাই কী যেন খুঁজে মরছে।

সড়কের বাঁ পাশে সারি সারি বিজলীবাতির পোস্ট। যুদ্ধ থামার সঙ্গে সঙ্গে বাতিগুলি অকেজো হয়ে গিয়েছে। তার ছিঁড়ে গুটিয়ে রয়েছে। ছেঁড়া তারে পেঁজা তুলোর মত থোকা থোকা কুয়াশা ঝুলছে।

হন হন করে পা চালিয়ে দিল সখারাম। বিবির বাজারে গিয়ে দুপুরের হাট ধরতে হবে।

কুদঘাটের কাছাকাছি আসতেই ডাকটা শুনতে পেল সখারাম।

'হেই—হেই রে—'

কাকে না ডাকছে? প্রথমটা খেয়াল করে নি সখারাম।

'হেই—হেই রে, শুনতে পাচ্ছ নি?'

এবার সখারাম থমকে দাঁড়াল। সামনে-পেছনে, ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এদিক-সেদিক দেখতে লাগল। ডাকটা যে কোথা থেকে আসছে, ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না সে।

'এই যে ইদিকে—বাঁ পাশে—'

সন্দেহটা ঘুচল সখারামের। চোখেও পড়ল।

সড়কের বাঁ পাশে একটা চায়ের দোকান। সেখান থেকেই কেঁকলাসের মত লিকলিকে, লম্বা হাত বাড়িয়ে একটা বুড়ো ডাকছে, 'আয়, আয়—'

যাবার ইচ্ছা ছিল না।

কামিনী-বৌ বার বার বলে দিয়েছে, 'কোথাও গাঁজা-গুলির আড্ডায় জমে যেও নি। ঘরে একদানা চাল নি। ডালা-কুলো বেচে চাল আনবে, তবে রান্না চাপবে। হাট ফসকালে সারা হপ্তা উপোস দিয়ে থাকতে হবে। মনে থাকে যেন।

কামিনী বৌ এই তিন-চার দিনের ভেতরই বুঝি তার স্বভাব খানিকটা আঁচ করতে পেরেছে।

সখারাম একবার ভাবে, যাবে না। আড্ডায় মজে গেলে এ হাট আর ধরতে হবে না। হাট থেকে চাল না নিয়ে ফিরলে কপালে কী আছে কে জানে?

এই ক'দিনে কামিনী-বৌর স্বভাবও খানিকটা খানিকটা আন্দাজ করতে পেরেছে সখারাম।

চায়ের দোকানের বুড়োটা এবার খেঁকিয়ে উঠল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অত কি ভাবচিস? আয় না ছোঁড়া—'

মনের দিক থেকে পুরোপুরি সায় নেই, তবু সখারাম এল। বিরক্ত গলায় ঝাঝিয়ে উঠল, 'চেনা নি, জানা নি, অত ডাকাডাকি করচ কেন? কী দরকার?'

'চেনা-জানা হতে কতক্ষণ! দরকারের কথা শুদোচ্চিস? তোকে ঢের দরকার—'

একটা চোখ কুঁচকে বুড়োটা অল্প একটু হাসল।

'দরকারী কথাটা খর খর (তাড়াতাড়ি) সেরে লাও। আমায় হাটে যেতে হবে।'

'যাবি যাবি—আগে মোজ করে চা খা। দু-চারটে সুখ-দুঃখুর কথা কই। বুঝলি কি না—'

খ্যা খ্যা করে বুড়োটা হাসতে লাগল।

সখারাম চটে যাচ্ছিল। রাগটাকে মনের ভেতর দাবিয়ে রেখে বলল, 'সুখ-দুঃখুর কথা কয়ে তুমার কাজ নি। আমারও চা খেয়ে কাজ নি। বেলা হল, আমি চললম—'

যাবার জন্য সড়কের দিকে পা বাড়াল সখারাম।

বুড়োটা হাঁই হাঁই করে উঠল, 'গোসা হচ্চিস কেন? চা খেয়ে মাথা ঠাণ্ডা করে যা। বিনি পয়সার চা। তোর কাছে পয়সা লোব না—'

'চা খেয়ে কাজ নি—'

'হেই মা গোসানী! ভেবেছিলম, ছোঁড়া বেশ চালাক-চতুর। নইলে রানীর হাটে এসে অমন জমিয়ে বসলে কেমন করে?'

সড়কের দিকে মুখ করে ছিল সখারাম। চমকে ঘুরে দাঁড়াল। বলল, 'তুমি আমাকে চেন না, তবু আমার কথা ভাবলে কেমন করে?'

'তোকে চিনি না, কিন্তুক তোর কথা তো শুনেচি—'

'আমার কথা শুনেচ!'

সখারামের বিস্ময় আর থই মানছিল না।

'শুনি নি আবার! রানীর হাটের সব্বাই শুনল, আর এই চায়ের দোকানের আজান বুড়োই খালি বাদ থাকবে! কী যে বলিস।'

বলতে বলতে হঠাৎ কাশির টান উঠল। কাশির দাপটে আজান বুড়োর শুকনো, জিরজিরে, অস্থিসার দেহটা ধনুকের মত বেঁকে দুমড়ে যেতে লাগল। চোখের ডেলা দুটো ঠেলে বেরিয়ে পড়ল। গলার শিরাগুলি নারকেল দড়ির মত পাকিয়ে পাকিয়ে উঠতে লাগল।

হাঁপানি আর কাশি। দশ বছরের পুরনো ব্যারাম। এই ব্যারামটা আজান বুড়োকে কাবু করে ফেলেছে। বয়সের তুলনায় অকালে পঙ্গু করে দিয়েছে।

গরম কালটা তবু একরকম কাটে। কিন্তু যেই কার্তিক মাসের হিম মাথায় পড়ল, হাঁপানি আর কাশি অমনি চাগিয়ে উঠল।

পুরো শীতকালটা, শীতকালটাই বা কেন, সেই ফাল্গুনের শেষাশেষি পর্যন্ত চায়ের দোকানের পেল্লায় উনুনটার পাশে বসে বসে আজান বুড়ো কাশবে আর হাঁপাবে।

কাশির দাপট একসময় কমে গেল। খুব একচোট হাঁপিয়ে হয়রান হয়ে পড়ল আজান বুড়ো। বুকের ভেতর থেকে অস্বচ্ছ, ঘড়ঘড়ে, কেমন এক ধরনের আওয়াজ বেরুতে লাগল।

খানিকটা ধাতস্থ হয়ে আজান বুড়ো বলল, 'তোর কথা ঢের শুনেচি। তুই তো লদের (নদের) নিমাই—'

'লদের নিমাই!'

কিছুক্ষণ অবাক হয়ে আজান বুড়োর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল সখারাম। তার পর হঠাৎ হাত নেড়ে, মাথা ঝাঁকিয়ে, তড়বড় করে বলে ফেলল, 'আমি লদের নিমাই না, সখারাম।'

সখারামের রকম-সকম দেখে খ্যা খ্যা করে হেসে উঠল আজান বুড়ো। হাসতে হাসতে বলল, 'ওই হল।'

বেলা চড়ছে।

রোদের তেজ বাড়ছে। পুবদিক-জোড়া কুয়াশার পর্দাটা এখন আর নেই। রূপসীর তিরতিরে গেরুয়া জলে ঢেউ উঠতে শুরু করেছে। সড়কে দু-এক জন করে হাটমুখো লোক দেখা দিচ্ছে।

সখারাম ব্যস্ত হয়ে উঠল। বেলা যেভাবে চড়ছে, আর দাঁড়িয়ে থাকলে এ হাট পাওয়া যাবে না। সে বলল, 'আমি চললম।'

'যাবি? তা বেশ কথা—'

আজান বুড়ো বলতে লাগল, 'যাবার আগে একটা কথা শুনে যা—'

'বলে ফেল।'

'কাছে আয়।'

সখারাম আজান বুড়োর কাছাকাছি ঘন হয়ে দাঁড়াল।

আজান বুড়ো বলল, 'য্যাখনই ফুরসুত পাবি, এখেনে চলে আসবি। য্যাখন খুশি, চা খাবি। পয়সা লাগবে নি।'

'এই কথা।'

'না। আরো আছে।'

'বল।'

এদিক-সেদিক তাকিয়ে, খানিকক্ষণ চোখ পিট পিট করল আজান বুড়ো। ঠোঁট মচকে মচকে হাসল। তার পর ফিস ফিস করে বলল, 'তুই ছোঁড়া পগেয়া বজ্জাত! লোকে আমায় বলে, হেঁতেল ঘুঘু। এখন দেখচি, তুই-ই হেঁতেল ঘুঘু।'

সখারাম হকচকিয়ে গেল।

আজান বুড়ো বলে চলল, 'ঘাবড়াস নি, তোকে হাজার বার তারিপ করচি। দু-দুটো ছুঁড়ির সঙ্গে—হেঁ-হেঁ—আঁই, বুঝলি কি না—'

কথাটা পুরো হল না। হাঁপানি আর কাশিতে আজান বুড়ো কাবু হয়ে পড়ল।

কাশির তোড়টা কমলে সখারাম বলল, 'আর কিছু কইবে?'

'কইব।'

একটু থামল আজান বুড়ো। সামনের নদীটার দিকে তাকাল। তার দৃষ্টিটা কেমন ঘোলাটে, আচ্ছন্ন, ধূসর হয়ে গেল।

ফিস ফিস করে সে বলল, 'দশ বচ্ছর আগে তোর মতন আমিও একদিন এই রানীর হাটে ভেসে এসেছিলম।'

'সত্যি?'

সখারাম তাজ্জব বনে গেল।

'হ্যাঁ রে, সত্যি। উই কামিনী-বৌদের শুদিয়ে দেখিস। থাক ও কথা। তোকে আর একটা কথা কইব।'

'কও।'

'কইছিলম—'

এক মুহূর্তে কী যেন ভেবে নিল আজান বুড়ো। গাঢ় মন্থর একটা নিশ্বাস ফেলল। তার পর বলল, 'আজ থাক অন্য দিন কইব। তোর হাটের বেলা হয়ে যাচ্চে।'

পেছন থেকে আজান বুড়ো চেঁচিয়ে বলল, 'ওই কথা রইল, ফুরসুত পেলেই চলে আসবি।'

ঘাড় কাত করে সখারাম জানালে, আসবে।

মনে মনে আজান বুড়ো খুব একচোট নেচে নিল। মুখে বলল, 'ধিনিক ধিনা, পাকা নোনা—'

॥ ১০ ॥

আজ আর বেরোয় নি সখারাম।

সকালে কাঁপিয়ে জ্বর এসেছিল। সাতটা মোটা মোটা কাঁথা আর চট চাপা দিয়েও কাঁপুনি ঠেকাতে পারে নি সে।

সারা দিন জ্বরে বেহুঁস হয়ে পড়ে আছে সখারাম। জ্বরের ঘোরে মাথা খাড়া করতে পারে নি।

একটু আগে ঘাম ছুটিয়ে জ্বরটা ছেড়ে গিয়েছে।

চট-পিচবোর্ড-কেরোসিন কাঠের খুপরিটায় চোখ বুজে চুপচাপ শুয়ে ছিল সখারাম।

কামিনী-বৌ ঢুকল। তার হাতে একটা তোবড়ানো সিলভারের বাটি।

ঘরে সাবু-বার্লি-শটি—কিছুই নেই। তাই বাটি ভর্তি করে ফ্যান নিয়ে এসেছে। সখারাম যাতে বুঝতে না পারে সেই জন্যে ফ্যানটা নুনে আর লেবুর রসে জারিয়ে কটকটে করে এনেছে।

কামিনী-বৌর সাড়া পেয়ে সখারাম চোখ মেলল।

রুক্ষ চুল, মুখখানা শুকিয়ে চুপসে গিয়েছে, চোখদুটো ঘোর ঘোর, লালচে। সখারাম অল্প একটু হাসল।

আঙুল দিয়ে কপাল দেখিয়ে কামিনী-বৌ বলল, 'সব এই কপালের দোষ। বুঝেচ মিনসে?'

'ঠিক বুঝলম নি।'

অবাক হয়ে কামিনী-বৌর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল সখারাম।

'বুঝলে নি! তা তুমি কেমন করে বুঝবে!'

একটু থামল কামিনী-বৌ। তার পর বলল, 'এ কপালে কিছুই সয় না। ভেবেছিলম তুমার পেরাণ দিয়েচি। তুমি আমাদের সোমসারের (সংসারের) একজন হয়ে গিয়েচ। ভেবেছিলম, ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাঙ তুলে তুমার কামাই খাব। তা একদিন হাট করে এসেই ব্যারাম বাধিয়ে বসলে! সবই অদ্দেষ্ট, এই পোড়া কপালের লেখা—'

সখারাম কিছু বলল না। চোখ বুজে পড়ে রইল।

কামিনী-বৌর কোন দিকে নজর নেই। কেউ তার কথা শুনছে কি না, সে দিকেও খেয়াল নেই। নিজেকে শুনিয়ে শুনিয়ে সে বলছে, 'যত গেরো! কোতায় তুমি আমাদের খাওয়াবে, তা নয়! এখন তুমাকেই খাওয়াই।'

বলতে বলতে তাড়া দিল কামিনী-বৌ, 'লাও, ওঠো! একবার পেরাণ দিয়েচি, এবেরে ব্যারাম সারাই। এই টুকুন খেয়ে লাও—'

একদিনের জ্বরেই বেজায় কাহিল হয়ে পড়েছে সখারাম। ককাতে ককাতে সে উঠে বসল।

কামিনী-বৌ ঠেস দিয়ে বলল, 'মাখমের শরীল না কি গো! একদিনের জ্বরে একেবারে টসকে গেলে! হেই মা গোসানী!'

বলে মুখে কাপড় গুঁজে খুক খুক করে হেসে উঠল।

কামিনী-বৌর হাত থেকে ফ্যানের বাটিটা নিয়ে ঢক ঢক করে খেয়ে ফেলল সখারাম। তার পর টান টান হয়ে আগা পাশ তলা কাঁথা মুড়ি দিয়ে মাচানের উপর শুয়ে পড়ল।

যাবার সময় কামিনী-বৌ বলে গেল, 'খর খর (তাড়াতাড়ি) ব্যারাম সারিয়ে ফেল। বসে বসে খাওয়া চলবে নি বাপু, সিধে কথা।'

কামিনী-বৌ যেই চলে গেল, অমনি মুখের উপর থেকে কাঁথা সরিয়ে দিলে সখারাম।

মাচানের ঠিক পাশেই বাখারির জানালা। জানালার ফাঁক দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল সখারাম।

বাইরে কার্তিকের ছোট দিনটা ফুরিয়ে আসছে।

এখনও নিবু-নিবু একটু আলো আছে। সে আলোতে তাপ নেই, তেজ নেই, কেমন যেন মরা-মরা, বিষণ্ণ।

চট-পিচবোর্ডের খুপরিটার ঠিক পেছনেই ছোটমত চৌকো একটা ডোবা। ডোবার কালো জল শুষ্‌নি, কলমি আর টোপা পানায় ঢেকে আছে।

চারপাশে উঁচু উঁচু মাদার আর সজনে গাছ। ডোবাটার ওপর সারাদিন গাছের ছায়া থাকে। জায়গাটা কেমন যেন ঠাণ্ডা, ছায়া-ছায়া, আচ্ছন্ন।

শুষ্‌নি আর কলমির গন্ধ আসছে। ডোবা থেকে ভিজে পাঁকের সোঁদা সোঁদা গন্ধ উঠছে। মনে হয়, সজনে আর মাদার গাছের ছায়ারও বুঝি গন্ধ আছে।

কাঁথার ভেতর থেকে গলাটা কাছিমের মত বার করে দিয়েছে সখারাম। কেন জানি তার মনে হচ্ছে, ডোবার ঐ স্নিগ্ধ ঠাণ্ডা ছায়ার রাজ্যটুকুতে বড় শান্তি।

মাদার গাছের ডালগুলো টুকটুকে লাল ফুলে ছেয়ে আছে। হাওয়া লেগে টুপ টুপ করে ফুল ঝরে পড়ছে।

সজনে গাছের মাথায় সাদা সাদা থোকা থোকা ফুল ফুটেছে। সুখী বুড়ী কোত্থেকে যেন এই জাতের গাছ জুটিয়ে এনেছিল। সারা বছর গাছগুলো ফুল ফোটায়, ফল ধরায়।

কামিনী-বৌ বলে, 'শাউড়ী যে কোত্থেকে এই গাছ আনলো! বচ্ছর ভর বিইয়ে বিইয়ে হয়রানি নেই গো। সারা বচ্ছর বিয়োচ্ছে তো বিয়োচ্ছে। ভাগ্যিস গাছগুলোন সজনে ফলায়, চিবিয়ে বাঁচি।'

সজনে গাছের ডালে ঝাঁকে ঝাঁকে থোকায় থোকায় ফুল এসেছে। ক'দিনের মধ্যেই ফল ধরবে।

শুষ্‌নি শাকের মাথায় গুটিকয় লাল ফড়িং উড়ছে। কিছুক্ষণ ফড়িংদের ওড়াওড়ি নাচানাচি দেখল সখারাম।

ফড়িং দেখতে দেখতেই গুনগুনানি কানে এল সখারামের। মৃদু, অনুচ্চ, আবছা আবছা, ঠিক বোঝা যায় না। ভোমরা ডানা কাঁপিয়ে যেমন শব্দ করে, অনেকটা সেই রকম।

কান খাড়া করে রইল সখারাম। অনেকক্ষণ পর সন্দেহটা ঘুচল। কেউ মিঠে সরু গলায় গুনগুন করছে।

কী গাইছে, ঠিক বুঝতে পারছে না সখারাম। অবশ্য সে জন্যে তার মাথা ব্যথাও নেই।

কাঁথাটা গায়ে জড়িয়ে মাচানের ওপর উঠে বসল সখারাম। বাখারির জানলাটার কাছে এগিয়ে এল।

যা আন্দাজ করেছিল, ঠিক তাই।

গুন গুন করতে করতে ডোবাটার পারে এসে দাঁড়াল তিতাসী। শ্যাম মালীর বোন, কামিনী বৌর ননদ তিতাসী।

ডোবার পারের মাটিতে খাঁজ কেটে খেঁজুরের গুঁড়ি ফেলে ঘাটলা বানানো হয়েছে।

ঘাটলায় নেমে এল তিতাসী।

সখারাম দেখতে লাগল।

না, ঠিকমত দেখা যাচ্ছে না। একটু কাত হয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে বসল সখারাম। এবার পুরোপুরি তিতাসীকে দেখা যাচ্ছে।

কলাই-করা তিনটে কানা-উঁচু থালা, একটু ছাই, দুটো বাটি, একটা লোহার কড়াই নিয়ে এসেছে তিতাসী।

এতক্ষণ গুন গুন করছিল। বাসন-কোসন মাজতে মাজতে তিতাসী গলা চড়িয়ে দিল।

গলা চড়াবার পরও গানের কথাগুলো বোঝা যাচ্ছে না। সখারামের কানে মৃদু সুরের একটা কাঁপুনি ছাড়া কিছুই আসছে না।

বাসন মেজে এক পাশে ডাঁই করে রাখল তিতাসী। তার পর ফাটা ফাটা গোড়ালিটা খেঁজুরের গুঁড়িতে ঘষে ঘষে লাল টুকটুকে করে তুলল।

বুকের ওপর কালো কালো ডোরাকাটা একটা হলদে গামছা জড়ানো। গামছাটা খুলে ঘাটলায় রাখল তিতাসী।

সজনে আর মাদার গাছের মাথা থেকে নিবু নিবু আলোটুকু মুছে যাচ্ছে। ডোবাটা আবছা, ঝাপসা হয়ে গিয়েছে।

এদিক ওদিক একবার তাকাল তিতাসী। তার পর নির্ভাবনায় জলে নেমে গেল। পাতলা, একপরতা শাড়িটা তার দেহে কতকগুলো উগ্র, তীব্র রেখা ফুটিয়ে লেপটে গেল।

নাক আর কানের ভেতর ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল সখারামের। মনে মনে ভাবল, তুমি ভেবেছ তিতাসী, চার পাশে গাছগাছালি, শুষ্‌নি আর কলমি, এই ডোবা, ফড়িংয়ের নাচানাচি ওড়াওড়ি ছাড়া আর কিছুই নেই।

তিতাসী, তুমি ভুল করেছ। আর একটু দেখে শুনে জেনে বুঝে নিলে পারতে। দেখতে কোথাও কোন পুরুষ-চোখ উঁকি দিচ্ছে কি না। তুমি সব পার তিতাসী, কিন্তু পুরুষের চোখকে ফাঁকি দিয়ে নিজের সুন্দর শরীরটাকে তুমি লুকিয়ে রাখতে পার কি?

যদি বুঝতে কেউ তোমাকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছে, পারতে, পারতে তুমি এমন নির্ভাবনায় পাতলা শাড়ি জড়িয়ে জলে নামতে? পারতে না।

হাত বুলিয়ে বুলিয়ে নরম দেহের মসৃণতা অনুভব করতে লাগল তিতাসী। শরীরটা কেমন ভরে উঠেছে। এটা যে তার নিজের শরীর ভাবতে কেমন ভাল লাগে, আবার ভয়ও হয়! বুকের ভেতর তির তির সির সির করে রক্ত কাঁপতে থাকে।

কাঁথার ভেতর থেকে গলাটা কাছিমের মত বার করে দিয়েছে সখারাম। কেন জানি তার মনে হচ্ছে, ডোবার ঐ স্নিগ্ধ ঠাণ্ডা ছায়ার রাজ্যটুকুতে বড় শান্তি।

মাদার গাছের ডালগুলো টুকটুকে লাল ফুলে ছেয়ে আছে। হাওয়া লেগে টুপ টুপ করে ফুল ঝরে পড়ছে।

সজনে গাছের মাথায় সাদা সাদা থোকা থোকা ফুল ফুটেছে। সুখী বুড়ী কোত্থেকে যেন এই জাতের গাছ জুটিয়ে এনেছিল। সারা বছর গাছগুলো ফুল ফোটায়, ফল ধরায়।

কামিনী-বৌ বলে, 'শাউড়ী যে কোত্থেকে এই গাছ আনলো! বচ্ছর ভর বিইয়ে বিইয়ে হয়রানি নেই গো। সারা বচ্ছর বিয়োচ্ছে তো বিয়োচ্ছে। ভাগ্যিস গাছগুলোন সজনে ফলায়, চিবিয়ে বাঁচি।'

সজনে গাছের ডালে ঝাঁকে ঝাঁকে থোকায় থোকায় ফুল এসেছে। ক'দিনের মধ্যেই ফল ধরবে।

শুষ্‌নি শাকের মাথায় গুটিকয় লাল ফড়িং উড়ছে। কিছুক্ষণ ফড়িংদের ওড়াওড়ি নাচানাচি দেখল সখারাম।

ফড়িং দেখতে দেখতেই গুনগুনানি কানে এল সখারামের। মৃদু, অস্বচ্ছ, আবছা আবছা, ঠিক বোঝা যায় না। ভোমরা ডানা কাঁপিয়ে যেমন শব্দ করে, অনেকটা সেই রকম।

কান খাড়া করে রইল সখারাম। অনেকক্ষণ পর সন্দেহটা ঘুচল। কেউ মিঠে সরু গলায় গুনগুন করছে।

কী গাইছে, ঠিক বুঝতে পারছে না সখারাম। অবশ্য সে জন্যে তার মাথা ব্যথাও নেই।

কাঁথাটা গায়ে জড়িয়ে মাচানের ওপর উঠে বসল সখারাম। বাখারির জানলাটার কাছে এগিয়ে এল।

যা আন্দাজ করেছিল, ঠিক তাই।

গুন গুন করতে করতে ডোবাটার পারে এসে দাঁড়াল তিতাসী। শ্যাম মালীর বোন, কামিনী বৌর ননদ তিতাসী।

ডোবার পারের মাটিতে খাঁজ কেটে খেঁজুরের গুঁড়ি ফেলে ঘাটলা বানানো হয়েছে।

ঘাটলায় নেমে এল তিতাসী।

সখারাম দেখতে লাগল।

না, ঠিকমত দেখা যাচ্ছে না। একটু কাত হয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে বসল সখারাম। এবার পুরোপুরি তিতাসীকে দেখা যাচ্ছে।

কলাই-করা তিনটে কানা-উঁচু থালা, একটু ছাই, দুটো বাটি, একটা লোহার কড়াই নিয়ে এসেছে তিতাসী।

এতক্ষণ গুন গুন করছিল। বাসন-কোসন মাজতে মাজতে তিতাসী গলা চড়িয়ে দিল।

গলা চড়াবার পরও গানের কথাগুলো বোঝা যাচ্ছে না। সখারামের কানে মৃদু সুরের একটা কাঁপুনি ছাড়া কিছুই আসছে না।

বাসন মেজে এক পাশে ডাঁই করে রাখল তিতাসী। তার পর ফাটা ফাটা গোড়ালিটা খেঁজুরের গুঁড়িতে ঘষে ঘষে লাল টুকটুকে করে তুলল।

বুকের ওপর কালো কালো ডোরাকাটা একটা হলদে গামছা জড়ানো। গামছাটা খুলে ঘাটলায় রাখল তিতাসী।

সজনে আর মাদার গাছের মাথা থেকে নিবু নিবু আলোটুকু মুছে যাচ্ছে। ডোবাটা আবছা, ঝাপসা হয়ে গিয়েছে।

এদিক ওদিক একবার তাকাল তিতাসী। তার পর নির্ভাবনায় জলে নেমে গেল। পাতলা, একপরতা শাড়িটা তার দেহে কতকগুলো উগ্র, তীব্র রেখা ফুটিয়ে লেপটে গেল।

নাক আর কানের ভেতর ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল সখারামের। মনে মনে ভাবল, তুমি ভেবেছ তিতাসী, চার পাশে গাছগাছালি, শুষ্‌নি আর কলমি, এই ডোবা, ফড়িংয়ের নাচানাচি ওড়াওড়ি ছাড়া আর কিছুই নেই।

তিতাসী, তুমি ভুল করেছ। আর একটু দেখে শুনে জেনে বুঝে নিলে পারতে। দেখতে কোথাও কোন পুরুষ-চোখ উঁকি দিচ্ছে কি না। তুমি সব পার তিতাসী, কিন্তু পুরুষের চোখকে ফাঁকি দিয়ে নিজের সুন্দর শরীরটাকে তুমি লুকিয়ে রাখতে পার কি?

যদি বুঝতে কেউ তোমাকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছে, পারতে, পারতে তুমি এমন নির্ভাবনায় পাতলা শাড়ি জড়িয়ে জলে নামতে? পারতে না।

হাত বুলিয়ে বুলিয়ে নরম দেহের মসৃণতা অনুভব করতে লাগল তিতাসী। শরীরটা কেমন ভরে উঠেছে। এটা যে তার নিজের শরীর ভাবতে কেমন ভাল লাগে, আবার ভয়ও হয়! বুকের ভেতর সির সির সির সির করে রক্ত কাঁপতে থাকে।

ঘুরে ফিরে মুগ্ধ চোখে নিজের সুঠাম কোমর, সুছাঁদ কাঁধ এবং সর্বাঙ্গে নিজের ভরে-ওঠা দেখছে তিতাসী।

দেখছে আর রিনরিনে গলায় অদ্ভুত শব্দ করে হেসে উঠেছে।

সখারামও দেখছিল।

তিতাসীর মুখ, হাত, আঙুল, কোমর, পা, ঘন পালকে ঘেরা দুটো চোখ। সখারাম দেখছিল আর ভাবছিল।

তার মনে হচ্ছে, সবুজ পানা, শুষ্‌নি আর কলমিতে ঢাকা এই ডোবা, সজনে আর মাদার ফুল, লাল ফড়িংদের ওড়াওড়ি নাচানাচি, কার্তিকের এই আবছা ঝাপসা বেলাশেষ, পাঁকের গন্ধ—সব কিছুর মধ্যে তিতাসীও একাকার হয়ে মিশে গিয়েছে। এই গন্ধের মত, ফড়িংদের নাচানাচির মত, ঝাপসা আলোর মত তিতাসীও একটা কিছু। তাকে বাদ দিলে এখন এই আবছা অন্ধকারে ডোবার ছবিটা কোন মতেই সম্পূর্ণ হবে না।

তিতাসী আরো দূরে, ডোবাটার মাঝখানে চলে গেল। ঢেউ দিয়ে দিয়ে পানা সরিয়ে দিল।

সবুজ পানার ঢাকনি সরে যেতেই কালো, টলটলে, ঠাণ্ডা জল বেরিয়ে পড়ল। গলা পর্যন্ত গা-টা অনেকক্ষণ ডুবিয়ে রাখল তিতাসী। শরীর জুড়িয়ে আস্তে আস্তে ওপরে উঠল।

জলজলে চোখে চেয়েই রয়েছে সখারাম।

একটা হিসেবে বার বার গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। কিছুতেই সেটা মিলছে না।

এত তো অভাব, পেট পুরে রোজ দু বেলা ভাত জোটে না, তবু ছাখো, কী আশ্চর্য! যৌবন ঠিক খুঁজে খুঁজে ছাইগাদাটার পাশ দিয়ে শ্যাম মালীর ইটের পাঁজায় এসে ঢুকেছে! ঢুকেই কি সে নিশ্চিন্ত হয়েছে! তিতাসীকে সাপটে ধরে ফেলেছে।

ঘষে ঘষে গা মুছল তিতাসী। তারপর গামছাটায় বুক ঢেকে কাঁধের ওপর দিয়ে দুটো আঁচল পিঠে ফেলল।

বাসনের পাঁজাটা নিয়ে উঠে দাঁড়াতেই সখারামের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল।

বড় বড় পালকে ঘেরা কালো চোখ দুটো এক মুহূর্ত স্থির হয়ে রইল।

সখারামও চকচকে, ঘোর ঘোর চোখে চেয়ে রয়েছে।

একটাই মাত্র মুহূর্ত।

তার পরেই ঠোঁট দুটো তীব্র একটা খাঁজ খেয়ে বেঁকে গেল। তিতাসী একটু হাসল কি? সখারাম মনে মনে হাসল।

মুখটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে, ঘাড়টা বাঁকিয়ে, সরু সুঠাম কোমর, সুডোল হাত আর সুছাঁদ গলাটা দুলিয়ে দুলিয়ে ইটের পাঁজাটায় গিয়ে ঢুকল তিতাসী।

কিছুক্ষণ ঝিম মেরে বসে রইল সখারাম। শরীরটা কাঁপছে, ঘাম ছুটিয়ে যে জ্বরটা ছেড়ে গিয়েছে, আবার সেটা আসছে নাকি? হেই মা গোসানী!

বসে বসে একটা কথাই এখন মনে হচ্ছে সখারামের। তিতাসীর যত না রূপ তত ঠমক।

একসময় কার্তিকের ধিকি ধিকি দিনটা একেবারেই নিবে গেল। চারিদিক এখন বিষণ্ণ, উদাস।

এখন এমন একটা সময় যখন আকাশ বোঝা যায়, তার রঙ বোঝা যায় না। গাছপাতা একাকার হয়ে ঝুপসির মত দেখায়। কিন্তু কোন্‌টা গুঁড়ি, কোন্‌টা ডাল আর কোন্‌গুলি যে পাতা, আলাদা করে বোঝা যায় না।

আকাশের নীল, গাছের সবুজ, মাটি, ডোবা, শুষ্‌নি শাক—এখন ধোঁয়ার মত একটি মাত্র গাঢ় রঙে সব কিছু আচ্ছন্ন হয়ে যেতে শুরু করেছে।

বাইরের দিকে তাকিয়ে বিড় বিড় করে সখারাম বলল, 'হেই মা গোসানী!'

॥ ১১ ॥

আজ ভোরেই ঘাম দিয়ে জ্বরটা ছেড়ে গিয়েছে। জ্বর যেই ছেড়েছে, চট-টিন-পিচবোর্ডের খুপরি থেকে বেরিয়ে পড়েছে সখারাম।

ভোরে উঠেই নদীতে যাওয়া কামিনী-বৌ আর তিতাসীর অভ্যাস। সায়েব-ঘাট থেকে ফিরে এসে দুজনে দেখল, বারান্দায় বাঁশের খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে বসে রয়েছে সখারাম।

কাঁখ থেকে মাটির কলসী নামিয়ে কামিনী-বৌ সামনে এসে দাঁড়াল। বলল, 'কি গো, বাইরে এসে বসেছ যে? কাত্তিক মাসের হিম মাথায় নিয়ে আরো ক'দিন বিছানায় পড়ে থাকো, এই ইচ্ছে বুঝি তোমার? কোথায় দুটো পয়সা কামিয়ে সোম্‌সারের সুরাহা করবে, তা নয়, ব্যামো বাধিয়ে বসলে! খরখর (তাড়াতাড়ি) যে ব্যামো সারাবে তা নয়, হিম লাগিয়ে ব্যামো পোষার মতলব। যত গেরো!'

এখনও ঠিকমত সকাল হয় নি। গির্জে বাড়িটার চুড়ো যেখানে পুব দিকের আকাশটাকে বিঁধে আছে, ঠিক সেইখানে অস্পষ্ট, আড়ষ্ট একটু রঙের আভাস দেখা দিয়েছে। উত্তুরে বাতাস দিয়েছে। বেশ ঠাণ্ডা আর জোরালো বাতাস।

কামিনী-বৌ এবার তাড়া লাগাল, 'যাও যাও ঘরে গে বস।'

সখারাম বলল, 'জ্বরটা ছেড়ে গেছে।'

'তাই বল! নইলে বাইরে এসে বসে আছ!' কামিনী-বৌ বলতে লাগল, 'জ্বর ছেড়েছে, ভালই হয়েছে। দুদিন ঘর থেকে বেরিয়ে কাজ নি। ভাত পথ্যি করে তারপর বেরুবে।'

সখারাম নখ খুঁটছিল। খুব আস্তে সে বলল, 'আজ তো বিবির বাজারের হাটবার। ভাবছিলম, হাটে যাব—'

'সি কি গো! আজ না তোমার জ্বর ছাড়ল! অ্যাদ্দিন ভুগলে! নাড়িতে ভাতের জোর না পেলে বেরুবে কেমন করে!'

'তা ঠিক পারব। সারাটা জীবন তো অ্যামন করেই কাটচে। কে আর শুইয়ে খাওয়াচ্চে বল। তুমি ডালা-কুলো-চ্যাটাইগুলোন গুছিয়ে দাও দিকি। আমি হাটটা ঘুরে আসি।'

মুখ ভার করে কামিনী-বৌ বলল, 'রোজগারের খোঁটা দিয়েচি বলে গুসা (গোসা) হলে নাকি গো ব্যাটাছেলে?'

সখারাম জ্বরে-পোড়া শুকনো মুখে অল্প একটু হাসল। বলল, 'আরে না না। ঘরে বসে থাকতে পারি না। সে অভ্যেসই নি। ব্যামো ছাড়ার পর ঘরে থাকলে পেরাণটা হেঁপিয়ে মরবে। আমি হলুম গে, উই যে কি বলে—'

সখারামের কথার মধ্যেই কামিনী-বৌ ধমকে উঠল, 'কিছু আর বলতে হবে নি। তুমি বাপু হাটেই যাও।'

ধামা-কুলো-চাটাই গুছিয়ে দিল কামিনী-বৌ। সখারাম হাটে চলে গেল।

মনে আজ খুব ফুর্তি সখারামের।

শহর থেকে পাইকের এসেছিল। ধামা-কুলোর বেশ ভাল দর দিয়েছে। মাল বেচার পর তিন পালি চাল কিনেছে সখারাম। চালের থলে কাঁধে ফেলে রানীর হাটের দিকে হাঁটতে শুরু করেছে।

বিবির বাজার থেকে রানীর হাট।

রূপসী নদীর গেরুয়া রেখাটা এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে। নদীর পার ধরে

সীমাহীন-দেহ বাঁধ। বাঁধের লাল লাল আরসা মাটির ওপর দিয়ে ইউনিয়ন বোর্ডের সড়ক।

এখন দিনটা ঢলতে শুরু করেছে।

নদীর বান মরে গিয়েছে। পার ঘেঁষে থকথকে গৈরিক কাদা দেখা দিয়েছে। রোদে এখন তাপও নেই, জেল্লাও নেই। নিস্তেজ, প্রায় নিবন্ত সূর্যটা রূপসীর জলের কাছাকাছি নেমে এসেছে।

একটু পরেই সন্ধ্যে নামবে।

কোনদিকে নজর নেই সখারামের। লাল লাল আরসা মাটির ওপর দিয়ে জোরে জোরে পা চালাতে লাগল সে।

সখারাম হাঁটে আর ভাবে, ক'দিন আগেও সে কোথায় ছিল। আর আজ রানীর হাটের কয়েকটি মানুষের সুখদুঃখ আর ভাগ্যের সঙ্গে তার সুখদুঃখ আর ভাগ্য একাকার হয়ে গিয়েছে। সুখী বুড়ী, কামিনী-বৌ, তিতাসী—রানীর হাটের জীবনের সে অংশীদার হয়ে গিয়েছে।

নিজে সে ঘর বাঁধল না। পৃথিবীতে এত ঘর থাকতে একটা নতুন ঘর বেঁধে লাভই বা কি? এক ঘরে না এক ঘরে তার ঠাঁই হবেই। জন্মাবধিই তো সখারাম দেখছে, পৃথিবীর সব ঘরই তার নিজের ঘর, সব মানুষই তার নিজের জন, তার পরমাত্মীয়। নইলে ঘর না বেঁধে এতকাল সে ঘর পেল কেমন করে?

অনেকক্ষণ থেকেই সাইকেলের বেলটা বাজছিল। ক্রিং—ক্রিং—ক্রিং—

সাইকেলের বেলের আওয়াজটা আসছিল পেছন দিক থেকে।

প্রথমটা খেয়াল করে নি সখারাম। নিজের ভাবনায় বুঁদ হয়ে সে হাঁটছিল। হঠাৎ সাইকেলটা তার পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়ল।

চমকে ঘুরে দাঁড়াল সখারাম। দেখল, বুড়ো পাদ্রী হ্যালিডে সায়েব সাইকেল থেকে নামছে।

রোদে পুড়ে হ্যালিডে সায়েবের মুখখানা তামার রঙ ধরেছে। লালচে চুলগুলো উত্তুরে বাতাসের দাপটে এলোমেলো হয়ে রয়েছে। কপালে এক আস্তর ঘামে ভেজা লাল ধুলো জমেছে। টেনে টেনে হাঁপাচ্ছে সে।

খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে হ্যালিডে সায়েবকে।

আঙুল দিয়ে কপালের ওপর থেকে ধুলোর আস্তরটা টেনে নিল হ্যালিডে সায়েব। তার পর খুব মিষ্টি করে হাসল। এ হচ্ছে সেই জাতের হাসি, যার মধ্য দিয়ে একটি সুন্দর আত্মার অনেকখানি দেখা যায়।

সখারামের কাঁধে একখানা হাত রাখল হ্যালিডে সায়েব। বলল, 'কতক্ষণ ধরে বেল বাজাচ্ছি, শুনতে পাও নি?'

সখারাম থতমত খেয়ে গিয়েছে। নিজের ভাবনায় মশগুল হয়ে সে হাঁটছিল। এই মুহূর্তে হ্যালিডে পাদ্রীকে সে আশাই করে নি।

ঠিকমত জবাবটা তার মুখে যোগাল না। অবাক হয়ে হ্যালিডে সায়েবের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল সখারাম।

হ্যালিডে সায়ের আবার বলল, 'হাটে গিয়েছিলে বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

'এখন ঘরে ফিরছ তো?'

হ্যাঁ।'

'চল, আমিও যাচ্ছি।'

সাইকেলটাকে হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে সখারামের পাশাপাশি চলতে শুরু করল হ্যালিডে সায়েব।

পাশাপাশি একটা লোক চললে মুখ বুজে কি থাকা যায়! তা ছাড়া মুখ বুজে থাকা সখারামের ধাতেই নেই।

ঘাড় কাত করে সখারাম দেখল, হ্যলিডে সায়েব সমানে হাঁপাচ্ছে। হাঁপাতে হাঁপাতে হাঁটছে।

সখারাম বলল, 'অত হাঁপাচ্চ কেন? খুব খাটুনি গেছে বুঝি?'

'খাটুনি আর কি? এ তো সারা জীবন চলছেই। তবে বুড়ো হয়েছি।'

হ্যালিডে সায়েব হাসল। বলতে লাগল, 'আজকাল একটু খাটলেই হাঁপ ধরে যায়। আগের মত আর পারি না।'

সখারাম বলল, 'গিছলে কোথায়?'

'হেই হটুগঞ্জ কুলপির দিকে গিছলম। ভোর বেলায় বেরিয়ে ছিলম, এখন ফিরছি।'

'হটুগঞ্জ কুলপিতে কী কাজ?'

'ওখেনে কলেরা লেগেছে। রুগীগুলোকে ডায়মণ্ডহারবারের হাসপাতালে পাঠিয়ে এলুম।'

'অ।'

কথায় কথা ওঠে। কথার পিঠে কথা যোগাতে হয় দুজনকে। এ-কথায় সে-কথায় সখারাম আর হ্যালিডে সায়েব অনেকটা পথ পার হয়ে এসেছে।

এখন আর সূর্যটাকে আকাশের কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। রূপসীর হিম হিম গেরুয়া জলের অথৈ অতলে সে ডুব দিয়েছে।

উত্তুরে বাতাসের দাপট একটু একটু করে বাড়তে শুরু করেছে। কাপড়ের খুঁটটা নিজের গায়ে বেশ ঘন করে জড়িয়ে নিল সখারাম।

এখন কোথাও একটু আলো নেই। কার্তিকের হিম ঝরানো বিরাট আকাশটা একেবারেই আবছা আর দুর্বোধ্য হয়ে গিয়েছে। কুয়াশা পড়তে শুরু করেছে। চারপাশের আকাশ, নদী আর আবাদী ক্ষেতগুলোকে আচ্ছন্ন করে সন্ধ্যে নেমেছে।

হ্যালিডে সায়েব ডাকল, 'সখারাম—'

'হ্যাঁ—'

একটু চুপ। কেমন করে কথাটা পাড়বে, মনে মনে ভাঁজতে লাগল হ্যালিডে সায়েব।

সখারাম বলল, 'কী গো সায়েব, কথা কইচ না কেন? ঠোঁটে কি তালা এঁটে দিলে?'

'না না, বলছি।'

হ্যালিডে সায়েব বলতে লাগল, 'বলছিলম, কই, তুমি তো আমার গির্জেতে গেলে না। বলছিলে, যাবে—'

'যাই কেমন করে? ক'দিন জ্বরে ভুগলম। আজই তো জ্বরটা ছেড়েছে।'

'অ্যাই গ্যাখো দিকি, আমি খবরই পাই নি।'

হ্যালিডে সায়েব ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'এই ক'দিন কুলপি হটুগঞ্জের কলেরা রুগীগুলোকে নিয়ে যা ঝামেলায় পড়েছিলম। গ্যাখো দিকি, তোমার খোঁজখবর নেওয়া উচিত ছেল।'

সখারাম কিছু বলল না।

চুপচাপ খানিকটা হাঁটার পর হ্যালিডে সায়েব ফিস ফিস করে বলল, তোমাকে আমার খুব দরকার সখারাম।'

সখারাম চমকে উঠল, 'আমাকে?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ তোমাকে। তোমার মতন একজনকেই আমি অ্যাতদিন খুঁজছিলম। যেদিন তোমাকে পেরথম দেখেছি সেদিন থেকেই মনে হয়েছে, ঠিক যাকে চাই, যেমনটি চাই, তুমি ঠিক তাই, তুমি ঠিক তেমনটি।'

'আমাকে দিয়ে কী দরকার?'

'বলব বলব, সব বলব।'

'বলবে তো বলেই ফ্যাল।

'এখন না। তুমি একদিন গির্জেতে এসো। তখন বলব।'

'তাই বলো।'

একসময় নদীর পার ধরে তারা আজান বুড়োর চায়ের দোকানের সামনে এসে পড়ল।

হ্যালিডে সায়েব বলল, 'তুমি ঘরে যাও। আমি সায়েব-ঘাটের দিকে যাব। লোটন ধাড়ার বাড়ি নেমন্তন্ন আছে। গির্জেতে ফিরতে রাত হবে।'

'আচ্ছা।'

'তবে ঐ কথাই রইল। তুমি এক দিন গির্জেতে আসছ। কবে আসবে, বল। কাল সকালেই এসো না। কাল আমি কোথাও বেরুচ্চি না।'

'না না, কাল না। দিনকতক পর যাব।'

'এসো কিন্তুক।'

'আসব।'

ডানদিকের সরু পথটা ধরে আজান বুড়োর দোকান বাঁয়ে ফেলে সোজা সায়েব-ঘাটের দিকে হাঁটতে শুরু করল হ্যালিডে সাহেব। হাঁটতে হাঁটতে গুন্ গুন্ করে গান ধরল—

For the grace of God
that bringeth salvation
hath appeared to all men,
Teaching us that, denying ungodliness
and worldly lusts, we should live
soberly, righteously and godly
in this present world.

চালের থলে কাঁধে নিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সখারাম। হ্যালিডে সায়েবের গানের একটি বর্ণও সে বুঝছে না। কিন্তু সুরের বিচিত্র একটি রেশ তাকে একটু একটু করে আচ্ছন্ন করে ফেলতে লাগল।

অন্ধকারের মধ্যে কাঁপতে কাঁপতে সুরের রেশটা একসময় দূরে, অনেক দূরে মিলিয়ে গেল। হ্যালিডে সায়েবকে এখন আর দেখা যাচ্ছে না! রানীর হাটের দুর্জ্ঞেয় মানুষটা কার্তিক মাসের কুয়াশাভরা অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছে।

নদীর পারে কোন একটা শিশুগাছের মাথায় একসঙ্গে অনেকগুলো বাদুড় ডানা ঝাপটাল। ডানার শব্দে চমকে উঠল সখারাম। তার পর হন হন করে বাঁ দিকের পথটা ধরে পা চালিয়ে দিল।

॥ ১২ ॥

একটু ফুরসত পেলেই বারান্দায় এসে বসে সখারাম। বারান্দার খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে বসে গির্জের চুড়োটা দেখতে বেশ লাগে তার। খুব ভাল লাগে যখন হেমন্তের শেষবেলায় হিম হিম কুয়াশায় চুড়োটা একটু একটু করে ঝাপসা হয়ে যায়। শুধু ভালই লাগে না, মনটা কেমন যেন উদাস হয়ে যায়।

গির্জের চুড়োটার ঝাপসা হয়ে যাওয়া দেখতে দেখতে পেছনের জীবনের কথা মনে পড়ে সখারামের। এতকাল সে কোথায় ছিল! নৈহাটি, ইটাগড়, ইটিণ্ডেঘাট, কালনা, কাটোয়া—বিপুল পৃথিবীর কত ঘরে যে সে কাটিয়ে এসেছে, তার হিসেব নেই। কত মানুষ যে দেখেছে, লেখাজোখা নেই। জীবনের বিচিত্র মেলা থেকে দু হাত ভরে ভরে পরম রহস্যকে কুড়িয়ে নিয়ে সে ছুটেছে এ ঘর থেকে সে ঘরে, একূল থেকে ওকূলে। পিছু-টান তার নেই। পেছনের দিকে তাকাতেও সে জানে না।

এখানে বারান্দার এই খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে বসলে দূরের ঐ গির্জেটার দিকে আপনা থেকেই চোখদুটো চলে যায়। একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হয়, হেমন্তের শেষবেলায় ঐ গির্জের চুড়োটার মতই তার পেছনের জীবনটা ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে।

আজ হাট ছিল না। সারাটা দিন সখারামের অফুরন্ত ফুরসত। দুপুরে একথালা রাঙা চালের ভাত গিলে আজান বুড়োর দোকানে আড্ডা দিয়ে এই মাত্র ফিরে এসেছে।

তিতাসী আর কামিনী-বৌ কোথায় যেন বেরিয়েছে।

উঁচু ছাইগাদাটার ওপর যেখানে শাখাহীন ন্যাড়া পেঁপে গাছদুটো আতুর ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক সেইখানে বসে রয়েছে সুখী বুড়ী।

ইটের পাঁজার যে ঘরটা, তার বারান্দার একটা খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে বসল সখারাম। ঘাড় কাত করে দেখল, হাঁ করে আকাশটার দিকে তাকিয়ে

আছে সুখী বুড়ী।

এখন বিকেল। অনেক, অনেক উঁচুতে আকাশের সীমাহীন নীল ছুঁয়ে কয়েকটি সাদা ফুটকি। ওগুলি সরালি পাখি। সুখী বুড়ী একদৃষ্টে পাখি দেখছে।

সখারাম অবাক হয়ে ভাবে, সুখী বুড়ীর ছানি পড়া নিস্তেজ চোখ কি পাখিগুলি পর্যন্ত পৌছেছে?

একসময় সুখী বুড়ীর ভাবনা ছেড়ে দিল সখারাম। আপনা থেকেই তার চোখ দুটো গির্জের চুড়োটায় গিয়ে পড়ল।

চুড়োটার পাশেই একটা ক্রশ। ক্রশের মাথার দিকটা ভেঙে গিয়েছে। ক্রশ আর চুড়োটার চারপাশে খয়েরী রঙের একটা চিল পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরছে।

বসে থাকতে থাকতে নিজের অজান্তেই গুন্ গুন্ করে গান জুড়ে দিল সখারাম—

তারে—না-না-না
নারে—না-না-না
হেই গো গুরু,
তোমার মনের খবর পেলম না
সে যে গহীন নদী
পার-কূল তার পেতম যদি,
সারা জীবন ভেসে ভেসে মরতম না।
হেই গো গুরু,
তোমার মনের নাগাল পেলম না।
তুমি গুরু বিষম ধাঁধা,
কোথায় তুমি আছ বাঁধা,
জানলে পরে এ ঘর ও-ঘর ঘুরতম না।
হেই গো গুরু—

গলাটা বেশ চড়িয়েই দিল সখারাম। গাইতে গাইতে আপনা থেকেই চোখদুটো বুজে এসেছে।

হঠাৎ চমকে উঠল সখারাম। কাঁধের ওপর একটা ঠাণ্ডা হাতের ছোঁয়া এসে লেগেছে। আস্তে আস্তে হাতটা তার কাঁধটাকে আঁকড়ে ধরল। হাতটা এত ঠাণ্ডা, সখারামের মনে হল, কাঁধের চামড়া যেন কুঁকড়ে গিয়েছে।

সাঁ করে ঘুরে বসল সখারাম। গানটা একটা তীব্র ঝাঁকুনি খেয়ে থেমে গেল।

সখারাম দেখল, ঘোলা ঘোলা নিস্তেজ চোখে তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে সুখী বুড়ী।

একটা মাস প্রায় পুরতে চলল, সখারাম কামিনী-বৌদের এই খুপরিতে এসে ঢুকেছে। এতগুলো দিন কেটে গেল, সুখী বুড়ী কিন্তু কোনদিন ভুলেও তার সঙ্গে একটা কথা বলে নি। একটা মানুষ এল, এক মাস রইল, কেন এল, কোথা থেকে এল, আর কতদিন থাকবে, যে কথাগুলো জানতে চাওয়া স্বাভাবিক, সে সব সম্বন্ধে আদৌ কৌতূহল নেই সুখী বুড়ীর।

হঠাৎ সেই সুখী বুড়ীকে ছাইগাদার ওপর থেকে উঠে আসতে দেখে, তার কাঁধে হাত রাখতে দেখে সখারাম অবাক হয়ে গেল।

ফোগলা মুখে খল খল করে হেসে উঠল সুখী বুড়ী। পাটকিলে রঙের নিদাঁত মাড়ি দুটো বেরিয়ে পড়ল।

হাসির তোড় কমলে সুখী বুড়ী বলল, 'গাইছেলে ?'

অস্ফুট গলায় সখারাম বলল, 'হ্যাঁ—'

বিস্ময়ের ঝোঁকটা তখনও সামলে উঠতে পারে নি সখারাম। সুখী বুড়ী যে কোন দিন তার সঙ্গে কথা বলবে, কাঁকড়ার দাঁড়ার মত ঠাণ্ডা হাতে তার কাঁধটা আঁকড়ে ধরবে, ভাবতেই পারে নি সে।

পারত পক্ষে কারো সঙ্গে কথা বলে না সুখী বুড়ী। সাত বার শুধোলে একটা জবাব মেলে কি মেলে না! সব ব্যাপারেই সে উদাস, নিস্পৃহ। সুখ-শোক, সব কিছুতেই সে উদাসীন। শুধু সখারামই না, পৃথিবীর কোন কিছুতেই তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই।

আপনা থেকেই তার সঙ্গে কথা বলছে সুখী বুড়ী। বিস্ময় না মেনে কী-ই বা করে সখারাম!

সুখী বুড়ী মাথা নেড়ে নেড়ে তারিফ করল। বলল, 'বেশ গান, মিঠেন গলা!'

শুকনো, জীর্ণ বুকটা ধুকপুক করে উঠল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সুখী বুড়ী। বলল, 'সে মানুষটাও গাইত। ঠিক তোমার মতন মিঠেন গলা ছেল তার।'

সে মানুষটা যে কে, বুঝতে না পেরে আরো অবাক হয়ে সুখী বুড়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল সখারাম।

সুখী বুড়ীর চোখে পাতা পড়ে না। অবাক হয়ে সখারামকে তাকিয়ে থাকতে দেখে সে হাসল। বলল, 'বিশ্বেস হচ্চে না বুঝি ? শ্যাম এলে শুধিয়ে দেখো, আমার কথা সত্যি কিনা ?'

সখারামের পাশে বেশ ঘন হয়ে বসল সুখী বুড়ী। বলতে লাগল, 'শুদোবে কিন্তুক, শ্যাম এলেই শুদোবে।'

মুখে কিছু বলল না সখারাম। মাথা নেড়ে জানাল, শ্যাম এলেই জিজ্ঞেস করবে।

সুখী বুড়ী আবার শুরু করল 'তা শ্যাম কেন? শ্যাম কবে না কবে ফিরবে! সাত বছর হল সে লড়ুইতে গেছে। এ্যাখনও সে ফিরল নি। ফিরবে কিনা ভগমান জানে!'

বলতে বলতে গলাটা বুজে গেল সুখী বুড়ীর। ছানিপড়া চোখের কোল বেয়ে টস্ টস্ করে ঘোলা লোনা জল গড়িয়ে পড়ল।

খানিকটা সময় চুপচাপ কাটল। একটু ধাতস্থ হয়ে হাতের পিঠ দিয়ে চোখ ছুটো মুছে নিল সুখী বুড়ী। গাঢ় গলায় ডাকল, 'হ্যাঁ গো ছেলে—'

সখারাম বলল, 'বল—'

'শ্যামের কথা থাক। তুমি উই আজান বুড়ো কি তাড়ু ঘড়ুইকে শুদিও। আমার কথাটা সত্যি না মিথ্যে, বুঝতে পারবে। শুদিও, সে মানুষটার গলা কেমন ছেল?'

'শুদোব—'

'মানুষটা যাত্ তার (যাত্রার) দলে কেষ্ট সাজত, নিমাই সাজত। য্যামন রূপ ত্যামন গানের গলা। গুমোর করচি না। তাড়ু ঘড়ুই আর আজান বুড়োকে শুদিও। তারা সব জানে।'

রোদের জেল্লা একটু একটু করে কমে আসছে। দিনের তাপ জুড়োতে শুরু করেছে।

খয়েরী রঙের চিলটা এতক্ষণ গির্জের চুড়োটার চারপাশে পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরছিল। হঠাৎ তার কি খেয়াল হল! গির্জের চুড়ো থেকে অনেক, অনেক নীচে নেমে এল। ছাইগাদাটার ওপর ছুটো পেঁপে গাছ জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার একটার মাথায় এসে চিলটা বসে পড়ল। খুশি খুশি গলায় বার ছুই ডেকে উঠল, 'চির্-রো-ও-ও—চির্-রো-ও-ও—'

সুখী বুড়ী ডাকল, হ্যাঁ গো ছেলে, শুনচ?'

'বল।'

'সেই মানুষটার নামে এদিগের সবাই পাগল ছেল গো।'

বলতে বলতে সুখী বুড়ীর ঘোলাটে চোখ ছুটো চক চক করে উঠল।

যে সুখী বুড়ী সব সময় নিজের চার পাশে নিস্পৃহতার দেওয়াল খাড়া করে

শামুকের মত গুটিয়ে থাকে, এ যেন সে নয়। তাকে আজ কথায় পেয়েছে। প্রাণে তার কথার বান ডেকেছে।

হঠাৎ ফিস ফিস করে সখারাম বলল, 'সবই তো বললে। মানুষটা কে ছেল, তা তো বললে নি।'

'অ্যাখনও বুঝতে পার নি?'

অবাক হয়ে সখারামের দিকে তাকালে সুখী বুড়ী। বলতে লাগল, 'তোমায় দেখে ভেবেছিলুম, ধুত্তু চতুর নোক (লোক)।'

একটু থামল সুখী বুড়ী। চোখ বুজল। তার পর বলল, 'সেই মানুষটা ছেল তিতাসী আর শ্যামের বাপ গো।'

সুখী বুড়ীর গলাটা অস্ফুট, আবেগে গাঢ়, কেমন যেন কাঁপা কাঁপা শোনাল।

এর পর অনেকক্ষণ চুপচাপ।

এখন রোদের তেজ নাই। দিনের তাপ নেই। পেঁপে গাছের মাথা থেকে চিলটা ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে কোথায় যেন উড়ে গিয়েছে।

হঠাৎ সুখী বুড়ীর মুখের দিকে নজর পড়ল সখারামের। ঠোঁট দুটো অল্প অল্প নড়ছে। কিছু একটা সে বলতে চায়।

ঘাড়টা অনেকখানি কাত করে, কানটা সুখী বুড়ীর মুখের কাছে এগিয়ে দিল সখারাম। বলল, 'কিছু কইবে?'

'হ্যা—'

খুব আস্তে প্রায় শব্দ না করে সুখী বুড়ী ঠোঁট নাড়ল।

সখারামের মনে হল, শুধু তার গানের তারিফ করতে কিংবা শ্যামের বাপের কথাই বলতে আসে নি সুখী বুড়ী। গানের তারিফ করাটা আসলে একটা অছিলা। নিশ্চয়ই কোন গূঢ়, গোপন কথা আছে তার। আর সেই কথাটা পাড়ার জন্যেই গানের তারিফ করার ছলটা বেছে নিয়েছে সুখী বুড়ী।

'যা বলবে, বল না।' সখারাম বলল।

'হ্যাঁ গো ছেলে, তুমি আমার কথাটা রাখবে?'

'আগে শুনি। রাখারাখির কথা তো পরে।'

কি মনে করে উঠে পড়ল সুখী বুড়ী। বিড় বিড় করে বলল, 'আজ থাক' আর এক দিন কইব।'

'কেন, আজই বল না—'

'না না, পরে কইব।'

মাথা নাড়তে নাড়তে ছাইগাদাটার ওপর গিয়ে বসল সুখী বুড়ী। মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে শামুকের মত গুটিয়ে নিয়েছে সে। তার চার পাশে কঠিন আবরণের মত অদ্ভুত এক নিস্পৃহতা ঘনিয়ে এসেছে।

সখারাম বুঝল, এখন আর একটা কথাও বলবে না সুখী বুড়ী।

সন্ধ্যে পার হয়ে অনেকটা রাত হল।

উঠোনের এক পাশে একটা জামরুল গাছ। নতুন আর পুরনো—অজস্র পাতায় গাছটাকে এখন ঝুপসি দেখাচ্ছে। জামরুল গাছটার পাশেই একটা মাদার গাছ। মাদারের ডাল থেকে তক্ষক ডেকে উঠল।

কামিনী-বৌ আর তিতাসী সেই যে বেরিয়েছে, এখনও ফেরে নি।

বারান্দার খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে ঠায় বসে রয়েছে সখারাম। অলস চোখে ধূসর রঙের আকাশটার দিকে তাকিয়ে আছে।

মনের ওপর নানা ভাবনার ছায়া পড়ছে। ছন্নছাড়া, এলোমেলো ভাবনা। ভাবনাগুলির স্পষ্ট কোন চেহারা নেই। হালকা মেঘের মত মনের ওপর ছায়া ফেলে ফেলে তারা সরে যাচ্ছে।

হঠাৎ একটা কথা সখারামের মনের ওপর স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল। মাস খানেকের মত হল সে কামিনী-বৌদের এই খুপরিতে এসে ঢুকেছে। রানীর হাটের সব মানুষের সঙ্গেই তার মোটামুটি জানাশোনা হয়েছে। আলাপ হয়েছে। কারো কারো সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাও হয়েছে। বাকী ছিল মাত্র দুটো মানুষ। সুখী বুড়ী আর একজন।

সুখী বুড়ী আজ নিজের থেকে এসেই কথা বলল। কিন্তু আর এক জন এখনও একটা কথাও বলে নি। সে তার নিজেকে নিয়েই বুঁদ্ হয়ে আছে।

সেই একজনের মুখটা সখারামের মনের ওপর ছায়া ফেলল। অন্ধকারেই হি-হি করে হেসে উঠল সে। তারপর অকারণ, অবুঝ এক খুশিতে হাতে তাল ঠুকে ঠুকে বিকেলের সেই গানটা গেয়ে উঠল—

হেই গো গুরু,
তুমি গুরু বিষম ধাঁধা,
কোথায় তুমি আছ বাঁধা,
জানলে পরে এ-ঘর ও-ঘর ঘুরতম না।
হেই গো গুরু—

॥ ১৩ ॥

দেখতে দেখতে অঘ্রান মাস এসে গেল।

কার্তিকে কুয়াশা পড়তে শুরু করেছিল। সেই কুয়াশা এখন, এই অঘ্রানে আরো গাঢ়, আরো সাদা, আরো হিমাক্ত হয়েছে।

অঘ্রানের কুয়াশা অনেক বেলা পর্যন্ত সূর্যটাকে উঠতে দেয় না; নিরেট একটি পর্দার মত সমস্ত আকাশটাকে জড়িয়ে থাকে।

আজ খুব ভোরেই ঘুমটা ভেঙে গিয়েছে সখারামের। ঘুম ভাঙলেও তার রেশটা পুরোপুরি যায় নি। অদ্ভুত এক জড়তা সমস্ত দেহটাকে ঘিরে আছে।

কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে ছিল সখারাম। ঘুম ছুটলেও চোখ দুটো মেলে নি। কাঁথার ভেতরের উষ্ণ অন্ধকারটুকু ভারি ভাল লাগছে। চুপ করে পড়ে থেকে সারা শরীর দিয়ে সেই উষ্ণতার স্বাদ নিল সে।

বোঝা যায়, বাইরেটা ফর্সা হয়ে যাচ্ছে। কাঁথার ভেতরে গাঢ় অন্ধকার তরল হয়ে গিয়েছে। আলসেমি ভাঙতে ভাঙতে আরো খানিকটা সময় কাটিয়ে দিল সখারাম। তার পর কাঁথা সরিয়ে মুখটা বার করল।

চট-টিন-পিচবোর্ডের বেড়ার জায়গায় জায়গায় ফুটো। সেই ফুটোগুলোর মধ্য দিয়ে ধোঁয়ার রেখার মত হিম ঢুকছে। খুপরির ভেতর ঢুকে হিমের রেখাগুলো ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে বাতাসে মিশে যাচ্ছে।

পুরো ছটা মাস চিত্তিরগঞ্জের সুবুদ্ধি জানার বাড়ি কাটিয়ে এসেছে সখারাম। কথায় কথায় সুবুদ্ধি জানা বলত, 'বুঝলে বাপু, মন বড় বিষম জিনিস, এক গোলকধাঁধা।'

বড় খাঁটি কথা বলত সুবুদ্ধি জানা। মন যদি বিষম জিনিসই না হবে, অঘ্রানের এই হিম হিম ভোরে এত কথা থাকতে হ্যালিডে সায়েবের সেই গানটার কথাই বা ভাববে কেন সখারাম?

বিবির বাজারের হাট থেকে ফেরার পথে ইউনিয়ন বোর্ডের সড়কটা আজান বুড়োর দোকানের কাছে যেখানে দুভাগ হয়ে গিয়েছে, সেখান থেকে গাইতে গাইতে সায়েবঘাটের দিকে চলে গিয়েছিল হ্যালিডে পাদ্রী।

গানটার একটা শব্দও বোঝে নি সখারাম। কিন্তু সুরের বিচিত্র রেশটা তার স্নায়ুগুলোর ওপর এখনও এত দিন পরেও যেন বাজতে লাগল।

হঠাৎ তার মনে পড়ল, হ্যালিডে সায়েবকে সেদিন কথা দিয়ে এসেছিল, দিনকয়েকের মধ্যেই তার গির্জেতে যাবে।

সেই দিনটার পর কত দিনকয়েক পার হয়ে গিয়েছে। গির্জেতে যাবার কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিল সখারাম। এই মুহূর্তে হ্যালিডে সায়েবের কাছে যাবার একটা দুর্বার ইচ্ছে তাকে পেয়ে বসল।

কাঁথাটা সরিয়ে উঠে বসল সখারাম। হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙল। তার পর হামাগুঁড়ি দিয়ে সামনের ফোকর গলে বাইরে বেরিয়ে এল।

এত ভোরে সুখী বুড়ী, তিতাসী কি কামিনী-বৌ—কেউ ওঠে নি। ইটের পাঁজার খুপরিতে একটি গাঢ় এবং নিটোল ঘুমের মধ্যে তারা তলিয়ে আছে।

কারুকে ডাকল না সখারাম। কাপড়ের খুঁটটা সারা গায়ে ঘন করে জড়িয়ে ছাইগাদাটার পাশ দিয়ে বাইরের ঘাসে-ভরা মাঠে গিয়ে নামল।

কুয়াশায় ঘাস ভিজে রয়েছে। ঘাসের ডগায় ডগায় নিটোল এক-একটি বিন্দুর মত জলের কণা জমে আছে। মাঠের ওপর ফাটা ফাটা পায়ের দাগ ফেলে এক সময় গির্জেটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সখারাম। একবার ওপরের দিকে তাকাল। উঁচু চুড়োটা এখন ঠিকমত দেখা যাচ্ছে না। খানিকটা ঘন আর সাদা কুয়াশা তাকে ঝাপসা করে রেখেছে।

এতদিন দূর থেকে দেখেছে সখারাম। গির্জেবাড়িটা রানীর হাটের সমস্ত সংস্রব এড়িয়ে একপাশে মাথা তুলে আছে। পৃথিবীর কোন ব্যাপারেই তার যেন আসক্তি নেই, আগ্রহ নেই, কৌতূহল নেই।

তিতাসীদের বারান্দার খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে বসে থাকতে থাকতে ফরাসী-দের এই গির্জেটাকে বড় দুর্বোধ্য মনে হত সখারামের। এর ভেতরে হ্যালিডে সায়েব নামে সেই দুর্জ্ঞেয় মানুষটা থাকে।

এই ভাঙা গির্জেটার চারপাশে খানিকটা বিচিত্র রহস্য যেন ঘনীভূত হয়ে আছে।

এই প্রথম গির্জেতে এসেছে সখারাম।

সামনের দিকে এক টুকরো চৌরস করা মাটি। আর সেই মাটি ফুঁড়ে মাথা তুলেছে অজস্র সবুজ অঙ্কুর। কপি, মুলো, গাজর, পালং—শীতের আনাজ। রানীর হাটের সরস মাটি অকৃপণ স্নেহে সবুজ প্রাণগুলিকে লালন করছে।

পুবদিকের আকাশটার দিকে একবার তাকাল সখারাম। দিনের প্রথম রোদ এই রানীর হাটে এসে পৌঁছতে এখনও অনেক দেরি।

এবার সখারাম ডাকাডাকি শুরু করল, হেই গো সায়েব, সায়েব গো—আর কত ঘুমুবে ?'

একটু চুপ। জবাব এল না।

অগত্যা গলা চড়াল সখারাম, 'রাত যে পুইয়ে গেল। পুবদিক ফস্‌সা (ফর্সা) হয়ে গেছে। ওঠ—উঠে পড়—'

বেশ খানিকক্ষণ ডাকাডাকির পর হ্যালিডে সায়েব চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে এল। গায়ে কোঁচকানো, আধময়লা সারপ্লিস ; গলায় কালো কারে একটা রুপোর ক্রশ ঝুলছে।

এত ভোরে সখারামকে দেখে অবাক হয়ে গেল হ্যালিডে সায়েব। বলল, 'সখারাম! তুমি ?'

'হ্যাঁ গো সায়েব, চিনতে পারচ না ? সিদিন তো তুমিই আমায় আসতে বললে!' সখারাম বলতে লাগল, 'ভুলে গেছ ?'

'আরে না না, ভুলব কেন ?'

হ্যালিডে সায়েব ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'এসো, ভেতরে এসো।'

হ্যালিডে সায়েবের পিছু পিছু গির্জেবাড়িটার ভেতর ঢুকে পড়ল সখারাম।

হেমন্তের এই ভোর হিম-হিম, কুয়াশায় আচ্ছন্ন। এখন পর্যন্ত বাইরের আলো ভেতরে এসে পৌঁছয় নি। ভেতরটা আবছা আবছা, অন্ধকার। সেই অন্ধকার বিঁধে ঠিকমত নজর চলে না। তবু সখারামের মনে হল, বাইরের মতই গির্জেবাড়ির ভেতরের চেহারাটা করুণ, কর্কশ। ঘরগুলির কোণে কোণে ঝুল জমে আছে। দেওয়াল থেকে চুনবালির পুরু আস্তর খসে ইঁটের দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। সেই ইঁটও নোনা ধরা, ক্ষয়া ক্ষয়া।

পর পর অনেকগুলো ঘর পার হয়ে এল দুজনে।

গির্জেবাড়িটার কোথাও পুরনো আমলের রূপ, রঙ কি জলুসের চিহ্নমাত্র নেই। সেকালের সব গৌরব আর গরিমা তার ঘুচে গিয়েছে।

ভেতরটা আশ্চর্য রকমের স্তব্ধ।

সখারাম আর হ্যালিডে সায়েব—দুজনের পায়ের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। দু জোড়া পায়ের এলোমেলো, খাপছাড়া আওয়াজ দেওয়ালে দেওয়ালে ঘা খেয়ে কেমন যেন অদ্ভুত শোনাতে লাগল।

পায়ের আওয়াজে চমকে চমকে উঠতে লাগল সখারাম। অন্ধকার ঘরগুলির কোণ থেকে ফর্ ফর্ করে চামচিকে উড়তে লাগল।

শেষ পর্যন্ত তারা সেই ঘরটার সামনে এসে পড়ল।

হ্যালিডে সায়েব বলল, 'এই আমার ঘর, এসো—'

হ্যালিডে সায়েবের কথায় তার কান ছিল না। অন্য একটা কথা সে ভাবছিল।

যদিও সখারাম শুনেছে, এই পুরনো গির্জেবাড়িটার ভেতর অনেক বছর ধরে হ্যালিডে পাদ্রী একলাই আছে, তবু তার মন থেকে ভাবনাটা যাচ্ছিল না। সখারাম জানত না, ফরাসীদের গির্জেটা এত নির্জন, এত নিঃশব্দ। এই স্তব্ধ, ভুতুড়ে গির্জেটার ভেতর কিসের আশায়, কিসের মোহে জীবনের এতগুলি বছর পার করে দিয়েছে হ্যালিডে সাহেব, কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিল না সে।

হ্যালিডে সাহেব আবার ডাকল, 'সখারাম—'

'হ্যাঁ—'

সখারাম চমকে উঠল।

একদৃষ্টে কিছুক্ষণ সখারামের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল হ্যালিডে সায়েব। শুধলো, 'কী ভাবছ?'

সখারাম একবার ভাবল, মনের কথাটা বলেই ফেলে। এই নির্জন গির্জে-বাড়িতে কেমন করে কিসের আনন্দে নিঃসঙ্গ জীবন কাটায় হ্যালিডে সাহেব! কি মনে করে কথাটা আর বলল না সে। সামনের দিকে পা বাড়িয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ল।

হ্যালিডে সায়েব আবার বলল, 'কই জবাব দিলে না তো! কী ভাবছিলে?'

'ও কিছু না।'

ঘরের ভেতর একপাশে একটা হ্যারিকেন জ্বলছে। খুব সম্ভব তেল ফুরিয়ে এসেছে। এলে যে লালচে আলোটুকু পাওয়া যাচ্ছে তার তেজ নেই, জেল্লা নেই। নিস্তেজ নিবু-নিবু আলোতে ঘরের কিছুই স্পষ্ট নয়।

চারদিকে একবার তাকিয়ে নিল সখারাম।

সামনে একেবারে জানলা ঘেঁষে ক্রুশে-বেঁধা খ্রীষ্টমূর্তি। মূর্তিটি সাদা পাথরে খোদাই করা। ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা মাঝারি তক্তাপোশ। তার ওপর এলোমেলো, চটকানো বিছানা। রোঁয়াওলা একটা কম্বল তক্তাপোশ থেকে

মাটিতে লুটোচ্ছে। চ্যাপ্টা বালিশটা একদিকে কাত হয়ে আছে।

শিয়রের কাছে প্রকাণ্ড একটা টেবিল। তার ওপর অজস্র বই স্তূপাকার হয়ে আছে।

ঘরের দেওয়ালে পেরেক পুঁতে দড়ি টাঙানো। দড়িতে গুটিকতক আধময়লা সাদা আলখাল্লা (ওগুলোর নাম যে সারপ্লিস, সখারাম জানে না) ঝুলছে।

তক্তাপোশের পাশেই তিন-চারটে টিনের তোরঙ্গ। একটা কলের উনুন, তেল আর কালিতে কিম্ভুত হয়ে আছে। সিলভারের ছোট একটা হাঁড়ি, দুটো বাটি, একটা ডেকচি, একটা হাতা। কয়েকটা ছোটবড শিশিও চোখে পড়ল। তাদের কোনটায় তেল, কোনটায় মশলা রয়েছে।

রান্নার সরঞ্জাম দেখতে দেখতে সখারাম বলল, 'নিজেই বুঝি রেঁধে খাও, হেই গো সায়েব?'

'নিজে না রাঁধলে, কে আর রেঁধে দিচ্চে বল।'

সখারাম আর কিছু বলল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘরখানা দেখতে লাগল।

এই ঘরখানায় এমন একটা মানুষের ছাপ আছে, সুখে যে উদাসীন, স্বাচ্ছন্দ্যে যে বিমুখ। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-আরাম—সব কিছু সম্বন্ধেই যে পরম নির্বিকার।

হ্যালিডে সায়েব বলল, 'দাঁড়িয়ে রইলে কেন? উই তক্তাপোশখানায় বসে পড়।'

সখারাম বসে পড়ল।

হ্যালিডে সায়েব আবার বলল, 'তুমি একটু বোস। আমি মুখটা ধুয়ে আসি।'

'আচ্ছা।'

'পালিও না যেন।'

হ্যালিডে সায়েব ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পাথরের খ্রীষ্টমূর্তিটার ঠিক পেছনেই একটা জানালা। জানালায় গরাদ নেই। পাল্লাদুটো খোলা রয়েছে। তার ফাঁক দিয়ে একটুকরো চারকোণা আকাশ দেখা যায়। এতক্ষণ সেই আকাশটা অঘ্রানের গাঢ় কুয়াশায় ঝাপসা হয়ে ছিল। এখন কুয়াশা বিঁধে বিঁধে সোনার তারের মত সরু সরু রোদের রেখা আসতে শুরু করেছে।

হঠাৎ তেলপোড়া, উগ্র দুর্গন্ধ উঠল। ফট্ ফট্ শব্দ করে হ্যারিকেনের আলোটা লাফাতে লাগল। বোঝা গেল, ওটার আয়ু ফুরিয়ে এসেছে।

চাবি ঘুরিয়ে হ্যারিকেনটা নিবিয়ে দিল সখারাম।

একটু পরেই হ্যালিডে সায়েব ফিরে এল।

সখারাম বলল, 'হেই গো সায়েব—'

'বল।'

'আমায় আসতে বলেছিলে কেন?'

'বলছি।'

কি একটু ভাবল হ্যালিডে সায়েব। তারপর বলল, 'আজ তোমার হাট আছে?'

'না।'

'অন্য কাজের তাড়া আছে?'

'না।'

'ঠিক তো?'

'হ্যাঁ গো সায়েব, ঠিক।'

'দেখো আবার কামিনী-বৌর কাছে বকুনি খেও না—'

'সে ভয় নেই।'

একটু চুপ। হঠাৎ হ্যালিডে সায়েব বলল, 'তা হলে বেরিয়েই পড়ি। চল আমার সঙ্গে।

'তোমার সন্‌গে কুথায় যাব?'

অবাক হয়ে হ্যালিডে সায়েবের মুখের দিকে তাকাল সখারাম।

'চলই না। নিজের চোখেই সমস্ত দেখতে পাবে।' হ্যালিডে সায়েব ফিস ফিস করে বলল, 'তোমাকে আমার খুব দরকার।

'য্যাখনই তোমার সন্‌গে দেখা হয় ত্যাখনই তো শুনি আমাকে তোমার দরকার। কিন্তুক দরকারটা যে কি, এখনো জানলাম না।'

'আজ জানবে।'

তাড়াতাড়ি একটা আধময়লা সারপ্লিস পরে নিল হ্যালিডে সায়েব। একজোড়া লাল ক্যাম্বিশের জুতো পরল। তার পর সখারামকে সঙ্গে নিয়ে গির্জে থেকে বেরিয়ে পড়ল।

॥ ১৪ ॥

সায়েবঘাটের পাশ ঘেঁষে একটা ঢ্যাঙা চেহারার বাবলা গাছ। সরু সরু ডালপালা, খসখসে ছাল। গাছটা ছোট ছোট নীলচে পাতা, কাঁটা আর অজস্র হলুদ ফুলে ঝাঁকড়া হয়ে আছে।

একটা ছাতারে পাখি ডালে ডালে নাচানাচি লাফালাফি করে বেড়াচ্ছে।

সায়েবঘাটের শেষ সিঁড়িটায় বসে ছাতারে পাখিটার ওড়াওড়ি দেখতে বেশ লাগছে তিতাসীর। দুই হাঁটুর ফাঁকে থুতনি গুঁজে তাকিয়েই আছে সে।

এখন খুব সকাল। কুয়াশায় এ পাশের গেরুয়া নদী আর ও পাশের জেলাবোর্ডের সড়কটা আবছা হয়ে আছে।

সায়েবঘাটে এখনও ভিড় লাগে নি। এত সকালে এক তিতাসী ছাড়া কেউই আসে নি।

অনেক দিন পর তিতাসী সায়েবঘাটে এসেছে।

সকালে উঠেই নদীতে আসা তার অভ্যাস। কিন্তু ক'দিন কি হয়েছিল, সে নদীতে আসে নি। বাড়ির পেছনের ডোবাটায় চান করেছে, গা ধুয়েছে। সংসারের কাজ সেরেছে। কামিনী-বৌ টানাটানি করেও তাকে সায়েবঘাটে আনতে পারে নি।

আজ সকালে ঘুম ভাঙতেই কামিনী-বৌ শুধিয়েছিল, 'নদীতে যাবি ?'

কি খেয়াল হয়েছিল তিতাসীর ; এক কথায় রাজী হয়ে গিয়েছিল। বলেছিল, 'যাব।'

'তা হলে ভাই কলসীটা নে তুই, এগুতে থাক।'

'তুই এখন যাবি না ভাই-বৌ ?'

'এই এলাম বলে। বাসি ঘর ঝাঁটপাট দিয়ে, উঠোন নিকিয়ে শাউড়ী আর ব্যাটাছেলেটাকে (সখারামকে) চাট্টি চাট্টি মুড়ি দিয়ে এক্ষুনি আসচি। তুই যা—'

কলসী নিয়ে রওনা হয়ে গিয়েছিল তিতাসী।

সায়েবঘাটে পৌঁছে একা একা কতক্ষণ বসে আছে সে। এখনও কামিনী-বৌ আসছে না।

সময় কাটাবার জন্য এক-এক বার ছাতারে পাখিটার নাচানাচি দেখে তিতাসী। কিন্তু থেকে থেকেই তার চোখ দুটো সামনের রাস্তায় গিয়ে পড়ে। রাস্তাটা একেবারে ফাঁকা, ধূ ধূ। যাকে সে খুঁজছে, যত দূর তাকানো যায়, তার চিহ্নমাত্র নেই।

এদিকে বেলা বাড়তে শুরু করেছে।

রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে উঠল তিতাসী। মনের বিরক্ত ভাবটা চোখের তারায় ফুটে বেরুল। ভুরু দুটো কুঁচকে গেল। বিড় বিড় করে কী যেন বলল সে।

ফুড়ুৎ করে একটা শব্দ হল। চমকে ঘুরে বসল তিতাসী। দেখল, ছাতারে পাখিটা বাবলা গাছ থেকে উড়ে গিয়েছে। বেশী দূর যেতে পারে নি পাখিটা। জলের কিনার ঘেঁষে উড়তে উড়তে যেদিকে বিন্নাবন, সেদিকে চলেছে।

বিন্নাবন পেরিয়ে পাখিটা জেলাবোর্ডের সড়কের দিকে চলে গেল। তিতাসীর চোখ দুটো পাখিটার পেছনে ধাওয়া করে আসছিল। বিন্নাবন পর্যন্ত এসে চোখদুটো থমকে দাঁড়াল। পাখিটা যে দিকে খুশি যাক। সেজন্য ভাবনা নেই। হঠাৎ অন্য একটা কথা তার মনে পড়েছে।

বিন্নাবনটা যেখানে গেরুয়া কাদায় থকথকে হয়ে আছে ঠিক সেইখানে মাসখানেক আগে সখারামকে তারা কুড়িয়ে পেয়েছিল।

সখারাম! সখারাম!

বিড় বিড় করে বার কয়েক নামটা আওড়াল তিতাসী। আওড়ালই শুধু। খুশি কি বিরাগ, মুখের ওপর কোন ভাবেরই ছাপ পড়ল না। তিতাসীর হচ্ছে সেই মুখ, যা দেখে মনের কথা পড়া যায় না।

একসময় মুখটা ঘুরিয়ে জলের দিকে তাকাল তিতাসী। ভাবল, চান করে জল নিয়ে ফিরে যায়। কামিনী-বৌর জন্য আর কতক্ষণ দেরী করবে।

জলে নামার জন্য পা বাড়িয়েছে, দূর থেকে সরু গলায় ডাক কানে এল, 'তিতাসী—'

ঘাড় ঘুরোতেই তিতাসী দেখতে পেল, রাধী-বিন্দি-হিমি—রানীর হাটের যুবতী মেয়েরা জেলাবোর্ডের রাস্তা ধরে সায়েবঘাটে আসছে।

জলে আর নামল না তিতাসী। পা মুড়ে বসল। একটু পরেই রাধীরা এসে পড়ল।

রাধী বলল, 'কখন এয়েচিস তিতাসী?'

'অনেকক্ষণ।'

'তোর ভাই-বৌ আসে নি?'

'এই ত্যাখ না, ভাই-বৌর আক্কেলটা ত্যাখ। আগে আগে আমায় পাঠিয়ে দিলে। বললে, তুই যা আমি আসচি। আমি বসে আছি তো বসেই আছি। তার আর আসার নাম নেই।

তিতাসী গজ গজ করতে লাগল।

ইতিমধ্যে বিন্দি-হিমি এবং রানীর হাটের অন্য মেয়েরা তার চারপাশে ঘিরে গোল হয়ে বসেছে।

শাড়ির খুঁটে খানিকটা সাজিমাটি বেঁধে এনেছিল তিতাসী। খুঁটটা খুলতে খুলতে সে বলল, 'রাধী ভাই, আমার মাথাটা একটু ঘষে দিবি ?'

'দোব না কেন ? দে, সাজিমাটি দে—'

তিতাসীর হাত থেকে সাজিমাটি নিয়ে মাথা ঘষতে বসল রাধী।

খানিকটা একথা সেকথা হল।

রাধী শুধলো, 'শ্যামদাদার কুনো খপর এল ?'

'না।'

'কি নোক (লোক) যে, শ্যামদাদা! সাত বচ্ছর হল লড়ুইতে গেছে, এখনো ফেরার নাম নেই। কবে লড়ুই থেমে গেচে, তবু—'

একটু থেমে রাধী বলল, হেই বিবির বাজারের লটবর লড়ুইতে গিছল, আমাদের রানীর হাটের অনন্ত পোড়েলের ছেলে গিছল, আরো কত নোক (লোক) গিছল। সবাই ফিরল শুধু শ্যামদাদাই ফিরল নি!'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রাধী।

তিতাসী কিছু বলল না। মুখ বুজেই রইল। মুখ বুজে না থেকে উপায়ই বা কী!

মাথা ঘষতে ঘষতে রাধী বলল, 'নিজের চোখেই তো সব দেখেচি। সাতটা বচ্ছর তোদের কী কষ্টই না গেল!' একটু চুপ। আবার, 'আমার মন কইচে, এবার শ্যামদাদা ফিরে আসবে।'

এবারও চুপ করে রইল তিতাসী।

এই সাত বছর যখনই কারো সঙ্গে তিতাসীদের দেখা হয়েছে, শ্যামের কথা একবার অন্তত উঠেছেই। না চাইতে সান্ত্বনা মিলেছে, সহানুভূতি মিলেছে।

প্রথম প্রথম তিতাসীর ভালই লাগত। বিপদের দিনে দুটো সহানুভূতির কথা শুনলেও বুকে সাহস আসে।

কিন্তু আজকাল এই সান্ত্বনার কথাগুলি খুব খারাপ লাগে তিতাসীর। মনে হয়, বলতে হয় তাই তারা বলে। এই বলায় প্রাণের কোন যোগ নেই।

সাত বছর হয়ে গেল, তবু শ্যাম ফিরছে না। এই রানীর হাট আর আশপাশ থেকে যারা লড়াইতে গিয়েছিল এক শ্যাম ছাড়া সবাই ফিরে এসেছে।

সাত বছরে যে ফিরল না, হয় সে ফিরবে না, নয় সে বেঁচে নেই। কথাটা সবাই বোঝে। তবু দেখা হলে তারা শ্যামের কথা শুধোবেই।

কেউ বলে, 'দেখো, শ্যাম ঠিক ফিরবেই। অত ভেবো নি।'

কেউ বলে, 'ঘরসোমসারের টান বড় বিষম টান। বেঁচে থাকলে সেই টানে একদিন তাকে আসতেই হবে।'

দোষ হোক গুণ হোক, মানুষের এই এক স্বভাব। দরকার অদরকার বুঝবে না, যেচে যেচে সান্ত্বনা সে দেবেই।

আজকাল সহানুভূতির কথাগুলি ঠাট্টার মত তিতাসীর কানে বেঁধে। তাই শ্যামের কথা যখনই ওঠে, তখন পারতপক্ষে মুখ খোলে না তিতাসী। সে জানে কথায় কথা বাড়বে। একটার জায়গায় দশটা কথা শুনতে হবে। তাতে কী লাভ? কথায় কি ব্যথা জুড়োয়?

খানিকটা চুপচাপ।

সাজিমাটির ঘষায় তিতাসীর মাথা থেকে তেল-ময়লা-মাখা থকথকে তরল গড়িয়ে পড়ছে। ঘাড়ে-গালে-গলায় ভেজা চুল জড়িয়ে গিয়েছে।

তিতাসীর চুলগুলো উল্টেপাল্টে সাজিমাটি ঘষছিল রাধী। হঠাৎ সে ফিস ফিস করে উঠল, 'অ্যাদ্দিনে তোদের কষ্ট ঘুচল তিতাসী।'

'কী রকম?'

মাথাটা পেছন দিকে হেলিয়ে কাত হয়ে বসেছিল তিতাসী। রাধীর কথা কানে যেতেই সে টান হয়ে বসল।

'আহা নেকী—'

তিতাসীর গালে আস্তে একটা গুঁতো মেরে রাধী বলল, 'রকমটা যে কী, তুইও জানিস আমিও জানি। এই রানীর হাটের সবাই জানে। জেনেশুনে রকমের কথা শুদোচ্ছিস!'

'কী কইচিস রাধী!

রাধীর মুখের দিকে তাকাল তিতাসী। দেখল দুই ঠোঁটের ফাঁকে একটা ধূর্ত, চতুর হাসিকে টিপে টিপে মারছে সে। এবার চোখদুটো ঘুরিয়ে হিমি-বিন্দিদের মুখে ফেলল, তিতাসী। দেখল, সবার চোখে চোখে সূক্ষ্ম একটি ইশারা খেলে যাচ্ছে।

একটু যেন ভয়ই পেল তিতাসী। কাঁপা গলায় বলল, 'তোদের কি মতলব রাধী?'

রাধী জবাব দিল না।

পাশ থেকে হিমি বলল, 'তা ভালই করেচিস তিতাসী। শ্যামদাদা যদ্দিন

না ফেরে তদ্দিন ওকে ছাড়িস নি।'

রাধী বলল, 'ছাড়বে কেন? শ্যামদাদা এলেও ছাড়বে নি।'

ওপাশ থেকে বিন্দি বলল, 'ছাড়বে নি তো করবে কী?'

ফিস ফিস করে রাধী বলল, 'আঁচলে গেরো বেঁধে জন্মের মতন রেখে দেবে'।

রাধীর কথা শেষ হবার আগেই মেয়েগুলো দমকা হাসিতে মেতে উঠল। ঢলে ঢলে একজন আরেকজনের গায়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল।

হকচকিয়ে এর-ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল তিতাসী। বলল, 'কী কইচিস তোরা? কার কথা কইচিস?'

তিতাসীর কানে মুখটা গুঁজে রাধী বলল, 'কার কথা আবার। হেই কাত্তিক মাসে তুই আর তোর ভাই-বৌ নদীর পাঁকে পরম 'অতন'কে কুড়িয়ে পেয়েছিলি। তার পর গায়ের পাঁক ধুয়ে ঘটা করে ঘরে নে তুলেছিলি। তার কথাই কইচি লো ছুঁড়ী।'

হিমি ফোড়ন কাটল, 'ছুঁড়ী নাম শুনতে চায় লো। নামটা বল্ না—'

সবাই একসঙ্গে সুর করে চেঁচিয়ে উঠল, 'সখারাম, সখারাম—'

কানদুটো ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল তিতাসীর। মনে হল, সমস্ত শরীরের রক্ত মুখে উঠে এসেছে।

মেয়েগুলো সমানে হাসছে। কপট একটা ধমক দিল রাধী, 'থাম ছুঁড়ীরা, হেসেই যে মলি।'

হেসে হেসে মেয়েগুলো গড়িয়ে পড়ছিল। হাসির দাপট কমলে তারা ঠিক হয়ে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসল।

রাধী আবার শুরু করল, 'বেবোস্থাটা পাকা করে নে তিতাসী। নইলে ব্যাটাছেলের মন, কিছু বিশ্বেস নি। চোখে যদ্দিন নেশা রইবে তদ্দিন তার মন পাবি, সুহাগ পাবি। নেশা ছুটলেই সব আঁধার।'

নিজের খেয়ালেই রাধী বকে চলেছে, 'চোখের নেশা থাকতে থাকতেই সখারামকে বেঁধে ফ্যাল। নইলে কোন্‌দিন ফুড়ুত করবে। তা ছাড়া—'

'তা ছাড়া কী?'

তিতাসীর গলায় অস্ফুট একটা শব্দ ফুটল।

'তা ছাড়া এই রানীর হাটে টি-টি পড়ে গেছে। সবাই তোদের দুন্নাম গাইচে। সখারাম তোদের কুটুম না, জ্ঞেয়াতি না। তবু তাকে ঘরে রেখেচিস।

ইদিকে তোদের সোমসারে আর ব্যাটাছেলে নি। মোটে একটা বুড়ী আর দু-দুটো যুবুতী মেয়েমানুষ। মানুষের দুন্নাম গাইবারই তো কথা।'

কাঁদো কাঁদো গলায় তিতাসী বলল, 'জানতুম, দুন্নাম রটবেই। আমার ইচ্ছে ছিল নি, ভাই-বৌটাই ব্যাটাছেলেটাকে ঘরে নে তুলল।'

একটু থেমে আবার, 'ভগমানের নামে কইচি, কোন পাপ করি নি। বিশ্বেস কর ভাই, ব্যাটাছেলেটার সন্‌গে আজ পর্যন্ত এটা কথাও কই নি।'

রাধী বলল, 'আমি না হয় বুঝলম। কিন্তুক পাঁচজনের মুখ চাপা দিবি কেমন করে? আজান বুড়োর দোকানে তাড়ু খুড়ো নাকি বলেছে, রানীর হাটের সবাইকে ডেকে তোদের বিচের বসাবে, এখেন ঠেঙে তোদের তাড়িয়ে ছাড়বে।'

গুম মেরে বসে রইল তিতাসী। কিছু বলল না।

রাধী বলতে লাগল, 'তাই কইছিলম, সখারামকে তুই বে কর। লোকের মুখও চাপা দিতে পারবি, সোমসারের উবগারও হবে।'

'বে—'

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল তিতাসী, 'বে করচি! মুখপোড়াকে আজই দূর করব। যার জন্যে নিন্দে রটবে, দুন্নাম সইতে হবে, তাকে আবার বে—'

বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল তিতাসী। তার পর মাতালের মত টলতে টলতে সায়েবঘাটের সিঁড়ি বেয়ে ওপর দিকে উঠতে লাগল।

পেছন থেকে রাধী ডাকল, 'তিতাসী শোন্—'

তিতাসী জবাব দিল না।

উঠতে উঠতে তিতাসী শুনতে পেল! রাধীরা বলাবলি করছে, 'কী কথাই শুনিয়ে গেল। শুনে মরে যাই। অ্যাদ্দিন এক বাড়িতে রয়েছে, এখনো নাকি ব্যাটাছেলেটার সন্‌গে কথাই বলে নি!'

কে যেন বলল, 'ও বললে, আর আমরা বিশ্বেস করলম। ছুঁড়ী কত ঢঙ্‌ই না জানে।'

'ঢঙ্ করেই কি পার পাবে। ওদের নীলের (লীলার) কথা রানীর হাটের সব্বাই জানে। কী লজ্জা! কী ঘেন্না!'

আচ্ছন্নের মত হেঁটে চলেছে তিতাসী। পায়ের তলা দিয়ে কখন লাল ধুলোর সড়ক আর চোরকাঁটা-ভরা মাঠটা সরে গেল, হুঁশ নেই। সড়কের দু

পাশের সিমুর গাছ, পুরনো গির্জে, মোগলদের মিনার কখন যে পার হয়ে এসেছে, তিতাসী বলতে পারবে না। অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্যে সে হাঁটছে।

তিতাসী বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে বেশ বেলা হয়ে গেল। এখন কোথাও এতটুকু কুয়াশা নেই। অঘ্রানের আকাশটা এখন আশ্চর্য নীল, ঝকঝকে।

ছাই গাদাটার ওপর চুপচাপ বসে আছে সুখী বুড়ী। অনেক উঁচুতে, আকাশের নীল ঘেঁষে একজোড়া বথারি পাখি উড়ছে। ভুরুর ওপর একটা হাত রেখে একদৃষ্টে পাখি দেখছে বুড়ী। পাখি দুটো উড়তে উড়তে একসময় দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। অগত্যা আকাশ থেকে চোখ নামাতেই হল।

সামনের দিকে অল্প একটু ঝুঁকে উঠোন ঝাঁট দিচ্ছিল কামিনী-বৌ। তিতাসীকে দেখে সে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। অল্প একটু হাসল। বলল, 'বড় দেরি হয়ে গেল ভাই। এই উঠোনটা ঝাঁট দিয়েই যাচ্চি।'

নিজে থেকেই দেরি হওয়ার কৈফিয়ত দিতে শুরু করল কামিনী-বৌ, 'অনেক আগেই চলে যেতম। কিন্তুক এক গেরো বেধে বসল। তোকে তো নদীতে পাঠিয়ে দিলম। ইদিকে ওঘরে সেঁদিয়ে দেখি ব্যাটাছেলেটা নেই। মনটা ভারি খারাপ হয়ে গেল। ভাবলম ফুড়ুৎ করলে নাকি। কী করি, তুই নেই, শাউড়ীকে নে খুঁজতে বেরলম। ঘুরতে ঘুরতে আজান বুড়োর দোকানে গেলম। শুনলম, সে সায়েব খুড়োর সন্‌গে গেচে। খপরটা পেয়ে এই মাত্তর দুজনে ফিরেচি। তা পেরানটা এখনো ঠাণ্ডা হয় নি। সিদিন সায়েব খুড়ো ব্যাটাছেলেটাকে চেয়েছেল। কে জানে সায়েবখুড়োর মনে কী আছে।'

থমথমে গলায় তিতাসী বলল, 'সায়েবখুড়ো য্যাখন চেয়েচে ত্যাখন ওকে দিয়েই দে ভাই-বৌ।'

এক মাসের মত সখারাম এই রানীর হাটে আছে। কোনদিন তার সঙ্গে কি তার সম্বন্ধে একটা কথাও বলে নি তিতাসী। এই প্রথম সখারাম সম্বন্ধে মুখ খুলল সে।

'কী কইচিস!' অবাক হয়ে কামিনী-বৌ তাকাল।

'ঠিকই কইচি। উই আপদের জন্যে রাস্তায়-ঘাটে কান পাতা যাচ্চে না। সবাই দুন্নাম গাইচে। যা—তা কইচে।'

কামিনী-বৌর চোখ দুটো ধক করে উঠল।

তিতাসী বলতে লাগল, 'ওকে তুই বিদেয় কর ভাই-বৌ।'

খুব শান্ত গলায় কামিনী-বৌ বলল, 'যার মুখ আচে, সে-ই দুন্নাম গায়। ও

সবে কান দিস নি। কানে কুলুপ এঁটে রাখ।'

তিতাসী জেদ ধরল, 'কুনো কথা শুনব নি। তুই ওকে তাড়া।'

'কেন তাড়াব? কার ডরে তাড়াব? সাত বচ্ছর পর ওকে পেতে এট্টু সুখের মুখ দেখেচি। অ্যাদ্দিন আধপেটা খেয়েচি। ছেঁড়া কাপড় সেলাই করে পরেচি। ও রোজকার করতে চাট্টি পেট পুরে খাচ্চি, আস্ত কাপড় পরতে পাচ্চি।'

আস্তে আস্তে কামিনী-বৌর গলা চড়তে লাগল, 'আমাদের ভাল কারো সইচে না। সবার চোখ টাটাচ্চে।'

'আধপেটা খাই, ছেঁড়া কাপড় সেলাই করে পরি, সেও ভাল। বুঝব সে আমাদের ভাগ্য। কিন্তুক এই তুন্নাম সয় না।'

কামিনী-বৌ বলল, 'তুন্নাম তো আজ লোতুন নয়। যিদিন তোর ভাই লড়ুইতে গেল, সিদিনই ঠেঙেই তো তুন্নাম রটচে। আগে তো অমন ভেঙে পড়িস নি। আজ তোর হল কী?'

'ছ্যাথ্ ভাই-বৌ, সেই তুন্নাম আর এই তুন্নামে অনেক তফাত। আগে মানুষে অ্যামন করে বলতে পারত নি। তা মানুষেরই বা কী দোষ! জ্ঞেয়াতি না, কুটুম না, একটা ব্যাটাছেলেকে ঘরে এনে তুলেচিস। লোক কি মুখ বুঁজে রইবে?'

'মুখ বুঁজে রইতে কে বলেচে? পেরানে যা চায়, তাই তারা বলুক। নিজেদের কাচে আমরা খাঁটি আছি। তুন্নাম আমাদের কী করবে?'

তিতাসী চেঁচিয়ে উঠল, 'তুই তোর নিজের কথাই বলে যাচ্ছিস। মানুষে কী বলচে শুনেচিস?'

'কী বলচে?'

'রানীর হাটের সবাইকে ডেকে আমাদের বিচার বসাবে। আমরা নাকি খারাপ। এখেন ঠেঙে আমাদের তাড়িয়ে দেবে।'

'বিচার করবে কে? তাড়াবে কে? অ্যাত বড় বুকের পাটা কার? বাপের ব্যাটা হলে সে যেন আমার কাছে আসে!'

কামিনী-বৌ ক্ষেপে উঠল, 'সাত বছর কুনোদিন খেয়ে কুনোদিন না খেয়ে কাটিয়েচি। কই, এট্টা পয়সা দিয়েচে কেউ, একবেলা ডেকে কেউ খাইয়েচে, না তিনটে পেরানী (প্রাণী) কেমন করে দিন কাটাচ্চি, কী খাচ্চি, কেউ খোঁজ নিয়েচে?'

কামিনী-বৌর চোখ দুটো জ্বলছে।' উত্তেজনায় বুকটা তোলপাড় হচ্ছে। ঘন ঘন শ্বাস পড়ছে। সমানে ফুঁসছে সে, 'ছাড়ব নি, কিছুতেই ব্যাটাছেলেটাকে ছাড়ব নি। দেখি কে কী করতে পারে। কার ক্ষ্যামতা কতখানি?'

কামিনী-বৌর মারমুখী চেহারা দেখে তিতাসী আর কিছু বলল না।

॥ ১৫ ॥

রূপসী নদীর পার ধরে জেলাবোর্ডের পথ। লাল ধুলোর পথটা অঘ্রানের হিমে ভিজে আছে।

ভেজা ধুলো মাড়িয়ে দুজনে চলেছে। দুজনে অর্থাৎ সখারাম আর হ্যালিডে সায়েব।

জেলাবোর্ডের সড়কটার একপাশে সারি সারি কাঠের পোস্ট পোঁতা। যুদ্ধের আমলে পোস্টগুলির গায়ে বিজলির বাতি জ্বলত। যুদ্ধ থেমেছে। বিজলির জলুষ নিবে গিয়েছে। তার গুটিয়ে পোস্টগুলির মাথায় দলা পাকিয়ে আছে। পাকানো তারের ফাঁকে ফাঁকে খানিকটা করে ফিকে কুয়াশা এখনও, এত বেলাতেও, জমে রয়েছে।

সড়কের আর একপাশে সারি সারি সিড়িঙ্গে চেহারার খেঁজুর গাছ। গাছগুলির গলায় মাদুলির মত ছোট ছোট মেটে হাঁড়ি ঝুলছে।

চলতে চলতে সখারাম ডাকল, 'হেই গো সায়েব—'

পাশ থেকে হ্যালিডে সায়েব সাড়া দিল, 'হ্যাঁ—'

খাকারি দিয়ে গলাটা সাফ করে নিল সখারাম। বলল, 'এট্টা কথা কইছিলম—'

'বলে ফেল।'

'শুনেচি তুমিও নাকি আমার মতন ভাসতে ভাসতে একদিন এই রানীর হাটে এসেছিলে?'

'ঠিকই শুনেছ।'

হ্যালিডে সায়েব বলতে লাগল, 'সে কি দু দশ দিনের কথা! তিরিশ বচ্ছর হল, এখেনে এয়েচি। সেই যে এলম, আর বেরুতে পারলম না। এই রানীর হাটেই জীবন কেটে গেল।'

বলতে বলতে আকাশের দিকে তাকাল হ্যালিডে সায়েব। কুয়াশায়

আকাশটা এখনও আবছা। সেই আবছা আকাশের ওপারে দৃষ্টিটাকে কোথায় যেন হারিয়ে ফেলল সে। খুব সম্ভব, তিরিশ বছর আগের সেই দিনগুলিকে খুঁজতে লাগল।

হ্যালিডে সায়েব বলতে লাগল, 'আমার আগে যিনি এখেনে পাদ্রী ছিলেন, তার নাম ম্যাথ্ সায়েব; ম্যাথ্ সায়েব মারা যাবার পর আমি এলম। তখন আমার কতই বা বয়েস! সারাদিন অসুরের মতন খাটতে পারতম। বেঁড়ে একটা টাট্টুতে চেপে গাঁকে গাঁ চষে বেড়াতম।'

সখারাম বলল, 'কামিনী-বৌর মুখে শুনেচি, তুমি নাকি আগে মানুষ ধরে ধরে খিরিস্তান করতে।'

অল্প একটু হাসল হ্যালিডে সায়েব। খুব আস্তে আস্তে বলতে লাগল, 'হ্যাঁ, প্রীচ্ করতেই রানীর হাটে এসেছিলম। যীশুর মহিমা প্রচার করাই ছিল আমার কাজ। চেয়েছিলম সবাই খ্রীষ্টান হোক। কিন্তুক—'

হ্যালিডে সায়েব যেন সখারামের পাশে নেই। অনেক, অনেক দূর থেকে তার স্বর যেন বাতাসে ভর করে আসতে লাগল।

বলতে বলতে তন্ময় হয়ে গিয়েছে হ্যালিডে সায়েব। হঠাৎ যেন তাকে কথায় পেয়েছে। সখারাম না, যেন নিজের সঙ্গেই কথা বলছে সে। সখারাম তার কথা কতটা বুঝছে, আদৌ বুঝছে কিনা, সেদিকে লক্ষ্য নেই। আচমকা স্মৃতির ওপর থেকে একটা পর্দা উঠে গিয়েছে। তিরিশ বছর আগের দিনগুলির মধ্যে হারিয়ে গিয়েছে হ্যালিডে সায়েব।

অফুরন্ত উৎসাহ আর বিপুল উদ্যম নিয়ে রানীর হাটে এসেছিল হ্যালিডে সায়েব। তখন তার সেই বয়স, যখন রানীর হাটের লাল ধুলো, গেরুয়া জলের রূপসী নদী, ঘাসে ভরা মাঠ—সব কিছু ভাল লেগে গিয়েছিল। বেঁড়ে টাট্টুতে চেপে ঝকঝকে রোদের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে যেন নেশা ধরে যেত।

সবচেয়ে তার ভাল লাগত এখানকার মানুষগুলিকে। সহজ, সাধারণ সেই সব মানুষ, যাদের চামড়া থেকে খই ওড়ে। যারা অশিক্ষিত, রুগ্ণ, দুর্বল। যাদের জীবনে গতি নেই, ব্যাপ্তি নেই। জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে—এই তিনের গণ্ডির মধ্যে যাদের জীবন মন্থর, ঢিমে তেতালা। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের রেখাটি এখানে আশ্চর্য রকমের সরল। কোথাও এতটুকু উঁচু নীচু নেই।

রানীর হাটের ক্ষুদ্র সীমাটুকুর বাইরে যে একটা বিপুল পৃথিবী পড়ে আছে,

সে সম্বন্ধে এখানকার বাসিন্দাদের কোন ধারণা নেই। মাথাব্যথাও নেই। নিজেদের সংক্ষিপ্ত বৃত্তটুকুর মধ্যেই তারা তুষ্ট, পরিতৃপ্ত।

রোগ-অশিক্ষা-দারিদ্র্য—জন্ম থেকেই তাদের তিন সঙ্গী। মহাজন দশ টাকা দিয়ে বিশটাকার খতে টিপ সই নিয়ে রাখে। চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ বাড়ে। আর সেই সুদের চক্রান্তে একদিন ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হতে হয়।

বছরে দুবার অন্তত মহামারী এই রানীর হাটে আসবেই। এ একেবারে নিয়মে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। মড়ক লেগে এই অঞ্চলটা যখন প্রায় উজাড় হতে বসে, তখন রেহাই মেলে ; তার আগে নিস্তার নেই।

রানীর হাটের ঘাটে পথে যে মানুষগুলি ঘুরে বেড়ায়, তারা রুগ্ণ, পঙ্গু, নড়বড়ে। জীবনের স্বাদ এখানে পানসে, জীবনের রঙ এখানে ম্যাড়মেড়ে।

তবু এই রানীর হাটকে, তার বিস্বাদ বিবর্ণ জীবনকে ভালবেসে ফেলেছিল হ্যালিডে সায়েব।

প্রথম প্রথম হাটে হাটে, গ্রামে গ্রামে ঘুরে গলা ফাটিয়ে খ্রীষ্ট-মাহাত্ম্য প্রচার করত হ্যালিডে সায়েব।

'যীশু যখন যিরুশালেমের দিকে অগ্রসর হইতে উদ্যত হইলেন, তখন তিনি পথিমধ্যে বারোজনকে ডাকিয়া বলিলেন, দেখ, আমরা যিরুশালেম যাইতেছি ; প্রধান পুরোহিত ও ধর্মগুরুদের হস্তে মনুষ্যপুত্র (প্রভু যীশু) সমর্পিত হইবেন, তাঁহারা তাঁহার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিবেন, এবং বিজাতীয়দের হস্তে তাঁহাকে অর্পণ করিবেন যেন তাঁহাকে বিদ্রূপ করা হয় ও কোড়া মারা হয় এবং ক্রুশ বিদ্ধ করা হয় ; আর তৃতীয় দিবসে তিনি উঠিবেন।'

কোনদিন মৃত্যু সম্বন্ধে যীশুর ভবিষ্যদ্বাণী, কোনদিন সেণ্ট জন বা সেণ্ট মার্কের গসপেল বাঙলায় তর্জমা করে শোনাত হ্যালিডে সায়েব। মানবপুত্রের পায়ে শরণ নেবার আবেদন জানাত। তারপর মথি ও লুক লিখিত সুসমাচার বিলাত।

কিন্তু কিছুদিন পর যখন দেখা গেল রবিবারের প্রার্থনাসভায় গির্জের হলঘরটা একেবারে ফাঁকাই পড়ে থাকে, পাপস্বীকারের দিনে একটা মানুষেরও দেখা মেলে না, তখন হ্যালিডে সায়েবের সন্দেহ দেখা দিল। এতদিনে সত্যিই কি সে একটা কৃশ্চ্যানও করতে পেরেছে!

এদিকে সদরের বড় গির্জে থেকে ক্রমাগত চাপ আসতে লাগল। প্রীচ্ করে যাও। রানীর হাটের তাবত বাসিন্দাকে কৃশ্চ্যানিটির পতাকার তলায় নিয়ে এসো।

হ্যালিডে সায়েব কিন্তু অন্য কথা ভাবছিল। রানীর হাটের মাথায় যীশুর পতাকা ওড়াবার আগে আর একটা কাজ আছে। সবার আগে এখানকার জীবনের মূলে পৌঁছতে হবে।

রোগে-অশিক্ষায়-দারিদ্র্যে আর কুসংস্কারে রানীর হাট জর্জরিত হয়ে আছে। এইসব উপসর্গ থেকে তাকে মুক্ত করতে হবে। নতুবা শুধুমাত্র প্রীচ্ করে, হাটে মাঠে গলা ফাটিয়ে যীশুর মহিমাকে এদের মর্মে পৌঁছে দেওয়া যাবে না।

হঠাৎ একদিন প্রীচিঙ বন্ধ করে দিল হ্যালিডে সায়েব।

খবরটা যথাসময়ে সদরের বড় গির্জেতে পৌঁছল। সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে অতি সংক্ষিপ্ত অতি স্পষ্ট একটি চিঠি এল।

রানীর হাটে প্রীচিঙ যখন বন্ধ হয়েছে, প্রীচিঙ বাবদ গ্রাণ্টও বন্ধ করে দেওয়া হল।

কিন্তু হ্যালিডে সায়েবের মনোবল অটুট। রানীর হাট ছেড়ে সে গেল না। এখানকার জীবনের মধ্যে আশ্রয় খুঁজে নিল।

রানীর হাটে বছরের পর বছর কাটিয়ে বিরাট একটা সত্যকে খুঁজে পেয়েছে হ্যালিডে সায়েব। তার মনে হয়েছে, বাইরে থেকে এসে অন্য একটা ধর্ম প্রীচ্ করে এদের ভাল করা যাবে না। এই মানুষগুলিকে তাদের নিজস্ব সমাজ এবং ধর্মবোধের ভেতর রেখে যতটুকু ভাল করা যায়, ততটুকুই মঙ্গল। এর অতিরিক্ত কিছু প্রয়োজন নেই।

হ্যালিডে সায়েব বলতে লাগল, 'কী হবে, এক ধর্মের মানুষের ওপর আর একটা ধর্ম চাপিয়ে দিয়ে? কিছুই হবে না। কোন লাভ নেই। বরঞ্চ তাতে ক্ষতিই হবে। তাই প্রীচিঙ বন্দ করে দিয়েচি।'

সখারাম কিছু বলল না। পাশাপাশি চলতে লাগল।

হ্যালিডে সায়েব বলতে লাগল, 'প্রীচিঙ বন্দ করেচি। কিন্তুক এ জায়গাটা ছাড়তে পারি নি। বুঝলে কিনা সখারাম, মায়া—জায়গাটার ওপর কেমন যেন মায়া বসে গেল।'

'হ্যাঁ—'

অস্ফুট একটা শব্দ করল সখারাম।

'এখেনকার মানুষগুলোর ওপর কেমন একটা টান—'

এবার সখারাম কিছু বলল না।

নিজের খেয়ালে হ্যালিডে সায়েব বলে যাচ্ছে, 'প্রীচিঙ তো বন্দ করে দিলম!

কিছু একটা তো করতে হবে। আমি বাপু হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারি না। কী করি কী করি, ভেবে শেষ পর্যন্ত একটা ইস্কুল আর ছোট-খাটো একটা হাসপাতাল খুলেচি। এ দিয়ে লোকের যা উপকার করতে পারি।

হ্যালিডে সায়েব বলতে লাগল, 'ইস্কুল আর হাসপাতালটা নিয়ে তিরিশ বচ্ছর কেটে গেল।'

তিরিশ বছর। সে কত সময়!

তিরিশ বছরের কথায় নিজের কথা মনে পড়ল সখারামের। দু মাস, ছ মাস, জোর এক বছরের বেশী কোথাও সে আটকে থাকে নি। তার স্বভাবের মধ্যে যে অস্থির বেদেটা আছে, বার বার সে তাকে ঘরছাড়া করেছে। কোন টান কোন মোহই তাকে বেঁধে রাখতে পারে নি।

তা যার যেমন স্বভাব। কারো বিশেষ একটা জায়গাকে ভাল লেগে যায়। সেখানকার ছোট গণ্ডির মধ্যে সারাটা জীবন কাটিয়ে দিয়েই তার আনন্দ। কারো কাছে বিশেষ বলে কিছু নেই। নির্বিশেষে সে এখান থেকে ওখানে ছুটে বেড়ায়। ছুটে বেড়ানোতেই তার সুখ। কোন গণ্ডির মধ্যে সে জীবনকে পোষ মানাতে জানে না।

সখারাম ভাবল, তিরিশ বছর এই রানীর হাটে কাটিয়েও হ্যালিডে সায়েবের ক্লান্তি নেই। হ্যালিডে সায়েবের সঙ্গে তুলনা করলে ক'দিনই বা সে এখানে আছে। মাত্র একটা মাস, তবু মনে হয়, কতদিন কেটে গেল!

হঠাৎ কেমন যেন উড়ু উড়ু লাগল সখারামের। মনের ভেতর থেকে কে যেন বলতে লাগল, 'এখেনে তো অনেকদিন কাটল। আর কেন?'

॥ ১৬ ॥

ফিকে কুয়াশার যে পর্দাটা আকাশটাকে জড়িয়ে ছিল, এখন আর তা নেই। এখন রোদের ঢল নেমেছে। অঘ্রানের রোদ ভারি মিঠে।

নদীর দিক থেকে ঝিরঝিরে বাতাস দিয়েছে।

মিঠে রোদ আর ঝিরঝিরে বাতাসের সুখস্পর্শ খুব ভাল লাগছে।

লাল ধুলোর পথে পা ডুবিয়ে চলতে চলতে হ্যালিডে সায়েবই আবার শুরু করল, 'কিছু লেখাপড়া শিখেচ সখারাম?'

'কোথায় আর শিখলম! কে-ই বা শেখালে? সারা জন্ম তো এঘাট ঠেঙে

ওঘাটে ঘুরে মরচি। লেখাপড়া শেখার সময় আর কোথায় পেলম?'

সখারাম বলতে লাগল, 'কাঠ-মুখ্যু হয়েই রইলম গো সায়েব; মানুষ জনম মিছে হল।'

'একেবারে কিছুই শেখ নি?'

চোখ বুজে কী একটু যেন ভাবল সখারাম। বলল, 'একেবারে কিছুই যে শিখি নি, তা নয়। তবে সে কথা বলার মতন না। হেই য্যাখন ইটিণ্ডেঘাটে পোড়েল মশাইদের বাড়ি ছিলম, হঁ্যা গো সায়েব, সে বাড়ির ছেলেদের সন্‌গে পড়তম। দ্বিতীয় ভাগ আর ধারাপাতখানা শেষ করেছিলম। কিন্তুক সে সব অনেক বচ্ছর আগের কথা।

'বাঃ বাঃ, বেশ—'

হ্যালিডে সায়েব উৎসাহিত হয়ে উঠল।

বিষণ্ণ গলায় সখারাম বলতে লাগল, 'তা পোড়েল মশাইদের বাড়িও ছাড়লম লেখাপড়াও জন্মের মতন ঘুচল।'

'ঘুচবে কেন? কিছুই জন্মের মতন ঘোচে না সখারাম।'

হ্যালিডে সায়েবের গলাটা গাঢ় শোনাতে লাগল, 'আবার নতুন করে শুরু কর দিকিন।'

আচমকা হ্যালিডে সায়েবকে চমকে দিয়ে জোরে জোরে হেসে উঠল সখারাম। বলল, 'এই বুড়ো বয়েসে মাথায় ঘুণ ধরে গেচে। এখন আর লেখাপড়া পোষাবে না। তা ছাড়া এ বয়সে লেখাপড়া দিয়ে হবেই বা কী?'

'তোমার কিছু হোক আর না-ই হোক, আমার দরকার আছে।'

'তোমার আবার কিসের দরকার!'

'বলব বলব, 'এট্টু সবুর কর। নিজের চোখেই সব দেখতে পাবে। ত্যাখন বুঝে নিও।'

'বেশ।'

আরো খানিকটা এগুতেই একটা বাঁক পড়ল। দু জনে বাঁকের মুখে আসতেই ব্যাপারটা ঘটল।

জেলাবোর্ডের সড়কের বাঁ পাশে রূপসী নদী। ডান পাশে উঁচুনীচু ডাঙা জমি। সেই জমির ওপর দিয়ে পনের-বিশটি কালো কালো ছোট ছেলে দৌড়তে দৌড়তে এসে হ্যালিডে সায়েবকে ঘিরে ধরল। কারো পরনে এক টুকরো ময়লা ন্যাকড়া। কেউ একেবারেই উলঙ্গ। সরু সরু কাঠি কাঠি হাত-পায়ের ঠিক মাঝখানে প্রকাণ্ড

এক-একটি পেট। গলায় কালো কারে একরাশ করে মাদুলি ঝুলছে। কোমরে তামার পয়সা ফুটো করে লাল ঘুন্‌সি দিয়ে বাঁধা।

প্রায় সবার হাতেই একটা করে কানাভাঙা স্লেট, ছেঁড়া বই, স্লেট ভেজাবার ন্যাকড়া।

হ্যালিডে সায়েবকে ঘিরে ছেলেগুলো চেঁচাতে লাগল, 'সায়েবখুড়ো এয়েচে।'

'সাহেবখুড়ো এয়েচে।'

সস্নেহে এর-ওর গায়ে হাত বুলোতে লাগল হ্যালিডে সায়েব।

রোগা ডিগডিগে একটা ছেলে বলল, 'আমরা হেই কতখন (কতক্ষণ) বসে আচি। তুই আর আসচই না।'

'এই তো এসেচি।'

জেলাবোর্ডের সড়ক থেকে ডাঙা জমিতে নামল সবাই। আগে আগে ছেলে-গুলো চলেছে। পেছনে সখারাম আর হ্যালিডে সায়েব।

চলতে চলতে হ্যালিডে সায়েব বলল, 'বুঝলে সখারাম, এদের নিয়েই আমার কাজ। এদের নিয়েই আমার যত ভাবনা। এদের যদি মানুষ করতে পারি—'

বলতে বলতে হ্যালিডে সায়েবের গলাটা গাঢ় হয়ে এল।

একসময় তারা সেইখানে পৌঁছল।

চারপাশে গুটিকতক ত্রিভঙ্গ চেহারার মাদার গাছ। মাঝখানে বাঁশের বেড়া আর টিনের চালের লম্বাটে একখানা ঘর। চেহারা দেখেই বোঝা যায়, ঘরটার বয়স অনেক। চালের টিন কত কালের রোদ আর জলে যে ঝাঁঝরা হয়ে আছে, কে তার হদিস দেবে। বাঁশের বেড়ায় পচন ধরেছে। ভিতের মাটিতে ধ্বসানি শুরু হয়েছে।

হ্যালিডে সায়েব বলল, 'এটা ইস্কুল ঘর—'

স্কুল-ঘরটা নিজের দীন অস্তিত্ব নিয়ে কোনরকমে টিঁকে আছে।

ছেলেগুলোকে নিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকল হ্যালিডে সায়েব। সঙ্গে সঙ্গে সখারামও ঢুকল।

ভেতরে সারি সারি চাটাই বিছানো। চাটাইগুলো ছেঁড়া ছেঁড়া, বহু ব্যবহারে জীর্ণ।

ছেলেরা যে যার চাটাইতে বসে পড়ল। হ্যালিডে সায়েব আর সখারাম বসল সামনের দিকে, ছেলেদের মুখোমুখি।

হ্যালিডে সায়েব ছেলেদের বলল, 'শটকে (শতকিয়া) শিখে এয়েচিস ?'

'হ্যাঁ—'

ছেলেরা মাথা নাড়ল।

'সবাই লিখে ফ্যাল।'

ছেলেরা সুর করে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে শটকে লিখতে শুরু করল, 'একে চন্দ, দুয়ে পক্ষ—'

হ্যালিডে সায়েব আবার বলল, 'তোরা লিখতে থাক। কেউ গোলমাল করবি না। আমি এট্টু ঘুরে আসচি।'

সখারামের দিকে তাকিয়ে বলল, 'চল সখারাম, বেরিয়ে পড়ি।'

বাইরে এসে সখারাম শুধলো, 'কুথায় যাবে ?'

'ছেলে যোগাড় করতে। দেখলে তো পনের-কুড়িটা মোটে ছেলে। এই ক'টা ছেলে দিয়ে কি ইস্কুল চলে ?'

একটু থেমে হ্যালিডে সায়েব আবার বলল, 'আমার হয়েচে যত জ্বালা, পড়াতেও হবে আবার পড়াবার জন্যে ছেলেও যোগাড় করতে হবে।'

খানিকটা পাশাপাশি হাঁটার পর হ্যালিডে সায়েব আবার শুরু করল, 'ইস্কুলের হাল দেখেচ সখারাম। তা আমি কী করতে পারি! কোনদিক থেকে একটা পয়সা খয়রাত মেলে না। একটা মাস্টার রাখতে পারি না।'

যেন কৈফিয়ত দিতে শুরু করল হ্যালিডে সায়েব। স্কুলের দীনতার সব লজ্জা যেন তার। গলাটা কেমন যেন ক্ষুব্ধ শোনাতে লাগল, 'এমন করে চলে না, চলতে পারে না।' একটু থেমে আবার, 'জেলাবোর্ড থেকে ইস্কুলের জন্যে হয়তো কিছু আদায় করা যায়। একা মানুষ, ক'দিকে তাল সামলাবো? ছেলে পড়াব, না ছেলে জোগাড় করব, না জেলাবোর্ড যাব? উদিকে আবার হাসপাতাল আছে, রুগী আছে, এর আপদ ওর বিপদ তো লেগেই আছে। সব দিক আমাকেই তো দেখতে হবে।'

হাঁ-না—কিছুই বলল না সখারাম।

স্কুল ঘরটা থেকে ডাঙা জমি পেরিয়ে গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়েছে দু জনে।

প্রথমেই একটা খোড়ো ঘর পড়ল। নতুন খড় দিয়ে চালটা ছাওয়া। রোদ লেগে চালটা কাঁচা সোনার মত জ্বলছে।

সামনের দিকে ঝকঝকে তকতকে একটু উঠোন। উঠোনে এসে হ্যালিডে

সায়েব ডাকাডাকি শুরু করল, 'হীরু আছিস? হেই গো—'

'কে?'

'আমি—'

'কে—সায়েব খুড়ো—'

'হ্যাঁ রে বাপু, হ্যাঁ। এখন ঘর থেকে বেরো দিকিন।'

ঘরের ভেতরে থেকে একজন আধবয়সী লোক বেরিয়ে এল। মাথার চুল প্রায় মুড়িয়ে কাটা। থলথলে মাংসল একটা ভুঁড়ি। পরনে হাঁটু পর্যন্ত মোটা, ময়লা টেনি। থ্যাব্ড়া নাক, খসখসে কালো চামড়া।

হ্যালিডে সায়েব বলল, 'আজ নিয়ে সাতদিন আসচি। তোর মতলবখানা কী। আর কদ্দিন ঘুরতে হবে? তোর ছেলেকে ইস্কুলে পাঠাবি কিনা, সাফ সাফ বলে দে বাপু।'

ঘস ঘস করে খানিকক্ষণ উরু চুলকোল হীরু। কী একটু ভাবল। তারপর বলল, 'উরা কইছিল নাঙল ধরতে পারলেই চাষার ব্যাটার জন্ম কাটে। বিদ্যের জাহাজ হয়ে হবে কী?'

'উরা কারা?'

'উই সোনাতন, অভয়—'

'অ। ওদের কথায় তা হলে নাচছিস!'

হ্যালিডে সায়েব বলল, 'ছেলে লেখাপড়া শিখলে তোর উপকার হবে, না আমার হবে?'

হীরু জবাব দিল না।

হ্যালিডে সায়েব বলতে লাগল, 'আচ্ছা বল তো হীরু, অ্যাদ্দিন তো এই রানীর হাটে আছি। তোদের কোন খারাপ পরামর্শ দিয়েছি, না অপকার কিছু করেছি?'

দুঃখে হয়তো বা অভিমানেই গলাটা বুজে গেল হ্যালিডে সায়েবের।

হ্যালিডে সায়েবের কথাগুলি হীরুর প্রাণের ভেতরে স্পর্শাতুর জায়গাটায় ঘা দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সে বলে উঠল, 'না না, সে কথা বলেচি কখনো?'

'তবে আমার কথা বিশ্বেস করে ছেলেকে ইস্কুলে পাঠা। ঠকবি না। আখেরে লাভ হবে!'

নিজের মনেই কী যেন ভাবল হীরু। তার পরেই মনটা স্থির করে ফেলল। বলল, 'বেশ, তোমার য্যাখন অ্যাতই ইচ্ছে, ছেলে কাল ঠেঙেই ইস্কুলে যাবে।

চাষার ব্যাটা পণ্ডিতই হোক।'

হ্যালিডে সায়েব বলল, 'কথাটা মনে থাকে যেন। সকাল হলেই ইস্কুলের বদলে ছেলেকে আবার মাঠে পাঠিয়ে বসো না।'

'না না, কথা য্যাখন দিয়েচি—'

একপাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল সখারাম। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হ্যালিডে সায়েবের ছেলে যোগাড় করার পদ্ধতি দেখছিল।

হীরুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে দু জনে আরো কয়েক জায়গায় ঘুরল। খানিকটা টালবাহানা করে কেউ ছেলে পাঠাতে রাজী হল। নানা ওজর তুলে কেউ রাজী হল না। যারা রাজী হল না, হ্যালিডে সায়েব তাদের বলে এল, আবার সে আসবে। যেমন করে পারে, তাদের ছেলেদের সে স্কুলে নেবেই।

ছেলের জন্য প্রায় রোজই হ্যালিডে সায়েবকে রানীর হাটের ঘরে ঘরে ঘুরতে হয়।

ঘুরতে ঘুরতে বেশ বেলা হয়ে গেল।

রোদের তাত বেড়ে উঠেছে। বেলার দিকে তাকিয়ে হ্যালিডে সায়েব ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'অনেক হয়েচে সখারাম। চল, এবার ইস্কুলে ফেরা যাক। ছেলে-গুলোকে রেখে এসেচি। এতক্ষণ তারা কী যে করছে—'

হন হন করে পা চালিয়ে দু জনে স্কুলঘরে ফিরে এল।

শটকে লেখা দেখে, পুরনো পড়া ধরে, নতুন পড়া দিয়ে ছেলেদের ছুটি দিতে দিতে প্রায় দুপুর হয়ে গেল।

সূর্যটা এখন সরাসরি মাথার ওপর এসে উঠেছে।

ছুটি পেতেই ছেলেরা হুড়োহুড়ি করতে করতে চলে গেল। সখারাম আর হ্যালিডে সায়েবও বেরিয়ে পড়ল।

এতক্ষণে সখারাম কথা বলল, 'এবেরে কী করবে? ছেলে পড়ানো হল, ছেলে জোটানো হল। এবেরে চল, চান-খাওয়া সারতে হবে তো!'

অল্প একটু হাসল হ্যালিডে সায়েব। বলল, 'আজ কপালে চান-খাওয়া নেই সখারাম।'

'কেন?'

অবাক হয়ে হ্যালিডে সায়েবের মুখের দিকে তাকাল সখারাম।

'এখনো ঢের কাজ পড়ে আছে। একবার হাসপাতালে যেতে হবে। আজ

সদর থেকে বড় ডাক্তার রুগী দেখতে আসবে। আজ অনেক হুজ্জুত।'

একটু থেমে হ্যালিডে সায়েব বলল, 'গির্জেয় ফিরতে ফিরতে আজ রাত হয়ে যাবে। ভাবচি, রাত্তিরে ফিরেই খাব।'

সখারাম বলল, 'চট করে চাট্টি খেয়ে এলে হত নি?'

'না, সময় নেই।'

হ্যালিডে সাহেব বলতে লাগল, 'আর এ তো অভ্যেসই হয়ে গেছে। কাজ সেরে গির্জেয় ফিরতে ফিরতে রোজই তো রাত হয়ে যায়।

খানিকটা চুপচাপ।

হঠাৎ সখারাম ডাকল, 'আচ্ছা সায়েবখুড়ো—'

এই প্রথম হ্যালিডে সায়েবকে সায়েবখুড়ো বলে ডাকল সখারাম।

'বল।'

হ্যালিডে সায়েব মুখ তুলল।

'কইছিলম, এতে কী লাভ?'

'কিসে?'

হকচকিয়ে সখারামের মুখের দিকে তাকাল হ্যালিডে সাহেব।

'এই যে তুমি মানুষের উবগার করে বেড়াচ্চ, এর ওর ছেলেকে ধরে লেখাপড়া শেখাচ্চ, হাসপাতাল খুলেচ। ইদিকে নিজের চান-খাওয়ার ঠিক নি। দু দণ্ড জিরোবার সময় নি। এতে তোমার কী লাভ?'

হ্যালিডে সায়েবের রোদে-পোড়া তামাটে মুখে স্নিগ্ধ একটু হাসি ফুটল। খুব আস্তে, প্রায় অস্ফুট গলায় সে বলল, 'লাভ-লোকসান কোনদিন তো খতিয়ে দেখি নি সখারাম।'

অনেকক্ষণ কেউ আর কিছু বলল না।

সামনের একটা মাদার গাছে এক জোড়া শামকল পাখি ডানা ঝাপটাচ্ছে। জেলাবোর্ডের সড়ক থেকে পাক খেতে খেতে লাল ধুলো উড়ে আসছে। সড়কের ওপাশের গেরুয়া নদীটা দুপুরের রোদে ঝলকাচ্ছে।

খুক খুক করে একটু কাশল হ্যালিডে সায়েব। বোঝা গেল, এই কাশিটা ভূমিকা মাত্র। আরো কিছু সে বলতে চায়।

সখারাম শুধলো, 'কিছু কইবে সায়েবখুড়ো?'

'হ্যাঁ।'

মনটা স্থির করে ফেলল হ্যালিডে সায়েব। কথাগুলো কেমন করে বলবে,

ভেঁজে নিল। তার পর শুরু করল, 'নিজের চোখেই তো সব দেখলে সখারাম।'

'দেখলম।'

একটু চুপ।

হ্যালিডে সায়েব আবার বলল, 'অনেক বয়েস হল সখারাম।'

'হ্যাঁ।'

সখারাম ঘাড় কাত করল।

'বড্ড ভাবনা ছিল সখারাম, এই ইস্কুল, হাসপাতাল আর এখেনকার দায় কার মাথায় চাপিয়ে যাব।'

'কোথায় যাবে?'

'যাব আর কোথায়?' হ্যালিডে সায়েব বলল, 'মরবার বয়স হল না?'

সখারাম কিছু বলল না।

হঠাৎ হ্যালিডে সায়েব বলল, 'এবারে আমার সব ভাবনা ঘুচল।'

আড় চোখে একবার সখারামের মুখের দিকে তাকাল হ্যালিডে সায়েব। সে মুখে কথাগুলির কী প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, বুঝতে চেষ্টা করল।

কিন্তু সখারাম এবারও চুপ। ঠোঁটদুটো তার কুলুপ আঁটা।

হ্যালিডে সায়ের বলতে লাগল, 'আমি একা মানুষ। ক'দিক আর সামলাতে পারি! তাই বলছিলম, তোমার তো তিন কুলে কেউ নেই, ঘরের টান নেই, কারো জন্যে ভাবনা চিন্তা নেই। একেবারে খোলা আকাশের পাখি। তোমাকে আমার চাই।'

একটু ভেবে নিল হ্যালিডে সায়েব। আবার শুরু করল। গলার স্বর গম্ভীর, আবেগে গাঢ়, 'বলছিলম, আমার সঙ্গে কাজে লেগে যাও। ইস্কুলের জন্যে ছেলে যোগাড় করবে, হাসপাতালটা দেখবে—'

তবু সখারাম কিছু বলছে না।

হ্যালিডে সায়েবের যখন দায়, তখন তাকেই বলতে হচ্ছে, 'রাস্তায় তোমাকে লেখাপড়ার কথা বলছিলম না?'

'হ্যাঁ—'

এতক্ষণে মুখ খুলল সখারাম।

'ভাবছি রাত্তিরে রাত্তিরে তুমি আমার কাছে পড়বে। পড়াশোনায় এট্টু এগুলে ইস্কুলের ভার তোমার ওপরেই চাপিয়ে দোব।'

একদৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে সখারামকে দেখছে হ্যালিডে সায়েব। তার

নীলাভ চোখদুটো জ্বলছে! মনে হয়, কেউ যেন সে দুটোর পেছনে এক জোড়া খুব তেজী আলো জ্বেলে দিয়েছে।

হ্যালিডে পাদ্রীর চোখদুটোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সখারামের স্নায়ুগুলো কেমন যেন ঝিম ঝিম করতে লাগল। মানুষের চোখে এমন আলো কোনদিন সে দ্যাখে নি।

মাদার গাছের শামকল পাখিদুটো এখনও ডানা ঝাপটাচ্ছে। অনেক উঁচুতে আকাশটা জ্বলছে। ওপাশের গেরুয়া নদীটা জ্বলছে।

হঠাৎ খুব মৃদু গলায় হ্যালিডে সায়েব বলল, 'কালই তুমি গির্জেয় চলে এস সখারাম।'

এই ঝিম দুপুর, চারপাশের উদার মাঠ, ঝলসানো আকাশ, দূরের গেরুয়া নদী, থেকে থেকে শামকল পাখিদুটোর ডানা ঝাপটানো, হ্যালিডে সায়েবের মৃদুস্বর, নীলাভ জলজ্বলে চোখ—সব একাকার হয়ে সখারামের ইচ্ছা, ব্যক্তিত্ব, সমস্ত কিছুকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে লাগল। সখারাম হয়তো বলেই ফেলত, কালই সে আসবে।

কিন্তু ভোর থেকে দুপুর পর্যন্ত অঘ্রানের এই দিনটা যে আয়োজন করে এনেছিল, আচমকা তার তাল কেটে গেল। কোথা থেকে একটা দলছুট চিল মাথার ওপর এসে পড়ল। তীক্ষ্ণ, কর্কশ শব্দ করে চেঁচিয়ে উঠল, 'চির্-র্-র্-রো —চির্-র্-র্-রো—'

মুহূর্তে আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল। সখারাম বলল, 'কাল তো আসতে পারব নি সায়েব খুড়ো?'

'কেন?'

'এস, বললে তো আসা যায় না। ভেবে দেখি দুচার দিন—'

'এতে ভাবাভাবির কী আছে?'

'দ্যাখো সায়েবখুড়ো—'

নিজের বুকে একটা আঙুল ঠেকিয়ে সখারাম বলতে লাগল, 'আমার এই পেরানটা যারা বাঁচিয়েছে, তাদের এট্টা মত নিতে হবে তো। এই পেরানটার ওপর তাদের দখল আচে।'

'কাদের কথা বলছ সখারাম? কামিনী-বৌদের?'

'হ্যাঁ।'

আকাশের দিকে একবার তাকাল সখারাম। সঙ্গে সঙ্গে অস্থির হয়ে উঠল,

'অনেক বেলা হল সায়েবখুড়ো। তুমি তো অ্যাখন ফিরবে নি। আমায় কিন্তুক ফিরতে হবে। চললুম।'

'আমার হাসপাতালটা দেখে যাবে না?'

'আজ থাক। আরেক দিন দেখব। হেই ভোরবেলায় বেরিয়েচি। আর দেরি করলে কামিনী-বৌ আস্ত রাখবে নি।'

আর দাঁড়াল না সখারাম। হন্ হন্ করে হাঁটতে শুরু করল।

ডাঙা জমি পেরিয়ে জেলাবোর্ডের সড়কে উঠল সখারাম। একটু দাঁড়াল। পেছন ফিরে একবার তাকাল। দেখল, হ্যালিডে সায়েব নামে রানীর হাটের অদ্ভুত মানুষটা ঝলসানো মাঠের মধ্যে এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে।

॥ ১৭ ॥

কামিনী-বৌ বাড়ি নেই।

সন্ধ্যের মুখে মুখে লক্ষ্মণ বেরা এসে তাকে নিয়ে গিয়েছে। লক্ষ্মণের বৌর পুরো দশ মাস গর্ভ। সেই দুপুর থেকে ব্যথা উঠেছে। এদিকে বৌকে দেখাশোনা করার মত একটা বাড়তি মানুষ নেই তার সংসারে।

প্রথম প্রথম কামিনী-বৌ যেতে চায় নি। নানা ওজর তুলে সে বলেছিল, 'না বাপু, আমার অসুবিদে আছে। তুমি অন্য কারুকে ছাখ।'

'কাকে দেখব! কেউ যে যেতে চাইচে না।'

কামিনী-বৌর হাত ধরে কাঁদ-কাঁদ গলায় লক্ষ্মণ বলেছিল, 'ভালয় ভালয় বিপদটা উদ্ধার করে দে দিদি। কথা দিচ্চি তোকে একখানা লোতুন কাপড় দোব।'

খানিকটা নতুন কাপড়ের লোভে, খানিকটা বিপদের কথা ভেবে শেষ পর্যন্ত লক্ষ্মণের সঙ্গে চলে গিয়েছে কামিনী-বৌ।

কামিনী-বৌ আজ ফিরবে না। আজ কেন, যত দিন লক্ষ্মণের বৌ খালাস না হচ্ছে, ততদিন তার ফেরার উপায় নেই।

সখারামও বাড়ি নেই।

সকালে উঠেই সে হাটে চলে গিয়েছে। এখনও ফেরে নি। হাটের বিকিকিনি সেরে নদীর ওপারে কোথায় যেন যাবে সখারাম। সেখান থেকে ফিরতে ফিরতে কত রাত হবে, কে জানে।

আজকাল চার জন নিয়ে তাদের সংসার। চার জনের দু জন রয়েছে বাইরে। বাকী দু জন, সুখী বুড়ী আর তিতাসী, ঘরেই আছে।

বেশ খানিকটা রাত হয়েছে।

বাইরে গাঢ় ঠাস-বোনা অন্ধকার। সেই অন্ধকারকে বিঁধে অগুন্তি তারা ফুটে আছে।

দাওয়ার ঠিক মাঝখানে একটা টেমি জ্বলছে। চারপাশের অথৈ অন্ধকারের সঙ্গে যুঝে যুঝে টেমিটা পেরে উঠছে না। কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছে।

টেমি থেকে যে নিস্তেজ আলোটুকু পাওয়া যাচ্ছে, তাতে ঠিকমত নজর চলে না।

কিন্তু তিতাসীর চোখে আশ্চর্য ধার। দাওয়ার অস্পষ্ট আলোতে ছোট ছোট সূক্ষ্ম ফোঁড় তুলে একটা ছেঁড়া শাড়ি রিপু করছে সে।

এক কোণে দুই হাঁটু আর মাথাটা একাকার করে বসে রয়েছে সুখী বুড়ী। ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে আছে। সেই ফাঁকের ভেতর দিয়ে একটানা, ঘড়ঘড়ে আওয়াজ বেরিয়ে আসছে।

বসে বসে সুখী বুড়ী ঢুলছিল। ঢুলতে ঢুলতে হঠাৎ হাঁটুর ফাঁক থেকে মাথাটা টেনে তুলল। চোখ মেলবার চেষ্টা করল। কিন্তু ঘুমে চোখ দুটো জুড়ে আছে।

জড়ানো গলায় সুখী বুড়ী ডাকল, 'তিতাসী—'

সুঁচে সুতো পরাচ্ছিল তিতাসী। জবাব দিল না। এখন তার সমস্ত মনোযোগ সুঁচের সরু ছিদ্রটার মধ্যে।

সুখী বুড়ী আবার ডাকল, 'হেই লো—'

সুতোটা পরানো যাচ্ছে না। সুঁচের মুখের কাছে এসে সুতোটা অল্পের জন্য ফসকে ফসকে যাচ্ছে। ভেতরে ঢুকছে না। সুঁচের কাছে সুতো কিছুতেই ধরা দিচ্ছে না।

সুখী বুড়ীর ডাকাডাকিতে তিতাসী বিরক্ত হল। বলল, 'কী কইচিস মা?'

'অনেক রাত হল, না?'

'হ্যাঁ—'

'সখারাম ফিরেছে?'

'না।'

একটু চুপ।

সুখী বুড়ী এবার নিজের খেয়ালেই বিড় বিড় করে, 'এত রাত হল, এখনো সখারাম ফিরল নি!'

তিতাসী কিছু বলল না। সখারাম সম্বন্ধে কথা উঠলে পারতপক্ষে সে মুখ খোলে না। দুই ঠোঁটে কুলুপ এঁটে রাখে।

সুখী বুড়ী সমানে বকছে, 'কখন ফিরবে, ভগমান জানে।'

বকতে বকতে একসময় সুখী বুড়ী থামল। সঙ্গে সঙ্গে ঢুলুনি শুরু হল। হাঁটুর ফাঁকে মাথাটা ঢুকে গেল। মুখ থেকে আগের মতই ঘড়ঘড়ে আওয়াজ বেরিয়ে আসতে লাগল।

এতক্ষণে সুঁচের কাছে সুতোটা ধরা দিয়েছে।

তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে ফোঁড়ের পর ফোঁড় তুলছে তিতাসী।

রাত বাড়ছে। অন্ধকার যেন আরো একটু গাঢ় হয়েছে। উঠোনের জামরুল গাছ থেকে কী একটা পাখি থেকে থেকে তীক্ষ্ণ, কর্কশ গলায় ডেকে উঠছে। ডাক থামিয়ে পাখিটা মাঝে মাঝে ডানা ঝাপটায়।

এতক্ষণ ঝিরঝিরে বাতাস ছিল। হঠাৎ কি হল, বাতাসটা মেতে উঠল।

অঘ্রান মাসের বাতাসের স্বভাবই এই। হঠাৎই তার ক্যাপামি শুরু হয়।

বাতাসের দাপটে টেমির আলোটা নিবতে নিবতে সামলে উঠল।

একটু পরেই কিন্তু বাতাসের মাতামাতি থেমে গেল।

একসময় সেলাই শেষ হল। সুঁচটা একটা সুতোর ডেলার মধ্যে গুঁজে রাখল তিতাসী। তার পর ডাকল, 'মা—'

হ্যাঁ—'

ঢুলতে ঢুলতেই সুখী বুড়ী সাড়া দিল।

'আমার সেলাই হয়ে গেছে।'

'আচ্ছা।'

অস্ফুট একটা শব্দ করে অথৈ ঘুমের মধ্যে তলিয়ে গেল সুখী বুড়ী।

'কী হল—'

সুখী বুড়ীর কাঁধে আস্তে একটা ঠেলা দিল তিতাসী। বলল, 'ও মা, খাবি না? ওঠ—'

এবার ধড়মড় করে উঠে বসল সুখী বুড়ী। বলল, 'কী কইচিস?'

'কী আবার কইব। খেয়েদেয়ে ঘরে গিয়ে ঘুমো। সারারাত এই দাওয়ায়

বসে ঢুলবি নাকি?' বলতে বলতে তিতাসী উঠে পড়ল, 'যা, চোখে-মুখে জল দিয়ে আয়। ঢুলুনি ছুটে যাবে।'

'আচ্ছা।'

দাওয়ার একপাশে একটা জলভর্তি পেতলের ঘটি ছিল। হাতড়ে হাতড়ে সেটা বার করল সুখী বুড়ী। তারপর চোখে মুখে জল ছিটিয়ে ঘরের ভেতর গিয়ে ঢুকল।

এর মধ্যে ভাত বেড়ে ফেলেছে তিতাসী।

সুখী বুড়ী বলল, 'সখারামটা বাইরে রইল। ওকে ফেলেই খেয়ে নোব!'

ভুরু কুঁচকে মায়ের দিকে তাকাল তিতাসী। বলল, 'তবে কী করবি?'

'এট্টু পরেই না হয় খেতে বসব। দেখি যদি ছেলেটা এর ভেতর ফেরে।'

'কখন ফিরবে তার কি কিছু ঠিক আছে! আমাদের খাওয়া আমরা খেয়ে নিই।'

কথায় কথায় সুখী বুড়ীর ঘুমের ঘোরটা কেটে গিয়েছে। সে বলতে লাগল, 'ফিরে এসে সখারাম য্যাখন দেখবে, আমরা তাকে ফেলেই খেয়েচি, কী ভাববে বল দিকি!'

'কী আবার ভাববে! যা খুশি ভাবুক—'

'কথার ছিরি শোন!'

একটু যেন ধমকেই উঠল সুখী বুড়ী। তিতাসী চমকে তাকাল। এতক্ষণ খেয়াল করে নি। হঠাৎ তিতাসীর মনে হল, সুখী বুড়ী আজ অনেক কথা বলছে। সব ব্যাপারেই যে উদাসীন, সব সময় যে চুপ করে থাকে, আজ সেই মানুষটাকে কথায় পেয়েছে।

অবাক হয়ে সুখী বুড়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল তিতাসী।

সুখী বুড়ী বিড় বিড় করতে লাগল, 'ছেলেটা চৌপর দিন খেটেখুটে আসবে, তাকে ফেলে খাই কেমন করে?'

তিতাসী বলল, 'তোর য্যাখন এত দরদ, বসে, বসে থাক। আমি আর বসতে পারব নি। বড্ড খিদে পেয়েছে।'

কী একটু যেন ভাবল সুখী বুড়ী। তার পর বলল, 'য্যাখন বেড়েই ফেলেচিস দে, খাওয়া চুকিয়েই ফেলি।'

খেতে খেতে সুখী বুড়ী শুরু করল, 'ছেলেটা বেশ। কোত্থেকে একদিন

এল। এসেই সোম্সারের দায় মাথায় নিল। সোম্সারের একজন হয়ে গেল। বেশ ছেলে।'

তিতাসী জবাব দিল না। এক মনে ভাত মাখতে লাগল।

সুখী বুড়ী আবার বলল, 'কিন্তুক সখারামকে নিয়ে আমার বড্ড ভাবনা।'

ভাত মাখতে মাখতে তিতাসী বলল, 'কিসের ভাবনা?'

তার স্বরে কিছুটা কৌতুহল, কিছুটা বা কৌতুক রয়েছে।

'ভাবনা লয়!'

সামনের দিকে ঝুঁকে, কুঁজো মতন হয়ে বসেছিল সুখী বুড়ী। নির্দাঁত মাড়ি দিয়ে ভাত চিবুচ্ছিল। হঠাৎ সে খাড়া হয়ে বসল। বলল, 'ওর কথা যা শুনেচি, তাতে কিছু ভরসা নি।'

একটুক্ষণ চুপ।

টেমির আলোটা আরো নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। খুব সম্ভব, তেল নেই। তেলের সঙ্গে সঙ্গে ওটার আয়ুও ফুরিয়ে এসেছে।

খেতে খেতে বাইরের দিকে তাকাল তিতাসী। কিছুই স্পষ্ট বোঝা যায় না। উঠোন, আকাশ, দূরের কুঠির মাঠ—সব কিছু এখন আব্ছা, আচ্ছন্ন।

ছাই টিবিটার মাথায় পেঁপেগাছ দুটো এক পায় দাঁড়িয়ে আছে তো আছেই। এমনিতে চুপচাপ। কিন্তু বাতাসের বেগ যেই বাড়ে, অমনি তাদের কী যে হয়! ঘাড়টা কাত করে পাশের জামরুল গাছটার দিকে ঢলে পড়ে। শুধু কি ঢলে পড়ে, লিকলিকে হাত বাড়িয়ে তার কোমরটাও জড়াতে চায়। কিন্তু কিছুতেই কি জামরুল গাছটা ধরা দেবে!

এখন বাতাস মেতে উঠেছে। পেঁপে গাছদুটোও হাত বাড়িয়েছে।

জামরুলগাছটা কাছে তো আসেই না। বেহায়া পেঁপেগাছের কাণ্ড দেখে পাতায় পাতায় ফিস ফিস করে কী যে বলে!

হঠাৎ সুখী বুড়ী শুরু করল, 'ভাবনা বলে ভাবনা! সখারামের যা স্বভাব, এখেনে দু দিন ওখেনে পাঁচ দিন—এমনি করেই নাকি সারা জীবন কাটাচ্চে!'

একটু থেকে আবার বলে, 'কখন যে মতি-গতি বিগড়ে যাবে, ভগমান জানে! কোনদিন দেখব আমাদের ছেড়ে চলে গেচে।'

তিতাসী বলল, 'এর ভেতর ভাববার কী আছে।'

'ভাববার নেই!'

ঘোলা ঘোলা অদ্ভুত চোখে তিতাসীর দিকে তাকিয়ে রইল সুখী বুড়ী।

'না, নেই। বাইরের একটা লোক, দু-পাঁচ দিন রয়েছে। য্যাখন খুশি হবে, চলে যাবে। সারা জন্ম তো থাকতে আসে নি।'

'থাকলে দোষ কি? কার ক্ষেতি হচ্চে?

সুখী বুড়ী ক্ষেপে উঠল। উত্তেজনায় শুকনো বুকটা তোলপাড় হচ্ছে। ঘন ঘন শ্বাস পড়ছে।

'দোষগুণ, লাভক্ষেতির কথা নয়। তার যদি ইচ্ছে হয়, চলে যাবে। আপনার লোক তো না। যেতে চাইলে ঠেকাবে কেমন করে?'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল সুখী বুড়ী। তার পর বলল, 'মনে মনে একটা কথা ভেবে রেখেচি। যদি সখারাম রাজী হয়—'

বলতে বলতে থেমে গেল সুখী বুড়ী।

'কী কথা ভেবেচিস মা—'

প্রথমে কিছু বলল না সুখী বুড়ী। একদৃষ্টে তিতাসীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তাকিয়ে তাকিয়ে মেয়ের মনোভাবটা বুঝতে চেষ্টা করল। তারপর ফিস ফিস করে বলল, 'আজ থাক। আরেকদিন বলব।'

তিতাসী আর পীড়াপীড়ি করল না। যখন ইচ্ছা হবে, নিজের থেকেই সুখী বুড়ী মনের কথা বলবে।

একসময় খাওয়ার পালা চুকল।

পেছনের ডোবা থেকে এঁটো বাসন-কোসন ধুয়ে আনল তিতাসী। ঘর নিকল। এখন বিছানা পাতছে।

দাঁতের ফাঁকে কাঁচা তামাক পাতা গুঁজতে গুঁজতে সুখী বুড়ী ডাকল, 'তিতাসী—'

'কি?'

'তুইও এখন শুবি নাকি?'

'হ্যাঁ—,

বিছানা পাততে পাততে মায়ের কথার জবাব দিতে লাগল তিতাসী, 'আর বসে থেকে কী করব? অনেক রাত হল?'

সুখী বুড়ী বলল, 'শুতে চাইচিস, শো। দেখিস, ঘুমিয়ে মরে থাকিস নি। এট্টু হুঁশ রাখিস। সারাদিন পর ছেলেটা আসবে। তাকে ভাত বেড়ে দিস।'

বিরক্ত গলায় তিতাসী বলল, 'কারো জন্যে আমি জেগে থাকতে পারব না। বড্ড ঘুম পাচ্চে।'

'বেশ, তুই ঘুমো। পেরান ভরে ঘুমো। আমিই জেগে থাকব।'

সুখী বুড়ী গজ গজ করতে লাগল, 'জেগে থাকার জন্যে আর তোকে খুশামোদ করচি না।'

তিতাসী কিছু বলল না। ফুঁ দিয়ে টেমির আলোটা নিবিয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ল।

॥ ১৮ ॥

কুঠির মাঠের দিক থেকে একরাশ জোনাকি উড়ে এসেছে। পেঁপে গাছের মাথায় তারা নেচে বেড়াচ্ছে।

সেই বিকেল থেকে হিম পড়ছে। গাঢ়, কনকনে, সাদা হিম।

হিম মিশে অঘ্রানের বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে।

অনেকক্ষণ চোখ বুজে শুয়েছিল তিতাসী। কিন্তু না, ঘুম আসছে না। ঘুম বুঝি আজ জেদ ধরেছে, কিছুতেই তার কাছ ঘেঁষবে না।

অগত্যা চোখ মেলল তিতাসী। অন্ধকারে বাইরের দিকে তাকাল। দেখল, পেঁপেগাছের মাথায় জোনাকি নাচছে। নীল আলোগুলি জ্বলছে আর নিবছে।

একদৃষ্টে জোনাকিদের জ্বলা আর নেবা দেখতে লাগল তিতাসী।

মাঝখানে উঠোন। তার পর ছাইটিবি, পেঁপে গাছ, জোনাকি। দৃষ্টির সীমা এই পর্যন্ত। তার পর আর নজর চলে না।

আকাশ থেকে ঘন কুয়াশার একটা পর্দা সরাসরি নেমে এসে ওপাশের কুঠির মাঠ, গির্জেবাড়ি—সব কিছু আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

এতক্ষণ সখারামের জন্য বসেছিল সুখী বুড়ী। বসে বসে ঢুলছিল। ঢুলতে ঢুলতে কখন একসময় শুয়ে পড়েছে। শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম। অথৈ, গভীর ঘুমে তলিয়ে গিয়েছে সে।

সুখী বুড়ীর শ্লেষ্মার ধাত। ঘুমোলেই কফের প্রকোপে নাকদুটো বুজে যায়। তখন হাঁ করে বাতাস টানে সে। মুখ থেকে শ্বাসটানার অদ্ভুত আওয়াজ বেরুতে থাকে।

এবার ঘরের ভেতর তাকাল তিতাসী। অন্ধকারে কিছুই স্পষ্ট নয়। তবু আবছা আবছা তার চোখে পড়ল, কুঁজো হয়ে হাঁটু দুটো বুকের ভেতর গুঁজে শুয়ে আছে সুখী বুড়ী।

ঢুলতে ঢুলতে সুখী বুড়ী শুয়ে পড়েছিল। কাঁথাটা টেনে গায়ে দিতে ভুলে গিয়েছে। অঘ্রানের হিমাক্ত বাতাসে শরীরটা কুঁকড়ে ধনুকের মত বেঁকে গেছে।

বড় মায়া হল তিতাসীর। উঠে সুখী বুড়ীকে ঠিক করে শুইয়ে দিল। একটা ভারী কাঁথা গায়ে জড়িয়ে দিল।

ঘুমের ঘোরে বিড় বিড় করে কী যেন বলল সুখী বুড়ী। বোঝা গেল না। ঠোঁট দুটো অল্প অল্প নড়তে লাগল।

আবার শুয়ে পড়েছে তিতাসী।

অঘ্রানের নিঝুম রাত, গাঢ় অন্ধকার, হিম-হিম বাতাসের সুখস্পর্শ, কাঁথার উষ্ণ আরাম, নিটোল একটি ঘুমের জন্য সব ফাঁদই পাতা আছে। তবু ঘুম আসছে না।

কিছুক্ষণ চোখ বুজে রইল তিতাসী। তার পর গা থেকে কাঁথাটা সরিয়ে বাইরের দাওয়ায় এসে বসল।

পেঁপে গাছদুটো ঘিরে জোনাকিরা নাচছে।

কী খেয়াল হল তিতাসীর, জোনাকি গুনতে শুরু করল। কিন্তু জ্বলে উঠেই যারা নেবে, দেখা দিয়েই যারা মিলিয়ে যায়, তাদের হিসাব রাখা কি সোজা কথা! কোন হিসেবেই কি তারা ধরা দেবে!

"এক, দুই, তিন……"

তার পর আর এগোয় না। কাকে গুনবে তিতাসী? যাকে গুনবে ঠিক করেছিল, সে তো এইমাত্র নিবে গিয়েছে।

বার বার হিসেব গরমিল হয়ে যায়। খেই হারায়। খেই যতই হারায়, জেদ ততই বাড়ে। নতুন উৎসাহে তিতাসী শুরু করে, 'এক, দুই, তিন……'

কতক্ষণ যে জোনাকি গোনার খেলা চলত, কে বলবে।

কুঠির মাঠের দিক থেকে হঠাৎ একটা গানের সুর ভেসে এল।

জোনাকি গোনা আর হল না। উন্মুখ হয়ে বসে রইল তিতাসী।

অঘ্রানের ভারী বাতাসে কাঁপতে কাঁপতে সুরটা এগিয়ে আসছে।

এতদূর থেকে সুরটাই শুধু শুনতে পাচ্ছে তিতাসী। গানের একটা কথাও বুঝছে না। কথা না বুঝুক, তবু এই হিমঝরা নিষুতি রাতে সুরটা তার আশ্চর্য ভাল লেগে গেল।

কতক্ষণ যে আচ্ছন্নের মত বসেছিল, হুঁশ নেই। সুরটা কাছাকাছি আসতেই তিতাসী চমকে উঠল। গলাটা খুব চেনা চেনা। হঠাৎ তার কি হল, তাড়াতাড়ি

ঘরে ঢুকে সুখী বুড়ীর পাশে শুয়ে পড়ল।

তিতাসী ঠিকই চিনেছিল।

গাইতে গাইতে চট-টিন-পিচবোর্ডের খুপরিটায় ঢুকল সখারাম।

'আমরা পাখির জাত,
হাঁটা-চলার ভাও বুঝি না—
উড়্যা চলার ধাত।
হেই গো গুরু—'

সখারামের গলাটা মৃদু, মিঠে, আবেগে অস্থির। বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সে গাইতে লাগল, 'আমরা পাখির জাত—'

একসময় গান থামল।

এ খুপরি থেকে তিতাসী টের পেল, সখারাম টেমি ধরিয়েছে। টেমি নিয়ে গুন গুন করতে করতে সে ডোবার দিকে চলে গেল।

পাশেই সুখী বুড়ী শুয়ে রয়েছে। আস্তে তাকে একটা ঠেলা দিল তিতাসী, ডাকল, 'মা—'

সুখী বুড়ী সাড়া দিল না।

এবার জোরে জোরে ধাক্কা দিতে লাগল তিতাসী। 'মা—মা—'

ঘোলা ঘোলা চোখে একবার তাকাল সুখী বুড়ী। তারপর ওপাশ ফিরে শুল। মুহূর্তে শ্লেষ্মার ঘর্ঘর আর শ্বাসটানার আওয়াজ একাকার হয়ে গেল। ঠেলাঠেলি করে তিতাসী যে ঘুমের তাল কেটে দিয়েছিল, সেই ঘুমটাই আবার তার দু চোখ জুড়ে গেল।

আর ডাকাডাকি করল না তিতাসী।

একটু পরে হাত-মুখ ধুয়ে ডোবা থেকে ফিরে এল সখারাম। দাওয়ার ওপর টেমিটা রেখে ডাকল, 'সবাই ঘুমিয়ে পড়েচ নাকি, হেই গো—'

শুনেও চুপ করে রইল তিতাসী।

সখারাম আবার ডাকল, 'শুনচ, ও মেয়েছেলেরা—'

এবারও তিতাসী জবাব দিল না।

'নাঃ, আজ দেখেছি, বরাতে খাওয়া নেই। যাক গে, শুয়েই পড়ি।'

নিজের পেটে একটা টোকা মেরে সখারাম বলতে লাগল, 'একটা তো রাত! চুপচাপ থাকিস বাপু, ঝামেলা বাধাস নি। রাতটা একবার পুয়োতে দে, দেখব তোর কত খিদে?'

দাওয়া থেকে টেমি নিয়ে পাশের খুপরিতে চলে গেল সখারাম।

কী করবে, তিতাসী ভেবে পেল না।

কামিনী-বৌ আর সুখী বুড়ীর ওপর ভীষণ রাগ হতে লাগল তার। কামিনী-বৌ যদি লক্ষ্মণের সঙ্গে না যেত কিংবা সুখী বুড়ী যদি জেগে থাকত, তাকে এই বিপদে পড়তে হত না।

সখারামের সঙ্গে আজ পর্যন্ত একটা কথাও বলে নি তিতাসী।

অঘ্রানের এই স্তব্ধ, নিষুতিরাতে কী বলে সখারামকে ডাকবে, কেমন করে খেতে দেবে, যতই ভাবল, তিতাসী দিশেহারা হয়ে পড়ল।

পাশের খুপরিতে এখন আর আলো নেই। টেমি নিবিয়ে শুয়ে পড়েছে সখারাম। শুয়ে শুয়ে গুন্ গুন্ করছে।

তিতাসী একবার ভাবল, সখারামকে ডাকবে না। না-ডাকার একটা কৈফিয়তও মনে মনে ঠিক করে ফেলল। একটা তো মোটে রাত। এক রাত না খেলে মানুষ মরে না।

কৈফিয়তটা কিন্তু নিজের কাছেই ভারি খারাপ লাগল। সে জেগে থাকতে সখারাম উপোস করে থাকবে! কথাটা ভাবতেই নিজের ওপর বিরূপ হয়ে উঠল তিতাসী।

শেষ পর্যন্ত উঠতেই হল।

সখারামকে যাতে ডাকতে না হয়, সে জন্যে একটার পর একটা জবাবদিহি খাড়া করেছে তিতাসী। কিন্তু কোনটাই টেকে নি।

অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে দেশলাই বার করল তিতাসী। ফস্ করে একটা কাঠি জ্বালল। শিয়রের কাছেই টেমিটা রয়েছে। সেটা সামনে টেনে আনল।

দেশলাই কাঠির আলোটা টেমির মাথায় গিয়ে বসল।

টেমিটা জ্বলছে।

দুই হাঁটুর ফাঁকে থুতনি রেখে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল তিতাসী। তার পর একটা সিলভারের থালায় ভাত বেড়ে ফেলল।

একটু পর বাইরে, একেবারে সখারামের খুপরিটার সামনে এসে দাঁড়াল তিতাসী। বলল, 'ভাত বেড়েছি।'

গলার স্বরটা অস্ফুট, কাঁপা-কাঁপা।

সখারাম বোধ হয় শুনতে পায় নি। শুয়ে শুয়ে নিজের খেয়ালেই গুন্ গুন্ করছে।

এবার বেড়ায় একটা টিনে টোকা দিল তিতাসী।

ধড়মড় করে উঠে বসল সখারাম, 'কে ?'

'আমি—ভাত বেড়েচি—'

অস্থির গলায় কথা ক'টা বলে ঘরে এসে ঢুকল তিতাসী।

খানিকটা পর সখারাম এল। সামনে ভাতের থালাটা এগিয়ে দিয়ে দূরে সরে বসল তিতাসী।

খেতে খেতে সখারাম বলল, 'ফিরতে বড্ড দেরি হয়ে গেল। আমার কিন্তু দোষ নেই।'

তিতাসী চুপ।

দেরিতে ফেরার কৈফিয়ত দিতে লাগল সখারাম, 'হাট সেরে নদীর ওপারে গিছলম একটা কাজে। সেখানে পুরনো এক বন্ধুর সন্‌গে দেখা। কিছুতেই কি সে ছাড়তে চায় !'

একটু থেমে আবার বলে, 'তিন বচ্ছর পর দেখা। এ-কথা সে-কথা অনেক কথা হল। বন্ধু তার ঘর-সোম্‌সারের কথা বললে, কোথায় চাযের জমি কিনেছে, সে-কথা বললে। কথায় কথায় রাত হয়ে গেল।'

এবারও জবাব দিল না তিতাসী।

সখারাম সমানে বকে যাচ্ছে, 'বন্ধুর আক্কেলটা দ্যাখ, তিন বচ্ছরের কথা একদিনে শুনোবে !'

কিছু একটা বলতে চাইল তিতাসী, গলায় স্বর ফুটল না।

সখারাম বলল, 'এত রাতে ফিরে তোমায় কষ্ট দিলম—'

মুখ বুজে বসে রইল তিতাসী।

রাত বেড়েছে।

ওপাশে কাত হয়ে শুয়ে রয়েছে সুখী বুড়ী। রাতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তার শ্বাসটানার আওয়াজ বেড়ে চলেছে।

উঠোনে পেঁপে গাছের মাথা ঘিরে জোনাকিরা নাচানাচি করছে। রাত্রিটা যেন একখানা কালো জামদানি শাড়ি। জোনাকিগুলো সেই শাড়িটার গায়ে আলোর বুটি।

ঘরে সুখী বুড়ীর শ্বাসের ঘর্ঘর ছাড়া এখন কোন শব্দ নেই। বাইরে স্তব্ধ, নিস্তরঙ্গ অন্ধকার সমস্ত কিছুর ওপর ব্যাপ্ত হয়ে আছে।

সখারামই আবার শুরু করল, 'আজ হাটে সুবিদে হল না। শহর ঠেঙে

পাইকের আসর কথা ছিল। আসে নি। ছুটো মাত্তর কুলো বেচেছি। পাঁচ সিকে পেয়েছি। তাই দিয়ে চাল কিনে এনেচি।'

গলাটা কেমন যেন হতাশ শোনাল সখারামের।

এতক্ষণে তিতাসী মুখ খুলল, 'ওসব হিসেব-টিসেব আমি বুঝি না। ভাই-বৌ এলে—'

কথাটা শেষ করল না তিতাসী।

পাতের ওপর ঝুঁকে ভাত মাখছিল সখারাম। চমকে মুখ তুলল। দেখল, বাইরের অন্ধকারে দৃষ্টিটাকে হারিয়ে চুপচাপ বসে আছে তিতাসী।

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল সখারাম।

এতক্ষণ খেতে খেতে কথা বলছিল সখারাম। এত খিদে পেয়েছিল যে, খাওয়া ছাড়া অন্য দিকে নজর ছিল না। খেয়ালও করে নি, আজ তাকে কে খেতে দিয়েছে।

অবশ্য খেয়াল না করারই কথা। এটা একটা অভ্যাসের ব্যাপার।

তিতাসীদের সংসারে আসার পর সকাল-সন্ধ্যে, ছু-বেলা কামিনী-বৌ তাকে খেতে দেয়। ভাত বেড়ে দিয়ে সামনে বসে থাকে। এ-কথা সে-কথা বলে। হাটে বিকিকিনি কেমন হল, লাভ-লোকসান কত হল, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব খবর নেয়। কামিনী-বৌর মুখের দিকে না তাকিয়ে খেতে খেতে তার কথার জবাব দিয়ে যায় সখারাম।

এটাই নিয়মে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

অভ্যাসবশে মুখের দিকে না তাকিয়ে আজও কথা বলছিল সখারাম। সে ভেবেছিল, অন্য দিনের মতই কামিনী-বৌ সামন বসে রয়েছে।

সখারাম কি জানত, এতদিনের পুরনো নিয়মটার আজ ব্যতিক্রম ঘটবে!

একটু দূরে বসে রয়েছে তিতাসী। মুখের ওপর টেমির আলো পড়েছে। আলোটা এত মৃদু, যাতে মুখটা ঠিকমত বোঝা যাচ্ছে না।

টেমির নিস্তেজ আলো তিতাসীকে যতটা স্পষ্ট করেছে, তার চেয়ে অনেক বেশি ছুর্জ্ঞেয় করে রেখেছে।

সখারাম কি স্বপ্ন দেখছে!

বাইরে অথৈ অন্ধকার। ঘরের ভেতর টেমির লালচে, নরম আলো।

একদৃষ্টে তিতাসীকে দেখছে সখারাম। ঠোঁট-চুল, গাল-গলা, ঘন পালকে-ঘেরা চোখ, ভুরু, মসৃণ ঘাড়, হাত, হাতের আঙুল—সব মিলিয়ে তিতাসী আশ্চর্য,

অপরূপ এক স্বপ্ন।

চোখে পলক পড়ছে না সখারামের। তার মনে হচ্ছে, পলক পড়লেই তিতাসী নামে সেই স্বপ্নটা মিলিয়ে যাবে। ঘরের মৃদু আলোয় তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্যে অনেকটা সময় কেটে গেল।

হঠাৎ সখারাম বলল, 'তুমি—'

বাইরের দিকে তাকিয়ে বসেছিল তিতাসী। খুব সম্ভব সখারামের কথা শুনতে পায় নি। যেমন বসেছিল, তেমনিই বসে রইল সে।

কেশে গলাটা সাফ করে নিল সখারাম। আবার শুরু করল, 'কইছিলম, আজ তুমি খেতে দিলে। তোমার ভাই-বৌ কোথায় ?'

'লক্ষ্মণ বেরায় বাড়ি গেছে।'

একটু থেমে তিতাসী বলল, 'আজ ভাই-বৌ ফিরবে না।'

'অ!'

একটু চুপ।

বাইরে পেঁপেগাছের মাথা ঘিরে জোনাকিদের নাচানাচির বিরাম নেই। আচমকা জামরুলগাছের ডালপালার ভেতর থেকে অনেকগুলো সুরুলে পাখি ডেকে উঠল।

জোনাকিরা নাচুক, সুরুলে পাখিরা ডাকুক—কোনদিকে এতটুকু লক্ষ্য নেই। এখন মুখ নামিয়ে পায়ের নখ খুঁটছে আর চোরা চোখে সখারামকে দেখছে।

সখারামকে তো আজ নতুন দেখছে না তিতাসী। কার্তিক মাসে নদীর পার থেকে তুলে আনার পর কতবার দেখেছে!

তিতাসীর মনে হল, কতবার দেখা আর আজকের দেখার মধ্যে অনেক তফাত।

সোজাসুজি তাকাতে পারছে না তিতাসী। চোখ নামিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছে তো দেখছেই। তিতাসী কি জানত, হেমন্তের এই হিমঝরা রাত্রে লুকিয়ে লুকিয়ে একটা পুরুষ মানুষকে দেখার মধ্যে যত সুখ তত লজ্জা!

সখারাম—সুন্দর, সুকণ্ঠ, সুপুরুষ। তার দিক থেকে কিছুতেই চোখ ফেরাতে পারছে না তিতাসী।

থালার ভাত শেষ হয়ে গিয়েছিল। সখারাম বলল, 'আর চাট্টি ভাত দেবে। বড্ড খিদে—'

কথাটা শেষ না করে অল্প একটু হাসল।

হাঁড়ি থেকে ভাত বার করে সখারামের পাতে দিল তিতাসী।

আবার চুপচাপ। সখারামের ভাত চিবোনোর শব্দ ছাড়া অঘ্রানের এই রাতটা আশ্চর্য নিস্তব্ধ।

মনে মনে একটা কথা ভাবছে তিতাসী। নিজের ভাই অর্থাৎ শ্যামকে বাদ দিলে অন্য কোন পুরুষকে কোনদিন খেতে দেয় নি সে। কিন্তু একটা অনাত্মীয় জোয়ান মানুষকে সামনে বসিয়ে খাওয়ানোর মধ্যে যে এত অসহ্য আনন্দ, এর আগে সে কি ভাবতে পেরেছিল ?

এতদিন সখারাম সম্বন্ধে তার মনে কী ছিল ? বিরাগ, বিতৃষ্ণা, বিদ্বেষ। যাকে ঘরে এনে শুধু লোকের নিন্দেই শুনতে হয়েছে, তার জন্য আর কী-ই বা থাকতে পারে ! কিন্তু আজ, এই মুহূর্তে ? নিজের মনোভাবটা বুঝতে চেষ্টা করল তিতাসী। পারল না। মনটা যেন দুর্বোধ্য এক রহস্য হয়ে গিয়েছে।

নদীর পার থেকে মানুষ না, একটা দুর্নামকে তারা তুলে এনেছিল। টেমির আলোয় সখারাম নামে সেই দুর্নামটাকে দেখতে দেখতে প্রাণের ভেতরটা যেন কেমন করে উঠল। বুকের গভীরে কোথাও কি একটা তার আছে ! অস্থির আবেগে সেই তারটা কি বাজছে ! তিতাসী বুঝতে পারছে না। শুধু মনে হচ্ছে, হাত-পা সর্বাঙ্গ, কেন কে জানে, থরথর করছে।

খাওয়া শেষ করে একসময় পাশের খুপরিতে চলে গেল সখারাম।

এঁটো বাসন-কোসন একপাশে ডাঁই করে রাখল তিতাসী। তারপর টেমি নিবিয়ে শুয়ে পড়ল।

এখন কত রাত কে বলবে।

অন্ধকার আরো গাঢ়, বাতাস আরো হিমাক্ত হয়েছে।

পাশাপাশি দুটো ঘর। মাঝখানে পিচবোর্ডের বেড়া। এ ঘরে তিতাসী, ও ঘরে সখারাম। দুজনের কারো চোখেই ঘুম আসছে না। ঘুম বুঝি আর আসবে না।

এ ঘর থেকে সখারাম টের পেল, শুয়ে শুয়ে তিতাসী এপাশ ওপাশ করছে। ও ঘর থেকে তিতাসী বুঝতে পারল, সখারাম একটা বিড়ি ধরিয়েছে।

অনেকক্ষণ ছটফট করল তিতাসী। সখারামকে খেতে দেবার সময় হাত-পা-বুক সমস্ত শরীর কাঁপছিল। বিছানায় শুয়েও সেই কাঁপুনিটা থামে নি। বরঞ্চ বেড়েই চলেছে। কাঁপুনির বেগ ঠেকাবার জন্য বুকের ভেতর একটা

বালিশ গুঁজে দু হাতে জাপটে ধরল তিতাসী। তার পর বাইরে, যেখানে অফুরন্ত অন্ধকারে জোনাকিরা সাঁতার কাটছে, একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে রইল।

তিতাসীর চোখদুটো জোনাকির আলোর মতই জ্বলতে লাগল।

এ ঘরে চিত হয়ে শুয়ে বিড়ি ফুঁকতে ফুকতে একটা কথাই ভাবছিল সখারাম। রানীর হাটের সব মানুষের সঙ্গেই তার আলাপ হয়েছে। শুধু একজন বাকী ছিল। আজ সেই একজনের সঙ্গে অভাবিত ভাবে আলাপ হয়ে গেল।

প্রাণের ভেতর কোথাও কি একটা নদী লুকিয়ে আছে? সেই নদীতে কি বান ডাকল? হঠাৎ খুশিতে গুন্ গুন্ করে উঠল সখারাম।

তুমি গুরু, বিষম ধাঁধা,
কোথায় তুমি আছ বাঁধা,
জানলে পরে এঘর ওঘর ঘুরতম না।
হেই গো গুরু—

॥ ১৯ ॥

হেমন্তের শেষে নদীটার দিকে তাকানো যায় না।

এখন গেরুয়া জলে বেগ নেই, স্রোত নেই। এখানে ওখানে ফালি ফালি বালির ডাঙা জাগতে শুরু করেছে।

নদী এখন নির্জীব, নিঃস্রোত।

পার থেকে জল অনেক নীচে নেমে গিয়েছে। দেখা দিয়েছে থকথকে গৈরিক কাদা। সেখানে উদ্দাম হয়ে আছে শর আর বিন্নার বন। সেই বন দু পার থেকে হেমন্তের নদীটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

অথচ বর্ষায় এ নদীর তুলনা থাকে না। তখন সমুদ্র থেকে দুর্জয় বেগে জল ছুটে আসে। শর আর বিন্নার বন কোথায় তলিয়ে যায়। দুই তীর ছাপাছাপি করে নদী মেতে ওঠে। নদী তখন বিরাট, বিপুল, দ্রুতবহ।

বর্ষায় যে ছিল বিশাল, উদার; সেই নদী হেমন্তে কত দীন কত নিঃস্ব হয়ে গিয়েছে।

এদেশের মানুষ বর্ষায় নদীতে ভাবে।

বর্ষায় নদী যদি যুবতী, হেমন্তের নদীর উপমা কী?

আকাশের দিকে একবার তাকাল লোটন। বুঝতে চেষ্টা করল, বেলা ফুরোতে কত বাকি।

অনেক খুঁজল কিন্তু সূর্যটাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। সারাদিনে আকাশ পাড়ি দিয়ে সে কোথায় চলে গিয়েছে।

লোটন খেয়াপারানির মাঝি। সূর্যের সঙ্গে তার জীবনের আশ্চর্য মিল।

রোদ উঠলেই খেয়াঘাটে চলে আসে লোটন। সমস্ত দিন সওয়ারী নিয়ে এপার ওপার করে। তার পর সূর্য যখন ডুবে যায়, তখন তার ছুটি।

ছয়ঋতু বারোমাস এর হেরফের নেই।

সারাদিনে সূর্যটা একবার মাত্র আকাশ পাড়ি দেয়। লোটন কত বার যে নদী পারাপার করে, হিসেব নেই। সূর্যের সঙ্গে তার এটুকুই যা গরমিল।

এখন যতদূর তাকানো যায়, আকাশটা ধূসর, উদাস। আতি পাঁতি করে খুঁজলে পশ্চিম দিকে বিষণ্ণ একটু আলো পাওয়া যাবে। সেই আলোতে হেমন্তের নিঃস্ব নদীটাকে বড় করুণ দেখাচ্ছে।

এক ঝাঁক শামকল পাখি উড়তে উড়তে উত্তর থেকে দক্ষিণে চলেছে। নদীর গেরুয়া জলে পাখিদের ছায়া পড়েছে।

কোনদিকে লক্ষ্য নেই। শেষবারের মত সওয়ারী পার করে নৌকোটাকে খেয়াঘাটের কাছে নিয়ে এল লোটন। একটা গেমো গাছের সঙ্গে সেটাকে বেঁধে ওপরে উঠল।

আজকের মত কাজ শেষ হল।

লোটন যেখানে নৌকো বেঁধেছে, সেখান থেকে খানিকটা দূরে একটা প্রকাণ্ড পাকুড় গাছ। তার নীচে একখানা ছোট দোচালা ঘর।

ঘরখানার মাথায় খড়ের চাল, চারপাশে মাটির দেওয়াল।

কতকাল যে চালের খড় বদলানো হয় নি! ফলে চালটা পচে গিয়েছে। দেওয়ালের মাটি ধ্বসে পড়েছে।

কোনদিকে তাকাল না লোটন। লম্বা লম্বা পা ফেলে সেই ঘরখানার সামনে এসে দাঁড়াল।

এই ঘরখানায় খেয়াঘাটের জমাবাবু থাকে।

বিচিত্র মানুষ এই জমাবাবু!

বিশ কি পঁচিশ বছর আগে হঠাৎ একদিন সে এই রানীর হাটে এসেছিল।

নদীর খানিকটা অংশ ইজারা নিয়ে খেয়া বসিয়েছিল। সেই থেকে এখানেই থেকে গিয়েছে।

এই বিশ-পঁচিশ বছরের মধ্যে একদিনের জন্যও কেউ তাকে রানীর হাট ছেড়ে যেতে দেখে নি।

এই বিপুল পৃথিবীতে তার কোন আপন জন আছে কি না, কেউ জানে না। তার খোঁজে কেউ কোনদিন রানীর হাটে আসে নি। এই বিশ-পঁচিশ বছরে তার নামে পৃথিবীর কোন ঠিকানা থেকে একটা চিঠিও আসে নি।

তার আসত নাম কেউ জানে না। অবশ্য সে নাম নিয়ে কারো মাথাব্যথাও নেই।

সারাদিন বসে বসে খেয়া-পারানির কড়ি জমা নেয়। খুব সম্ভব, সেই জন্যই তার নাম জমাবাবু। মুখে মুখে 'জমাবাবু' নামটা চালু হয়ে গিয়েছে। জমাবাবু—এই নামেই এখন তার পরিচয়।

এখানে আসার পর প্রথম প্রথম রানীর হাটের বাসিন্দারা তার সঙ্গে আলাপ জমাতে এসেছিল। কী নাম, কী ধাম, কেন এখানে এল, কদ্দিন থাকবে—দশ বার শুধোলেও যেখানে একটা জবাব মেলে না, সেখানে আলাপ করতে যাওয়া বিড়ম্বনা। কাজেকাজেই উৎসাহ বেশী দিন থাকে নি। একে একে সবাই সরে পড়েছে।

রানীর হাটের কারো সঙ্গে জমাবাবুর বন্ধুত্বও নেই, শত্রুতাও নেই। দু-এক জন ছাড়া মুখের আলাপটুকু পর্যন্ত নেই।

সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত খড়ের চালাটার ভেতর মেরুদণ্ড খাড়া করে বসে থাকে জমাবাবু। যতক্ষণ সওয়ারী থাকে ততটুকু সময়ই ব্যস্ততা। হিসেব করে পারানির পয়সা নিতে হয়। লক্ষ্য রাখতে হয়, কেউ খেয়ার কড়ি ফাঁকি দিচ্ছে কি না।

যখন সওয়ারী থাকে না, গেরুয়া নদীটার দিকে উদাস চোখে তাকিয়ে থাকে জমাবাবু। কখনও বা ঝিমোয়। মন ভাল থাকলে সুর করে মহাভারত পড়ে।

সুখ-দুঃখ, শোক-আনন্দ—নিজের চারপাশে একটা গম্ভীর মলাট এঁটে জীবনের সমস্ত রহস্যকে আড়াল করে রেখেছে সে।

রানীর হাটের জীবনের সঙ্গে আদৌ তার কোন যোগ নেই। মানুষের সংস্রব থেকে নিজেকে অনেক, অনেক দূরে রেখেছে জমাবাবু।

সামনে একটা হ্যারিকেন জ্বলছে। দুলে দুলে কাশীরাম দাসের মহাভারত পড়ছে জমাবাবু।

'নারায়ণী সেনা লয়ে গেল দুর্যোধন।
নানা বাদ্য কোলাহলে হয়ে হৃষ্টমন॥
পথে শল্য রাজা-সহ হৈল দরশন।
তাঁহার সহিত গিয়া করিল মিলন॥
শল্যেরে সন্তোষ করি কহে দুর্যোধন।
যুদ্ধ হেতু তোমা আমি করিনু বরণ॥
শল্য বলে, যেই আজ্ঞা তব মহাশয়।
তোমার সপক্ষ আমি করিনু নিশ্চয়॥'

তন্ময় হয়ে পড়ছে জমাবাবু। কোনদিকে খেয়াল নেই। তার গলাটা ভারি মিঠে, ভারি সুরেলা।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে লোটন। একদৃষ্টে জমাবাবুকে দেখছে।

মাথার চুল বকের পাখার মত ধবধবে। শরীরটা কালো পাথরে খোদাই। মুখের চামড়া আশ্চর্য মসৃণ। সেখানে বয়সের একটা আঁচড়ও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

মাথার দিকে তাকালে তার বয়স মনে হবে সত্তর। মুখ দেখলে তিরিশ। জমাবাবুর বয়সের হদিস করা বিড়ম্বনা।

এখন হিম পড়তে শুরু করেছে। গেরুয়া নদীটা আবছা হয়ে গিয়েছে। ওপার দেখা যাচ্ছে না। নদীর পার থেকে ভিজে মাটির গন্ধ, জলের গন্ধ উঠে আসছে।

উত্তর থেকে হঠাৎ হু-হু বাতাস ছুটে এল। পাকুড় গাছের মস্ত শরীরটা দুলে উঠল। ডালপালা নাস্তানাবুদ হতে লাগল।

মুখ তুলল জমাবাবু। বলল, 'ইস, সন্ঝে হয়ে গেল।'

সন্ধ্যে যে হয়ে গিয়েছে, এতক্ষণ হুঁশ ছিল না।

হঠাৎ তার চোখে পড়ল, বাইরে লোটন দাঁড়িয়ে রয়েছে।

জমাবাবু বলল, 'তুই!'

'হ্যাঁ—আমি লোটন—'

লোটন হাত কচলাতে লাগল।

'লোটন তো বুঝলম। তা ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছিস কেন? ভেতরে আয়।' ঘরে ঢুকে একপাশে জড়সড় হয়ে বসল লোটন।

হ্যারিকেনটা নিবু নিবু হয়ে গিয়েছিল। চাবি ঘুরিয়ে সলতেটা উস্‌কে দিল জমাবাবু। আলোর তেজ বাড়ল।

অন্যমনস্ক ভাবে জমাবাবু শুধোল, 'কাজ চুকল?'

'হ্যাঁ—'

'নৌকো ভাল করে বেঁধে এসেচিস তো?'

'হ্যাঁ—'

সংক্ষেপে জবাব দিল লোটন।

এর পর খানিকটা চুপচাপ।

সামনে মহাভারতটা খোলা পড়ে রয়েছে। দমকা বাতাসে পাতাগুলো ফর্ ফর্ করে উড়ছে। আস্তে আস্তে বইটা বন্ধ করে ফেলল জমাবাবু।

দূর থেকে গেরুয়া জলের আঁশটে গন্ধ উঠে আসছে।

নদীটা আর দেখা যাচ্ছে না। আকাশ অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। অথৈ অন্ধকারে সব কিছু এখন অবলুপ্ত।

একপাশে একটা ছোট টিনের বাক্স। বাক্সের ডালাটা সামান্য খুলে একমুঠো রেজগি বার করল জমাবাবু। রেজগিগুলো কোলের ওপর ছড়িয়ে দিল।

হ্যারিকেনের আলোয় ধাতব মুদ্রাগুলো ঝলসে উঠল।

সন্তর্পণে দুটো আধুলি আর একটা সিকি তুলে নিল জমাবাবু। লোটনের হাতে দিয়ে বলল, 'গুনে ত্যাখ্—'

না গুনেই লোটন বলল, 'ঠিক আছে।'

জমাবাবু আর কিছু বলল না। কোলের রেজগিগুলো টিনের বাক্সে রাখতে লাগল।

দুটো আধুলি আর একটা সিকি। অর্থাৎ পাঁচ সিকি, লোটনের সারাদিন খেয়া বাওয়ার মজুরি।

এটাই নিয়মে দাঁড়িয়ে গিয়েছে।

সমস্ত দিন খেয়া পারাপার করে লোটন। দিনের শেষে সূর্য ডুবে গেলে জমাবাবুর কাছে এসে দাঁড়ায়। রোজমজুরি পাঁচ সিকি পয়সা নিয়ে কোমরের গেঁজেতে পুরে রাখে।

আজ আর মজুরির পয়সা গেঁজেতে রাখল না লোটন। কোমর থেকে গেঁজেটাই খুলে ফেলল।

বাক্স বল, সিন্দুক বল, এই গেঁজেই লোটনের সব। জীবনের সমস্ত সঞ্চয়

সে এর মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে।

গেঁজেটা নোট আর কাঁচা টাকায় ঠাসা। মুখ খুলে তার ভেতর থেকে সব বার করে ফেলল লোটন। তার পর গুনতে লাগল।

জমাবাবু আবার মহাভারত খুলে বসেছে। পড়ছে না। শুধু অলস আঙুলে পাতাগুলো উল্টে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে তার দৃষ্টিটা লোটনের ওপর এসে পড়ছে।

এক বার, দু বার, তিন বার—বার বার গুনল লোটন। তার পর হিসেব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে টাকাগুলো গেঁজের ভেতর পুরতে লাগল।

হঠাৎ জমাবাবু শুধলো, 'কত জমল ?'

চমকে মুখ তুলল লোটন। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

অল্প একটু হাসল জমাবাবু। বলল, 'অমন করে চেয়ে আছিস যে! কথার জবাব দিচ্ছিস না কেন ? কত জমালি ?'

জমাবাবু বলছে কী!

নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছে না লোটন।

যে মনুষটা সব ব্যাপারেই নিস্পৃহ, নির্বিকার, কঠিন একটা আবরণের ভেতর সব সময় যে নিজেকে লুকিয়ে রাখে, আজ লোটনের সঞ্চয় সম্বন্ধে সে উৎসুক হয়ে উঠেছে।

দু বছর খেয়ামাঝির কাজ করছে লোটন। এর মধ্যে খেয়া প্রসঙ্গ ছাড়া একটা বাড়তি, অনাবশ্যক কথা সে বলে নি।

অস্ফুট গলায় লোটন বলল, 'দু শ টাকা জমেচে।'

'আর কত বাকী ?'

'কিসের কথা বলচ জমাবাবু ?'

পায়ের ওপর পা তুলে জমাবাবু নাচাতে লাগল। দুই ঠোঁটের ফাঁকে সূক্ষ্ম, বিচিত্র একটু হাসি আটকে আছে। রহস্যময় গলায় সে বলল, 'তুই ই বল না—কিসের কথা শুদোচ্চি ?'

লোটন জবাব দিল না। কী জবাব দেবে, ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না।

পা নাচাতে নাচাতে জমাবাবু বলতে লাগল, 'মনে করেচিস, খেয়াঘাটে পড়ে থাকি বলে কুনো খপরই রাখি না—কি রে ?'

একটু থেমে আবার, 'সব খপরই কানে আসে, কী করব, কানের দোষ। তা বল না, আর কত বাকী আচে ?'

ফস্ করে লোটন বলে ফেলল, 'তিন শ—'

'আর তিন শ জমাতে পারলেই তো মাঝিগিরি ছেড়ে দিবি। তাই না?'

বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছে লোটন। ভেবে পাচ্ছে না, কেমন করে জমাবাবু তার মনের কথাটা টের পেল!

এতদিন যে মানুষটাকে নিস্পৃহ, নিরুৎসুক মনে হয়েছে, আজ এই মুহূর্তে তার সম্বন্ধে ধারণাটা বদলে যেতে শুরু করেছে লোটনের।

ফিস ফিস করে লোটন বলল, 'হ্যাঁ, পাঁচ শ টাকা জমাতে পারলেই মাঝি-গিরি ছেড়ে দোব।'

এতক্ষণ পা নাচাচ্ছিল। এবার মাথা দোলাতে লাগল জমাবাবু। দোলানির তালে তালে বলতে লাগল, 'বেশ বেশ, ভাল কথা। কিন্তুক—

'কিন্তুক কী?'

বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল লোটনের।

কী একটু ভাবল জমাবাবু। আস্তে আস্তে বলল, 'আজ থাক, আর একদিন শুনিস। আগে নিজের সন্‌গে বোঝাপড়া করি। তার পর তোকে কইব।'

'আচ্ছা।'

গেঁজেটা কোমরে বেঁধে লোটন উঠে পড়ল।

॥ ২০ ॥

এপাশে গেরুয়া জলের নদী, ওপাশে নয়ানজুলি। মাঝখানে ভেড়ি বাঁধ। বাঁধের ওপর দিয়ে ইউনিয়ন বোর্ডের সড়ক।

নয়ানজুলির নরম মাটি লাটা আর কচুবনে ছয়লাপ। তার ভেতর ব্যাঙ আর ঝিঁঝিদের সংসার বেড়ে চলেছে।

এখন বেশ খানিকটা রাত হয়েছে।

রাত সেই নামে, লাটা আর কচুর বনে জলসা শুরু হয়ে যায়। গাল ফুলিয়ে ব্যাঙেরা গলা সাধতে বসে। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ঝিঁঝিরা সঙ্গত ধরে।

নদী-সড়ক-নয়ানজুলি—কোন দিকে লক্ষ্য নেই লোটনের। অদ্ভুত এক স্বপ্নের মধ্যে হেঁটে চলেছে সে।

স্বপ্ন!

স্বপ্ন বৈকি।

ছ বছর খেয়া নৌকোর মাঝিগিরি করছে লোটন। তার আগে?

হেমন্তের হিম-ঝরা আকাশের তলা দিয়ে চলতে চলতে দু বছর আগের কতকগুলি আশ্চর্য উজ্জ্বল দিনের মধ্যে ফিরে গেল লোটন।

আজকের লোটন খেয়া নৌকোর মাঝি। কিন্তু দু বছর আগে তার অন্য একটা পরিচয় ছিল।

যাত্রাদলে পালা গাইত লোটন।

ঝলমলে আসরের মাঝখানে যখন এসে সে দাঁড়াত, তখন নিজেরই নেশা ধরে যেত। লাল শালুর সামিয়ানা, দ্রুতলয় কনসার্ট, চারপাশে অজস্র জোড়া মুগ্ধ চোখ, হ্যাজাগের ধাঁধানো আলো—সব একাকার হয়ে চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলত।

কখন যে বাঁ হাতে একটা কান চেপে ডান হাতটা সামনের দিকে বাড়িয়ে গান ধরত, লোটনের হুঁশ থাকত না।

সব্ব অঙ্গ খেও রে কাক,
না রাখিও বাকি।
শুধু কৃষ্ণ দরশন আশে
রেখো দুটি আঁখি।

চিকের ওপাশ থেকে যুবতীরা অবাক বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকত। তাদের চোখে পলক পড়ত না।

গাইতে গাইতে হঠাৎ চোখদুটো চিকের ওপারে গিয়ে পড়ত। বুকের রক্ত ঘন হয়ে উঠত লোটনের।

রানীর হাট, বিবির বাজার, চিত্তিরগঞ্জ—আশে পাশের গ্রাম-গঞ্জ-বন্দরের সব মানুষ তাকে চিনত। রাস্তা দিয়ে যখন সে চলত, সসম্ভ্রমে সবাই বলত, 'হেই গো, "নিমাই সোন্ন্যাসে"র নিমাই যাচ্ছে।'

'কেউ বলত, "রাম-বনবাসে"র লক্ষ্মণ যাচ্ছে।'

সমস্ত অঞ্চল জুড়ে তার খ্যাতি ছিল, খাতির ছিল।

চলতে চলতে লোটন ভাবল। জীবনটা কি আশ্চর্য ভাবেই না বদলে গিয়েছে! 'নিমাই সন্ন্যাস' পালার নিমাই, 'রাম বনবাসে'র লক্ষ্মণ আজকাল খেয়াঘাটের মাঝি!

অথচ জীবনটাকে না বদলে উপায়ই বা কী ছিল?

জীবনটা যদি রাত্তির আসরের মত ঝলমলে হত, গোলমাল থাকত না। কিন্তু

কোন কিছুই বুঝি নিরঙ্কুশ নয়।

রাত্রির আসরটা যতখানি সত্য, আসরের নেপথ্যের জীবনটা তার চেয়ে তিলমাত্র কম সত্য নয়।

সেখানে দলের অধিকারীর সঙ্গে দেনা-পাওনা নিয়ে রোজ রোজ ঝগড়া। সেখানে অকথ্য, অশ্লীল গালিগালাজ। সেখানে সামান্য স্বার্থ নিয়ে কুৎসিত হাতাহাতি। সেখানে গাঁজাখোর কংসের সঙ্গে মাতাল কৃষ্ণের চুলোচুলি বেধেই আছে। যে লোকগুলো রাত্রির আসরে রাজা সাজে, দিনের আলোয় তারা কত নীচ হয়ে যায়!

রাত্রির আসরটা যতখানি ঝলমলে তার পশ্চাৎপটটা ঠিক ততখানিই কদর্য। সেখানে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে নি লোটন।

বার বার দল বদল করেছে সে।

প্রথমে অক্ষয় চক্কোত্তির 'মহামায়া অপেরা'য় ঢুকেছিল। অক্ষয়ের দল ছেড়ে এল লক্ষ্মণ হাজরার 'নিউ অপেরা পার্টি'তে। সেখান থেকে রসময় ঢালীর 'গণেশ অপেরা'য়। তার পর কত দলে যে ঘুরেছে, হিসেব নেই।

কিন্তু না, মনের মত একটা দল কোথাও খুঁজে পেল না লোটন।

'মহামায়া' বল, 'নিউ অপেরা' বল, সব জায়গাতেই এক অবস্থা। সেই কুশ্রী কলহ, দেনাপাওনা নিয়ে অধিকারীর সঙ্গে নিয়মিত বচসা, খাবারের ভাগ নিয়ে দলের লোকেদের খেয়োখেয়ি। যেদিন 'পালা' বন্ধ থাকে, দলের কেউ কেউ চুরি-চামারি করতে বেরোয়। কেউ কেউ আকণ্ঠ তাড়ি গিলে বুঁদ হয়ে পড়ে থাকে। যারা আরো উদ্যোগী, তারা গঞ্জের দিকে চলে যায়। সেখানে কামিনী-পাড়া আছে। দু-এক টাকার বদলে কামিনী-পাড়ার মোহিনীদের ঘরে একটা উষ্ণ, ঝাঁঝালো রাত কাটিয়ে আসতে বাধা নেই।

যাত্রাদলের এই জঘন্য অংশটার সঙ্গে কিছুতেই নিজের সুর মেলাতে পারে নি লোটন।

ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত বিলাস গায়েনের 'ডায়মণ্ড অপেরা'য় এসে ঠেকেছিল লোটন। একদিন সেই দলও ছেড়ে দিল। বিলাসের দল ছেড়ে অন্য কোন দল ধরল না সে। সোজা রানীর হাটে এসে খেয়ানৌকোর মাঝি হয়ে বসল।

যাত্রাদলের নেপথ্য জীবনটা খারাপ বলেই দল ছাড়ে নি লোটন। দল ছাড়ার অন্য একটা কারণ ছিল।

যাত্রাদলগুলিতে সেই চিরাচরিত পদ্ধতিতে 'পালা' গাওয়া হয়। কোথাও

এতটুকু নতুনত্ব নেই। অভিনবত্ব নেই।

যাত্রাদলগুলির কাঠামো, রুচি—সব কিছুই সাবেক কালে পড়ে রয়েছে। এতটুকু বদলায় নি।

পঁচিশ কি পঞ্চাশ বছর আগে যে পালাগুলো গাওয়া হত, আজও তাই গাওয়া হয়। সেই 'রাম-বনবাস', সেই 'প্রহ্লাদ চরিত্র', সেই 'কর্ণার্জুন'। এর মধ্যে নতুন কোন পালা আসে নি।

পঞ্চাশ বছর আগের সেই দ্রুতলয় কনসার্ট এখনও টিঁকে আছে। যে পদ্ধতিতে সেকালে গাওয়া হত, তার এতটুকু হেরফের হয় নি। সব রকমেই যাত্রাওয়ালারা পুরনো আমলটাকে টিঁকিয়ে রেখেছে। লোটনের অসহ্য লাগত। যা গতানুগতিক, বার বার যা গাওয়া হয়ে গিয়েছে, সেই সব পালা গাইতে ভাল লাগত না।

নতুন অভিনব কিছু একটা করার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিল লোটন। কিন্তু পরের দলে থেকে নতুন কিছু করার স্বাধীনতা কোথায়?

যখন যে দলে থেকেছে, সেই দলের অধিকারীকে অনেক বুঝিয়েছে লোটন। ফল হয় নি।

এই সব অধিকারীদের মাথা এত নিরেট যেখানে কিছুই ঢোকে না। কিছুই এরা বোঝে না, বুঝতে চায় না। নতুন কিছু করার মত মন, রুচি কিংবা সাহস —কোন কিছুই এদের নেই।

লোটন বলত, 'এক পালা কত বার আর গাইব? এবেরে একখানা লোতুন পালা ধর দিকি।'

'লোতুন পালা ধরব!'

অধিকারীরা আঁতকে উঠত। এমন একটা অবিশ্বাস্য কথা এর আগে তারা কোনদিনই শোনে নি।

'হ্যাঁ গো। এমন পালা ধর, এর আগে যা কেউ গায় নি।'

'যা কেউ গায় নি!'

অধিকারীরা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকত।

'হ্যাঁ-হ্যাঁ—তেমন একখানা পালা ধর। একেবারে তাক লাগিয়ে দাও।'

'লোতুন পালা ধরে মরব?'

হঠাৎ খেঁকিয়ে উঠত অধিকারীরা, 'যদি না উতরোয়, ঠ্যালা সামলাবে কে? একবার দলের বদনাম হয়ে গেলে কেউ ডাকবে?'

'তাই বলে সেই পুরনো পালা বার বার গাইতে হবে?'

'যার ঠেঙে পয়সা আসবে, তা পুরনো হোক আর যাই হোক, নিশ্চয় গাইতে হবে। এ বাপু শখ না, ব্যবসা। তোমার না পোষালে, দল ছেড়ে দাও। তোমার তালে পড়ে নোতুন পালা লাগিয়ে ব্যবসার ক্ষেতি করতে পারি না।'

এর পর কথা বলার আর উৎসাহ থাকে না।

আসলে যা সহজ, মসৃণ, চিরাচরিত, তার বাইরে এই সব অধিকারীরা পা বাড়াতে চায় না। নতুন কিছু করার ঝুঁকি এরা কোনদিনই নেবে না।

যেখানে মনের সুর মেলে না, সেখানে কতদিনই বা টিঁকে থাকা যায়! অগত্যা দল ছাড়ল নোটন।

দল ছাড়ল, কিন্তু মোহ ঘুচল না। লাল শালুর সামিয়ানা, কনসার্টের দ্রুতলয় বাজনা, চারপাশের মুগ্ধ চোখ, হ্যাজাগের ধাঁধানো আলো—সব কিছু তীব্র একটা নেশার মত নোটনের রক্তে মিশে আছে।

নোটন ঠিক করেছে, নিজেই একটা দল খুলবে।

কিন্তু দল খুলব বললেই তো খোলা যায় না। সাজ-সরঞ্জাম চাই, লোকজন চাই, কনসার্টের জন্য বাজনা চাই, সাজ-পোশাক চাই। দরকার অনেক কিছুরই।

সবার আগে যা দরকার, তা হল টাকা। মোটা পুঁজি দরকার।

দু বছর খেয়া নৌকোর মাঝিগিরি করে টাকা জমাচ্ছে নোটন। মোট দু'শ টাকা জমেছে।

আরো কিছু টাকা জমলেই সে কাজে নামবে।

অনেক ভেবে দেখেছে নোটন, পৌরাণিক পালা নিয়ে আসরে নামা চলবে না। নানা দিক থেকে তার অসুবিধা আছে।

প্রথমত, তার জন্য জমকালো সাজ-পোশাক দরকার, রকমারি বাজনা দরকার। সে সব অজস্র টাকার ব্যাপার। অত টাকা কোথায় পাবে নোটন।

তা ছাড়া এক-একটা দল এক-একটা পালা গেয়ে নাম করেছে। 'ডায়মণ্ড অপেরা'র মত 'রাম-বনবাস', 'মহামায়া অপেরা'র মত 'কর্ণার্জুন' কিংবা 'গণেশ অপেরা'র মত 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' কেউ নাকি গাইতেই পারে না। এর একটা পালা নিয়ে আসরে নামতে ভরসা হয় না। যতই ভাল হোক, লোকে বলবে, অমুক দলের মত হয় নি।

অবশ্য পৌরাণিক পালার ওপর মোহ নেই নোটনের। পৌরাণিক পালাই যদি গাইবে, তবে এতদিন যেখানে গাইল সে সব দল ছেড়ে বেরিয়ে আসবে

কেন? নতুন দলই বা গড়তে চাইবে কেন?

প্রথম প্রথম লোটন বুঝে উঠতে পারছিল না, কী ধরনের পালা নিয়ে আসরে নামবে। মাঝখানে একদিন কলকাতায় গিয়েছিল সে। সেখানে পৌরাণিক ছাড়াও নানা জাতের পালার বই পাওয়া যায়। দু-চারখানা কিনেও এনেছে লোটন।

এগুলি সামাজিক পালা।

'পথের সন্ধানে'—নামে বইটা বেশ ভালই লেগেছে লোটনের। এই পৌরাণিক পালার দেশে জিনিসটা একেবারেই নতুন। মনে হচ্ছে, ভাল করে গাইতে পারলে বেশ জমে যাবে। আর একবার যদি উতরে যায়, লোটনকে পায় কে?

তা ছাড়া একটা সুবিধের দিকও আছে। এই পালাটা নামাতে খুব খরচ নেই। সামাজিক পালা। কাজে কাজেই সাজের ঘটা নেই। বেশী বাজনারও দরকার নেই।

একটা ক্ল্যাবিওনেট বাঁশি আর একটা হারমোনিয়াম আছে লোটনের। ডুগি-তবলা আর সামন্য কিছু সাজ-পোশাক কিনে নিলেই আপাতত চলে যাবে।

কলকাতায় গিয়ে জিনিসপত্রের দরও করে এসেছে লোটন। মোট শ পাঁচেক টাকা থাকলেই পালাটা নামাতে পারবে সে।

নিজের ওপর লোটনের অফুরন্ত বিশ্বাস। দু শ টাকা যখন জমাতে পেরেছে, বাকি তিন শ টাকাও সে যোগাড় করে ফেলবে।

কোনদিক থেকেই ত্রুটি রাখে নি লোটন।

টাকাও যেমন জমাচ্ছে, তেমনি গায়েন আর বজনদারদেরও খোঁজখবর নিচ্ছে। সে দল খুললে 'ডায়মণ্ড অপেরা' থেকে একজন তবলা বাজিয়ে আসবে। 'সোনার বাঙলা যাত্রা পার্টি' থেকে একজন ক্ল্যারিওনেট বাজিয়ে আসবে। 'মহামায়া' আর 'গণেশ অপেরা' থেকে দু জন দু জন করে পালা গাইয়ে আসবে।

দল খুললে বাজনদার অনেক পাওয়া যাবে। ছোটখাটো পালা গাইয়েরও অভাব হবে না।

কিন্তু মুস্কিল হয়েছে মূল গাইয়েকে নিয়ে।

সব দলেই একজন করে মূল গাইয়ে থাকে। সে হয় সুন্দর, সুকণ্ঠ, সুপুরুষ। আসরে ঢুকেই সে সবাইকে মাত করে দেয়। তার ওপরেই দলের সুনাম, সাফল্য —সব নির্ভর করে।

'ডায়মণ্ড অপেরা'র মূল গাইয়ে ত্রৈলোক্য, 'গণেশ অপেরা'র মন্মথ, 'মহামায়া'র রজনী—সবার কাছে গিয়েছে লোটন। পুরনো দল ছেড়ে কেউ আসতে চায় না। লোটনের দল নতুন। সেখানে ঠিকমত মাইনে পাবে কিনা ঠিক নেই। পুরনো দলে আর্থিক প্রশ্ন সম্বন্ধে সবাই নিশ্চিন্ত। সহজ, নির্ধারিত জীবনের বাইরে কেউ কি আসতে চায়! আর এলেও টাকার খাঁই সাঙ্ঘাতিক। অত টাকা দেবার সামর্থ্য নেই লোটনের। অথচ তাদের মত একজন গাইয়ে না পেলে দলই চলবে না।

রাত হয়েছে।

দু পাশের সিমু গাছগুলি জমাট অন্ধকারের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে।

লম্বা লম্বা পা ফেলে সড়কের ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছে লোটন। মূল গাইয়ের ভাবনাটা তাকে অস্থির করে রেখেছে।

হঠাৎ মনের ওপর একটা মুখের ছায়া পড়ল। লোটন চমকে উঠল। আশ্চর্য! এতদিন এই লোকটার কথা মনে পড়ে নি!

আজই, এখনই তার কাছে যেতে হবে।

আজান বুড়োর দোকানের কাছাকাছি এসে পড়েছিল লোটন। হঠাৎ বাঁ দিকে ঘুরে তিতাসীদের বাড়ির দিকে পা চালিয়ে দিল সে।

॥ ২১ ॥

তিতাসীদের বাড়ি পর্যন্ত যেতে হল না। পথেই দেখা হয়ে গেল।

আজ কী তিথি কে জানে।

আকাশে হয়তো চাঁদ আছে। কুয়াশার জন্য দেখা যাচ্ছে না। কুয়াশা চুঁইয়ে চাঁদের যে আলোটুকু এসে পড়েছে, তাতে কিছুই স্পষ্ট নয়। দূরের গেরুয়া নদী, খেয়া ঘাট, আজান বুড়োর দোকান, অনেক দূরের আকাশ—সমস্ত কিছু আবছা, রহস্যময় হয়ে রয়েছে।

সড়ক দুটো পাশাপাশি, প্রায় সমান্তরাল। একটা সড়ক জেলাবোর্ডের। অন্যটা ইউনিয়ন বোর্ডের। দুই সড়কের মাঝখানে নয়ানজুলি।

জেলাবোর্ডের সড়ক ধরে হাঁটছিল লোটন। হঠাৎ পাশের সড়ক থেকে একটা মিঠে গলায় সুর ভেসে এল।

হেই গো গুরু,
আমার মনের চাবি তোমার কাছে,
জানি না, তার ভেতরে কী যে আছে!
গুরু তুমিই বল না,
তার ভেতরে আছে কিনা,
মণি-মাণিক সোনাদানা?
হেই গো গুরু—

গলা শুনেই লোটন চিনতে পারল। ডাকল, 'হেই সখাদাদা—হেই গো—'

কোনদিকে লক্ষ্য নেই। তন্ময় হয়ে সখারাম গাইছে। গলাটা ভারি সুরেলা।

হেই গো গুরু,
এই জীবনে মনের খপর পেলম না।
কুলুপ খুলে মনটা একবার দেখাও না।
হেই গো গুরু—

এবার আর ডাকাডাকি করল না লোটন। নয়ানজুলি পেরিয়ে পাশের সড়কে এসে উঠল।

সখারাম আগে আগে হাঁটছে। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে লোটন তাকে ধরে ফলল।

পায়ের শব্দে পেছন ফিরে তাকাল সখারাম।

লোটন বলল, 'তোমায় ডাকলম একবার, তা শুনতেই পাচ্চ না—'

'কখন ডাকলে?'

'এই ত্যাখ, আবার শুদোচ্চে, কখন ডাকলম!'

একটুক্ষণ অবাক হয়ে রইল লোটন। তার পর বলল, 'তা শুনবেই বা কেমন করে? তোমার কি হুঁশ ছেল? পেরান ঢেলে গান গাইছেলে।'

সখারাম জবাব দিল না।

লোটন বলতে লাগল, 'মাইরি সখাদাদা গলাখানা তোমার খাসা।'

রানীর হাটে আসার পর লোটনের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। চুপচাপ তার কথা শুনতে লাগল সখারাম।

লোটন থামে নি, 'অমন গলা এ তল্লাটে কোন শালার নি। হ্যাঁ, শালা বলেই বলচি।'

লোটনের স্তুতিতে বিশেষ উৎসাহিত হল না সখারাম। জীবনে অনেক দেখেছে সে, অনেক শুনেছে। দেখা আর শোনার চেয়ে অনেক বেশী বুঝেছে।

জন্মাবধি এ-ঘাট থেকে ও ঘাটে, এ-ঘর থেকে ও-ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে সখারাম। জীবনে কত মানুষের সংসর্গেই না সে এসেছে! মানুষের চরিত্র সম্বন্ধে তার জ্ঞান অফুরন্ত।

সখারাম বুঝতে পেরেছে, লোটনের এই স্তুতি নিছক ভূমিকা মাত্র। আরো কিছু সে বলতে চায়।

কী বলতে চায় লোটন ?

স্নায়ুগুলোকে সজাগ করে রাখল সখারাম।

লোটন একাই কথা বলছে, 'তোমাদের বাড়ি যাচ্ছিলম সখাদাদা।'

'কেন ?'

এতক্ষণে মুখ খুলল সখারাম।

'তোমার খোঁজে।'

'অমাকে দিয়ে কী হবে ?'

'দরকার আচে।'

বলেই খিসখিসিয়ে হেসে উঠল লোটন। হাসির আওয়াজটা রহস্যময় মনে হল।

হাসির শব্দটাই শুনতে পাচ্ছে সখারাম। কুয়াশামাখা, আবছা আলোতে লোটনের মুখটা ঠিকমত দেখা যাচ্ছে না।

লোটন আবার বলল, 'তোমাকে আমার খুব দরকার সখাদাদা, খু-উ-উ-ব দরকার।'

'খুব' শব্দটা টেনে টেনে বলল লোটন।

দরকার!

সখারাম চমকে উঠল। 'দরকারে'র কথায় হঠাৎ আরেক জনের মুখ মনে পড়ল। সে মুখ হ্যালিডে পাদ্রীর!

তাকে নিয়ে লোটনের যে কী দরকার, ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না সখারাম।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল।

সখারাম বলল, 'কতক্ষণ আর দেঁড়িয়ে থাকব। চল, হাঁটতে হাঁটতে কথা কই।'

'হ্যা—সেই ভাল।'

সঙ্গে সঙ্গে লোটন সায় দিল। দু জনে ইউনিয়ন বোর্ডের সড়ক ধরে বরাবর হাঁটতে লাগল।

লোটনই আবার শুরু করল, 'এখন কোত্থেকে এলে ?'

'হাটে গিছলম।'

'আজ হাট কেমন জমেছেল ?'

সখারাম জবাব দিল না।

আসল কথাটা আর বলছে না লোটন। শুধু ভণিতাই করছে। সখারাম বিরক্ত হয়ে উঠল। কিন্তু বিরক্তিটা লোটনকে বুঝতে দিল না।

লোটন বলল, 'কি গো সখাদাদা, অমন চুপচাপ কেন, কথা কইচ না যে ?'

'ভাল লাগচে না।'

নিস্পৃহ গলায় সখারাম বলল, 'সারাদিন খুব খাটুনি গেছে। হাত-পা একেবারে ভেঙে আসচে। তা ছাড়া খিদেও পেয়েচে জোর।'

একটু থেমে আবার, 'নাও, তাড়াতাড়ি তোমার দরকারী কথাটা সেরে ফেল দিকিনি।'

'কইছিলম কি—কইছিলম কি—'

'কী ?'

অস্ফুট একটা শব্দ করল সখারাম।

'তুমি যদি আমার সন্‌গে থাক—'

লোটন বলতে লাগল, 'মানে কইছিলম কি, তোমার গলাখানা খাসা, তোমায় দেখতে খাসা।'

একটু থেমে, আবার, 'আমি একটা যাত্রাদল খুলচি। তুমি দলে এলে—বুঝলে কিনা—'

সখারাম কী বুঝল, বোঝা গেল না। মুখ বুঁজে চুপচাপ সে হেঁটে চলেছে।

লোটন থামে না, 'তোমায় দলের মূল গাইয়ে করে নোব।'

'মূল গাইয়ে!'

হঠাৎ বলে উঠল সখারাম। তার স্বরে বিস্ময়।

'হ্যা-হ্যা, মূল গাইয়ে। ঐ রূপ আর ঐ গলা নিয়ে একবার যদি আসরে গিয়ে দাঁড়াও, সবাই মাত হয়ে যাবে।'

'তাই নাকি ?'

'হ্যাঁ রে দাদা, হ্যাঁ—'

'কিন্তুক আমি তো কুনোদিন পালা গাই নি। কেমন করে পালা গাইতে হয়, তাও জানি না।'

'কিচ্ছু ভেবো নি সখাদাদা—'

হাত নেড়ে নেড়ে লোটন বলতে লাগল, 'তোমায় আমি শিখিয়ে পড়িয়ে নোব।'

'ও।'

এর পর খানিকটা চুপচাপ।

লম্বা লম্বা পা ফেলে দু জনে হেঁটে চলেছে। পায়ের তলা দিয়ে ইউনিয়ন বোর্ডের সড়কটা সরে সরে যাচ্ছে।

একসময় তারা তিতাসীদের বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়ল।

হঠাৎ এক কাণ্ডই করে বসল লোটন। সখারামের দুটো হাত চেপে ধরল। বলল, 'মাইরি দাদা, তোমার কথা দিতেই হবে।'

'কিসের কথা?'

সখারাম অবাক হয়ে গেল।

'বল, তুমি আমার দলে আসবে—'

সখারাম বলল, 'চট করে কি বলা যায়? ভেবে দেখি—

মাথা নেড়ে লোটন বলল, 'তোমার কোন ওজর শুনব নি। আমার দলে তোমায় আসতেই হবে।'

লোটনের গলাটা কাঁপতে লাগল, 'জান সখাদাদা, আমার অনেক দিনের আশা, একটা মনের মতন যাত্রার দল খুলব।'

সখারাম চুপ করে রইল।

লোটন বলে যাচ্ছে, 'খেয়াঘাটে মাঝিগিরি করে কত কষ্টে টাকা জমাচ্চি। আর কিছু জমলেই দল খুলতে পারব। ছোট ছোট গাইয়ে অনেক আসচে। কিন্তুক আসল গাইয়েই পাচ্চি না।'

'অ।'

সংক্ষেপে জবাব দিল সখারাম।

লোটন বলল, 'তোমায় আমার চাই সখাদাদা। তোমায় না পেলে আমার চলবে নি।'

'বুঝলম।'

'তা হলে কথা দিচ্ছ তো? পাকা কথা কিন্তুক—'

চলতে চলতে সখারামের মুখের দিকে তাকাল লোটন।

'এক্ষুনি তোমায় কথা দিই কেমন করে?'

লোটন বলল, 'কথা দাও আর না দাও, আমার দলে তোমায় আসতেই হবে। নইলে ছাড়চি না।'

সখারাম কিছু বলল না।

এতদিন বেশ চলছিল।

হঠাৎ একটা বাড়তি, ফালতু লোক রানীর হাটে এসে পড়েছে। এখন তাকে সবার দরকার।

তাকে না হলে কামিনী-বৌর চলে না। হ্যালিডে সায়েব, আজান বুড়ো, সবাই তাকে চায়।

এমন যে খেয়াপারানির মাঝি লোটন, তারও তাকে দরকার।

ভাবতে ভাবতে অবাক হয়ে গেল সখারাম।

॥ ২২ ॥

দেখতে দেখতে শীত এসে গেল। শীত এখানে সমারোহ করে আসে।

রানীর হাটের গাছগুলি পাতা ঝরে ঝরে নিঃস্ব হয়ে যায়। রুক্ষ মাঠের ওপর দিয়ে লাল ধুলো উড়তে থাকে। গেরুয়া নদীটা আরো ক্ষীণ, আরো নিঃস্রোত হয়ে যায়। এখানে ওখানে বালির ডাঙা মাথা জাগায়।

এই মরসুমে পাখিরা আসে। এদেশের পাখি না। বিদেশী, যাযাবর পাখি। তাদের কী-বা নাম কী-বা ধাম, কেউ জানে না। অবশ্য নাম জানার জন্য কারো মাথাব্যথা নেই। একটা নয়, দুটো নয়—অনেক, অজস্র পাখি। কোথা থেকে তারা আসে, কোথায় যায়, কে বলবে।

এদেশে বলে সুখের পাখি।

সুখের পাখিদের স্থায়ী কোন ঠিকানা নেই। দু দিন এখানে, পাঁচ দিন সেখানে—এমন করেই তারা ঘুরে বেড়ায়।

পৌষ আর মাঘ—দুটো মাস তারা রানীর হাটে থাকবে। শীতের শূন্য, খাঁ খাঁ আকাশটাকে জমকালো করে রাখবে।

শীত ফুরোলেই সুখের পাখিরা রানীর হাট ছেড়ে সুখের খোঁজে অন্য কোথাও চলে যাবে।

এখন, এই শীতে প্রচুর কুয়াশা, সমুদ্র কাছে থাকার জন্য হু-হু বাতাস আর অসহ্য হিম।

এখন পৌষ মাস।

এ সময়টা চারপাশে যাত্রাগানের ধুম পড়ে যায়।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই কামিনী-বৌ বলল, 'এট্টা কথা রাখবে ব্যাটাছেলে?'

জামরুল গাছের তলায় বসে রোদ পোয়াচ্ছিল সখারাম। শীতের রোদ ভারি মিঠে, সুখস্পর্শ।

প্রথমটা শুনতে পায় নি সখারাম।

কামিনী বৌ ডাকল, 'হেই গো—শুনতে পাচ্চ?'

সামনের দিকে ঝুঁকে বসে ছিল সখারাম। কামিনী-বৌর ডাকে ধড়মড় করে উঠে বসল। বলল, 'কিছু কইলে?'

'হ্যাঁ—কইলম তো। নিচ্চয় কানে ঢোকে নি।'

সখারাম লজ্জা পেল। সত্যিই সে কিছু শোনে নি। মুখ নামিয়ে সে নখ খুঁটতে লাগল।

তীক্ষ্ণ চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল কামিনী-বৌ। তার পর বলল, 'মাঝে মাঝে তোমার কী হয় বল দিকিনি?'

সখারাম থতমত খেয়ে গেল। বলল, 'কেন? কী আবার হবে?'

'এই যে কোনদিকে হুঁশ থাকে না। বসে বসে কী ভাব?'

ঘন ঘন মাথা নেড়ে সখারাম বলল, 'কিচ্ছু না, কিচ্ছু না—'

'কি জানি বাপু, তোমায় ঠিক বুঝে উঠতে পারি না।'

ফিস ফিস গলায় কামিনী-বৌ বলল।

একটু চুপ।

এবার আসল কথাটা পাড়ল কামিনী-বৌ, 'নদীর হুই ওপারে মোহনপুরের গঞ্জ, জান তো?'

ঘাড় কাত করে সখারাম বলল, 'জানি।'

'আজ রাত্তিরে সেখেনে যাত্‌রা গান হবে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ গো—হ্যাঁ—

আরো একটু কাছে এগিয়ে এল কামিনী-বৌ। বলল, 'মোহনপুরের আড়তদাররা কলকাতা ঠেঙে দল আনিয়েচে। নামকরা দল।'

'কী পালা হবে ?'

'কলঙ্কভঞ্জন।'

'অ।'

একটিমাত্র শব্দ করে চুপ করল সখারাম।

অন্য বছরের মত এবারও সুখের পাখিরা এসেছে। শীতের শূন্য, নির্মেঘ আকাশটা পাখিতে পাখিতে ছয়লাপ।

শীত পড়তেই পেঁপে গাছের পাতা ঝরে গিয়েছে। ন্যাড়া গাছ দুটো এখন কি বিশ্রীই না দেখায়! জামরুল গাছটার দশা অত করুণ নয়। সবেমাত্র তার পাতা খসতে শুরু করেছে। পাতা খসে খসে শীতের শেষে গাছটা একেবারে রিক্ত হয়ে যাবে। তখন সরু সরু, নিষ্পত্র ডালগুলো আকাশের দিকে বাড়িয়ে জামরুল গাছটা একটু আলো আর একটু তাপের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকবে।

কামিনী-বৌই আবার মুখ খুলল, 'কইচিলম কি, তিতাসী আর আমাকে মোহনপুর নে যাবে ?'

'যাব।'

সখারাম উৎসাহিত হয়ে উঠল, 'কখন যাবে ?'

'সন্ঝে (সন্ধ্যে) ঠেঙে গান শুরু হবে। ভাবচি, বিকেলে বেরুব।'

'তা হলে এখন উঠে পড়ি।'

আড়মোড়া ভেঙে তুড়ি দিতে দিতে উঠে দাঁড়াল সখারাম। বলল, 'তাড়াতাড়ি হাটটা সেরে আসি।'

কামিনী-বৌ বার বার হুঁশিয়ার করে দিল, 'মনে থাকে যেন, বিকেলে আমরা গান শুনতে যাব। ভুলে যেও নি।'

'না-না, ভুলব কেন ?'

'না ভুললেই ভাল।'

সখারাম জবাব দিল না। হাটে বেরুবার জন্য তৈরি হতে লাগল।

বিকেল থাকতে থাকতেই হাট থেকে ফিরে এল সখারাম।

এখন শীতের আকাশে বিষণ্ণ একটু আলো আটকে আছে। সে আলোর না

আছে তেজ, না আছে তাপ।

হাট থেকে সখারাম ফিরবে, ফিরেই তাদের নিয়ে মোহনপুর যাবে—এই আশায় কামিনী-বৌ আর তিতাসী দাওয়ায় বসে ছিল। অপেক্ষা করছিল।

সখারামকে দেখে তিতাসীর চোখজোড়া চিকচিক করে উঠল। মুখে কিছু বলল না সে। চোখের চিকচিকানি দিয়েই সে তার মনোভাবটা বুঝিয়ে দিল। খুব, খুব খুশি হয়েছে সে।

কামিনী-বৌ বলল, 'ঠিক সময় তা হলে ফিরলে! ভোল নি দেখচি—'

'ভুলব কেন?'

চোরা চোখে একবার তিতাসীর দিকে তাকিয়ে সখারাম বলল, 'ভুললে তুমি রেহাই দেবে!'

'তা যা বলেচ—'

কামিনী-বৌ খিলখিলিয়ে হেসে উঠল। ফিস ফিস করে বলল, 'আমার কাছে তোমার রেহাই নেই।'

এর পর কয়েকটা দরকারী কথা হল। হাটের বিকিকিনি, লাভ-লোকসানের কথা। ডালাকুলো বেচে সখারাম যা এনেছিল, কামিনী-বৌ হিসেব করে বুঝে নিল।

সকালের মত এখনও, এই বিকেলে, শীতের আকাশটা পাখিতে পাখিতে জমকালো হয়ে আছে। সুখের পাখিরা উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে।

শেষবেলার রোদ আরো নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। আকাশটা কেমন যেন নিরানন্দ, বিষণ্ণ।

একটু পরেই সন্ধ্যে হয়ে যাবে।

সখারাম বলল, 'আর দেরি করো না। তৈরি হয়ে নাও। মোহনপুর যেতে যেতে রাত হয়ে যাবে।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, গা ধুয়ে কাপড় বদলে আসচি। তুমি এট্টু বস।'

কামিনী-বৌ উঠে পড়ল। দেখাদেখি তিতাসীও উঠল।

দাওয়ার খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে বসে রয়েছে সখারাম।

অনেক, অনেক দূরে গির্জের চুড়োটা আকাশকে বিঁধে আছে। চুড়োটা ঘিরে সাদা হিম পড়ছে।

সির সির করে হাওয়া দিয়েছে। জামরুল গাছের পাতা কাঁপছে। আকাশে

সুখের পাখিরা উড়ছে।

কোনদিকে লক্ষ্য নেই সখারামের। চোখ বুঁজে নিজের কথাই ভাবছে সে। মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করছে।

কার্তিক মাসের ঝড়তুফানের দিন রানীর হাটে এসেছিল সে। এটা পৌষ মাস।

পুরো তিনটে মাস এখানে কাটিয়ে দিল সখারাম।

আশ্চর্য! তবু এতটুকু ক্লান্তি নেই।

এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ানো তার স্বভাব। তার রক্তের মধ্যে অবুঝ এক অস্থিরতা বাসা বেঁধে আছে।

কোথাও দু-পাঁচ দিন, বড় জোর দু-চার মাসের বেশী কাটাতে পারে না সখারাম। প্রাণটা কেমন যেন পালাই-পালাই করে ওঠে। তখন সামনে-পিছনে, কোনদিকেই তাকায় না সে। হঠাৎ সব ছেড়েছুড়ে ভেসে পড়ে।

লোকে পোশাক বদলায়, সখারাম জায়গা বদলায়। ঘর বদলায়। এই-ই তার স্বভাব।

রানীর হাটে তিন তিনটে মাস কাটিয়ে দিল সখারাম। আবার কোথাও যে ভেসে পড়বে, প্রাণের ভেতর থেকে এমন কোন তাগিদই আসছে না। এতকাল স্বভাবের মধ্যে যে অস্থিরতাটা ছিল, সেটা যেন জুড়িয়ে গিয়েছে।

তিন-তিনটে মাস। একটা দুটো দিন নয়। রানীর হাটের ঢিমে তালের জীবন তাকে কি অদ্ভুতভাবেই না শান্ত করে ফেলেছে!

কত সাধ ছিল সখারামের। সারা জীবন সে ছুটে বেড়াবে। এঘাট থেকে ওঘাটে। এঘর থেকে ওঘরে। ঘুরতে ঘুরতে একদিন সমুদ্রে পৌঁছবে।

সমুদ্র সম্বন্ধে তার মনোভাব বিচিত্র। সমুদ্র সখারামের কাছে অফুরন্ত একটা জলাধার নয়। সমুদ্র তার কাছে জীবনের প্রতীক, জীবনের সমার্থক।

যে জীবন বিপুল, বিশাল, ডুব দিয়ে যার তল মেলে না, থৈ মেলে না, যা অশেষ, যা অগাধ, সমুদ্র ছাড়া তার উপমাই বা কী হতে পারে!

জন্মের পর থেকে জীবন নামে সেই সমুদ্রটার খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে সখারাম।

কিন্তু আশ্চর্য!

এই কি সে চেয়েছিল?

পৃথিবীর হট্টগোল থেকে অনেক, অনেক দূরে এই রানীর হাট। এখানে এসে

একটু একটু করে সে জুড়িয়ে যাবে—কোনদিন একথা কি ভাবতে পেরেছিল সখারাম!

আর দশটা মানুষ যেমন করে, ছোট্ট একটা গণ্ডির মধ্যে নিজেদের পোষ মানায়, খাপ খাওয়ায়, ছোট সুখ ছোট সাধ ছোট আশা আর ছোট দুঃখ নিয়ে জীবন কাটিয়ে দেয়, সখারাম কোনদিন তা চায় নি।

কিন্তু এখানে, এই রানীর হাটে এসে জীবনটা কি অদ্ভুভাবেই না বদলে গিয়েছে!

হাটে যাওয়া, কামিনী-বৌর কাছে বিকিকিনির হিসেব দেওয়া, ফুরসত পেলে আজান বুড়োর দোকানে চুটিয়ে আড্ডা মারা, খাওয়া আর ঘুম—এই তো প্রতিদিনের জীবন। কিন্তু এর বাইরেও জীবনের একটা গূঢ় এবং গভীর অর্থ আছে। সেকথা যেন ভুলে গিয়েছে সখারাম।

রানীর হাট তার হাজার বছরের আলস্য দিয়ে সখারামের সব উদ্দামতাকে ঘুম পাড়িয়ে ফেলেছে। তার রক্তের ভেতর অদ্ভুত এক মন্থরতা ছড়িয়ে পড়েছে।

এখানেই কি তার ছোটার শেষ? রানীর হাটের ঢিমেতালের নিরুত্তেজ জীবন থেকে আর কোনদিনই কি সে বেরুতে পারবে না! একদিন সে সমুদ্র খুঁজতে বেরিয়েছিল। এখান থেকে বেরুতে না পারলে, কোনদিনই কি সেই সমুদ্রে পৌছতে পারবে?

নিজেকে একটার পর একটা প্রশ্ন শুধোল সখারাম। সদুত্তর মিলল না। মনটা হঠাৎ ভারি উদাস হয়ে গেল।

আকাশ থেকে দিনের শেষ আলোটুকু মুছে গিয়েছে।

পাশ থেকে কে যেন ডাকল, 'হেই গো—'

সখারাম চমকে উঠল। বলল, 'কে?'

'আমরা গো আমরা—'

খিসখিসিয়ে হেসে উঠল কামিনী-বৌ। বলল, 'বাঘ না, ভাল্লুক না—'

সখারাম কিছু বলল না। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। তাকিয়েই অবাক হয়ে গেল।

কামিনী বৌ আর তিতাসী পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রয়েছে। মোহনপুরে যাত্রাগান শুনতে যাবে, দু জনে তাই ঘটা করে সাজগোজ করেছে।

কামিনীকে দেখছে না সখারাম। একদৃষ্টে, মুগ্ধ চোখে তিতাসীর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। চোখে পলক পড়ছে না।

পরিপাটি করে একটা কব্বা খোঁপা বেঁধেছে তিতাসী। খোঁপাটা ঘিরে লাল টুকটুকে পয়সা ফুল গুঁজে দিয়েছে। চোখের কোলে চিকন রেখায় কাজল টেনেছে। একটা নাকছাবি পরেছে। নাকছাবির লাল পাথরটা জ্বলছে।

চোখ ফেরাতে পারছে না সখারাম।

আয়না চুড়ি পরেছে তিতাসী। দুই ভুরুর মাঝখানে কাচপোকার সবুজ একটি টিপ দিয়েছে।

নীল রঙের একটা শাড়ি পরেছে। শাড়িটার গায়ে অজস্র সোনালী বুটি। শাড়িটা যেন সমুদ্র আর বুটিগুলো সোনার মাছ।

নীল শাড়িটা তিতাসীর দেহে কি বশই না মেনেছে!

মুখের ওপর দু-চারটে চুল উড়ু-উড়ু করছে। দুই ঠোঁটের ফাঁকে সূক্ষ্ম একটি হাসি ধনুকের ছিলার মত টান টান হয়ে আছে।

একটু কাজল, আয়না চুড়ি, পয়সা ফুল, নীল শাড়ি, সবুজ একটা টিপ— সামান্য কিছু উপকরণ। তাই দিয়ে নিজেকে সাজিয়ে এ কোন্ জাদুকরী হয়ে উঠেছে তিতাসী!

তাকিয়ে আছে তো তাকিয়েই আছে। চোখের তারা দুটো স্থির হয়ে রয়েছে সখারামের।

সখারামের মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে তিতাসী উসখুস করতে লাগল। অমন করে একজন যদি তাকিয়ে থাকে, আর কী-ই বা সে করতে পারে!

একসময় অস্ফুট গলায় সখারাম বলল, 'চিনতে পারচি না যে গো—'

তিতাসী জবাব দিল না। চোখ নামিয়ে নিজের পায়ের নখ দেখতে লাগল।

'কী সাজ করেচ গো—'

কাঁপা কাঁপা গলায় সখারাম বলল, 'কী সুন্দর দেখাচ্ছে তোমায়!'

ফিস ফিস করে তিতাসী বলল, 'সুন্দর না ছাই—'

একপাশে দাঁড়িয়ে তিতাসী আর সখারামের ভাবগতিক লক্ষ্য করছিল কামিনী-বৌ। দুজনের কথা শুনছিল। শুনতে শুনতে অবাক হয়ে যাচ্ছিল।

কোনদিন তিতাসীকে সখারামের সঙ্গে কথা বলতে দেখে নি কামিনী-বৌ। সখারাম সম্বন্ধে তিতাসীর মনোভাবটা সে জানত।

এত কাল তো সখারামের ওপর বিরূপ হয়েই ছিল তিতাসী। কিন্তু আজ ফিস ফিস কাঁপা গলায় দু জনে কথা বলছে। কথার যা রকম, তাতে বিরূপতার চিহ্নমাত্র নেই।

কামিনী-বৌ জানত না, যেদিন সে লক্ষ্মণ বেয়ার বাড়ি গিয়েছিল, সেদিন রাত্রেই তিতাসী আর সখারাম প্রথম কথা বলেছে।

কামিনী-বৌ একবার ভাবল, তবে কি তার অলক্ষ্যে, তার অগোচরে তিতাসী আর সখারাম—

ছু জনের সম্পর্ক প্রথমটা ঠিক বুঝে উঠতে পারল না কামিনী-বৌ। ছুর্বোধ্য একটা ধাঁধার মত মনে হল। পরমুহূর্তেই সমস্ত পরিষ্কার হয়ে গেল। মনের যে অংশটা সবচেয়ে গভীর, সবচেয়ে স্পর্শকাতর, সেখান থেকে কে যেন বলল, নিশ্চয়, তিতাসী আর সখারাম, একজন আরেক জনকে জাছু করেছে।

হঠাৎ, কেন কে বলবে, অবুঝ এক ছুঃখে মনটা ভারী হয়ে উঠল কামিনী-বৌর। নিশ্বাস ফেলতে কষ্ট হতে লাগল। কণ্ঠার কাছে কেমন একটা ব্যথা-ব্যথা ভাব। হৃৎপিণ্ডের ভেতর কী একটা যেন ফুলে ফুলে ডেলা পাকিয়ে উঠছে। ঢোক গিলতে পারছে না সে। শ্বাসটা আটকে আটকে আসছে।

একবার তিতাসী আর এক বার সখারামের দিকে তাকাল কামিনী-বৌ। চোখের কালো মণি ছুটো ঝিক ঝিক করে উঠল।

এর নামই কি ঈর্ষা? কামিনী-বৌ বুঝে উঠতে পারল না।

যত দূর তাকানো যায়, আকাশটা এখন ধূসর। দূরের কুঠির মাঠ, গির্জে-বাড়ি, শিশু গাছের সারি—সব আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে। ছাইটিবির মাথায় পেঁপে গাছ ছুটো অল্প অল্প নড়ছে। জামরুল গাছের পাতাগুলো খিস খিস করছে।

কামিনী-বৌর দিকে ঘুরে সখারাম বলল, 'নাও চল—'

বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল।

কামিনী-বৌ নড়ল না। একটা কথাও বলল না। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে দাঁড়িয়ে রইল।

এবার তিতাসী তাড়া দিল, 'কি, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলি যে ভাই-বৌ! যাবি না?'

'না।'

কামিনী-বৌর গলায় অস্ফুট একটা শব্দ ফুটল।

তিতাসী শুধাল, 'না কেন?'

কামিনী-বৌ জবাব দিল না।

তিতাসী আবার বলল, 'এত ঘটা করে সাজলি, যাত্রা শোনার এত শখ তোর! সেজেগুজে এখন কইচিস যাবি না। কেন, কী হয়েচে?'

'কী আবার হবে ?'

'তা হলে চল।'

কামিনী-বৌর একটা হাত ধরল তিতাসী। বলল, 'বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে। গিয়ে দেখব, যাত্‌রা গান আদ্দেক হয়ে গেচে।'

তিতাসীর হাতের মুঠো থেকে নিজের হাতটা আস্তে আস্তে ছাড়িয়ে নিল কামিনী-বৌ। বলল, 'তোরা যা। আমি আজ যাব নি।'

আরো একটু কাছে এগিয়ে এল তিতাসী। বলল, 'রাগ করেচিস ভাই-বৌ ?'

'রাগ !'

কামিনী-বৌর গলাটা আশ্চর্য তীক্ষ্ণ শোনাল। কিছুক্ষণ অদ্ভুত চোখে তিতাসীর দিকে তাকিয়ে রইল সে। তার পর খিসখিসিয়ে হেসে উঠল। হাসির তালে তালে তার সুঠাম শরীরটা কাঁপতে লাগল।

কামিনী-বৌর যাত্রা-শোনার খুব শখ। যাত্রাপালার নামে সে নেচে ওঠে। পাঁচ মাইল, দশ মাইল, যত দূরই হোক, যাত্রা হলেই সে ছুটবে।

সখারামের সঙ্গে আজ মোহনপুর যাত্রা শুনতে যাবে। সারা বিকেল কামিনী-বৌ সাজগোজ করেছে। এখন বেরুবার মুখে সে বলছে, যাবে না।

তিতাসী অবাক হয়ে গেল। অবাক হওয়াই তো স্বাভাবিক।

কামিনী-বৌ সমানে হাসছে।

একসময় তিতাসী বলল, 'অমন হাসছিস কেন ভাই-বৌ ?'

'কেন হাসছি, তুই বুঝবি নি।'

হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠল কামিনী-বৌ, 'তোরা যা, বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে। এর পর গেলে দেখবি আসর ভেঙে গেচে।'

তিতাসী শেষ চেষ্টা করল, 'তুই তা হলে যাবি নি ?'

'আমার ভাবনা তোর ভাবতে হবে নি।' হঠাৎ মুখটা তিতাসীর কানে গুঁজে ফিস ফিস করে উঠল কামিনী-বৌ, 'নিজের ভাবনা ভাব ছুঁড়ী।'

তার পর সখারাম আর তিতাসী, দু জনকে একরকম তাড়া দিতে দিতে উঠোন পার করে বাইরের রাস্তায় দিয়ে এল।

এখন খানিকটা রাত হয়েছে। কনকনে হাওয়া দিয়েছে। যত দূর তাকানো যায়, অন্ধকার আর কুয়াশা নিরেট একটা পর্দার মত সমস্ত কিছুকে ঢেকে রেখেছে।

বাইরের রাস্তায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল কামিনী-বৌ।

সখারাম আর তিতাসী রাস্তা ছেড়ে একসময় চোরকাঁটা-ভরা মাঠটায় গিয়ে নামল। তাদের আবছা আবছা দেখাচ্ছে।

একদৃষ্টে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে কামিনী-বৌ। চোখের তারা দুটো জ্বলছে। অন্ধকার আর কুয়াশা বিঁধে বিঁধে তার দৃষ্টিটা সখারাম আর তিতাসীর পিছু পিছু চলেছে।

মাঠ পেরিয়ে অনেক দূর চলে গিয়েছে দু-জন। এখন আর তাদের দেখা যাচ্ছে না। শীতের গাঢ় অন্ধকারে তারা হারিয়ে গিয়েছে।

একসময় ছাইটিবিটার ওপর এসে উঠল কামিনী-বৌ। পেঁপে গাছের গায়ে ঠেসান দিয়ে দাঁড়াল। বুকের কোন গভীর থেকে একটা ভারী দীর্ঘশ্বাস পাক খেতে খেতে বেরিয়ে এল।

এতক্ষণ চোখ দুটো জ্বলছিল। এখন তার দৃষ্টি শূন্য, উদাস।

কামিনী-বৌর মনে হল, আজ এইমাত্র কী একটা যেন সে হারিয়েছে। কী হারিয়েছে? ঠিক বুঝতে পারল না। না বুঝুক, অবোধ এক দুঃখ তাকে ছেয়ে ফেলল।

পেঁপেগাছটার গায়ে ঠেসান দিয়ে কামিনী-বৌ কতক্ষণ যে দাঁড়িয়ে ছিল, হুঁশ নেই। হঠাৎ কাঁকড়ার দাঁড়ার মত কতকগুলো ঠাণ্ডা আঙুল তার কাঁধের ওপর নড়ে উঠল।

ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল কামিনী-বৌ, 'কে—কে?'

'আমি লো বৌ। ডরাস নি।'

কামিনী-বৌ ঘুরে তাকাল। দেখল, পাশ ঘেঁষে সুখী বুড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে।

কামিনী-বৌ বলল, 'তুমি—শাউড়ী—'

'হ্যাঁ, আমি।'

একটু চুপচাপ।

নদীর দিক থেকে হঠাৎ দমকা বাতাস ছুটে এল। পেঁপে গাছটা জোরে জোরে দুলে উঠল। আকাশে হয়তো চাঁদ আছে। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। অনেকদূরে গির্জেবাড়ির দিক থেকে এক ঝাঁক শিয়াল ডেকে উঠল।

সুখী বুড়ীই আবার শুরু করল। কামিনী-বৌর কানে মুখটা গুঁজে ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, 'সখারাম আর তিতাসীকে বুঝি পাঠিয়ে দিলি? হ্যাঁ লো বউ—'

কামিনী-বৌ চমকে উঠল। তিতাসীরা যখন মোহনপুর যাত্রা শুনতে যায়, সুখী বুড়ী বাড়ি ছিল না। আজান বুড়োর দোকানের ওদিকে কোথায় যেন

গিয়েছিল। তবু সে টের পেয়েছে।

কেমন করে টের পেয়েছে, এবার সেই কথাটাই বলল সুখী বুড়ী, 'মাঠের দিক ঠেঙে আসচিলম। দেখলম, সখারাম আর তিতাসী চলেচে। সন্‌গে তুই নেই। ওদের শুদোলম কোথায় যাচ্চিস? বললে, যাত্‌রা শুনতে যাচ্চে। তুই নাকি ওদের পাঠিয়ে দিয়েচিস।'

কামিনী-বৌর গলায় নীরস স্বর ফুটল, 'হ্যাঁ, আমিই পাঠিয়েচি।'

'বেশ করেচিস, ভাল করেচিস—'

কী এক খুশিতে সুখী বুড়ীর ছানিপড়া ঘোলাটে চোখদুটো চকচক করছে। নিদাঁত ফোকলা মুখে খল খল করে খানিকটা হাসল সে। তার পর বলল, 'অ্যাদ্দিনে আমার ভাবনা ঘুচল।'

বিড় বিড় করে কামিনী-বৌ কী বলল, বোঝা গেল না।

সুখী বুড়ী ডাকল, 'বউ—অ্যাই বউ—'

'কী কইচ?'

'যা দেখলম, পেরানটা আমার জুড়িয়ে গেচে।'

'কী দেখলে?'

কামিনী-বৌর গলায় কৌতূহল।

'দুটোতে, উই সখারাম আর তিতাসী, ডগমগ হয়ে চলেচে।'

'অ।'

সংক্ষেপে জবাব সারল কামিনী-বৌ। গলাটা কেমন যেন নিস্পৃহ শোনাল।

'বুঝলি বৌ—'

একটু থেকে কী যেন ভাবল সুখী বুড়ী। তার পর বলল, 'দুটোকে ভারি সুন্দোর মানিয়েচে।'

কামিনী-বৌ জবাব দিল না।

এবাব অন্য কথা পাড়ল সুখী বুড়ী, 'অনেক রাত হল বৌ। চ, এবেরে খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়িগে—'

'তুমি যাও, আমি এট্টু পরে যাচ্চি।'

ছাইটিবি থেকে উঠোনে নেমে গেল সুখী বুড়ী। উঠোন থেকে ইটের পাঁজার খুপরিতে গিয়ে ঢুকল।

আবার পেঁপে গাছটার গায়ে ঠেসান দিয়ে দাঁড়াল কামিনী-বৌ। দৃষ্টিটা আগের মতই উদাস আর শূন্য হয়ে গেল। সামনে পেছনে, যেদিকে যতদূর

খুশি তাকানো যায়, অন্ধকার আর কুয়াশায় একাকার হয়ে শীতের রাত্রিটা আচ্ছন্ন হয়ে আছে।

কোথাও একটু শব্দ নেই, একটু আলো নেই। এমন কি একটা মানুষ পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে না কামিনী-বৌ।

শীতের এই রাত্রিটা আশ্চর্য নির্জন, বড় নিরালা, বড় নিঃশব্দ।

শীতের রাত্রিটাকে দেখতে দেখতে নিজের নিঃসঙ্গ নিরুৎসব জীবনটার কথা মনে পড়ল কামিনী-বৌর।

এতদিন নিজের মনের দিকে তাকায় নি সে। সংসারের ধান্দায় কোনদিকে তাকাবার জো ছিল না। প্রাণের গভীরে ক্ষুধা আছে, তৃষ্ণা আছে, এতদিন সে ভাবনায় ফুরসত ছিল না।

এতদিন মনের দিকে পিঠ ঘুরিয়ে বসে ছিল কামিনী-বৌ।

কিন্তু আজ, একটু আগে তিতাসী যখন সখারামের সঙ্গে যাত্রা শুনতে চলে গেল, কামিনী-বৌ বুঝল, তার মনটা বড় বুভুক্ষু, বড় তৃষিত।

তার তৃষ্ণা তার খিদে কে মেটাবে!

কথাটা ভাবল বটে, কিন্তু সদুত্তর মিলল না। এই শীতের রাত্রিটার মতই তার জীবনে আলো নেই, তাপ নেই, সঙ্গী নেই, উৎসব নেই। এই অন্ধকার আর কুয়াশার মতই তার চারপাশে শুধু হতাশা। অথৈ, অন্তহীন দুঃখ।

অথচ কামিনী-বৌর জীবনেও সঙ্গী ছিল, উৎসব ছিল।

অনেক, অনেকদিন পর এই মুহূর্তে হঠাৎ শ্যামের কথা মনে পড়ল তার। সেই শ্যাম, সাত বছর আগে লড়াইতে গিয়ে আজও যে ফেরে নি। কোনদিন সে ফিরবে কি না, কামিনী-বৌ জানে না।

কেন শ্যাম ফেরে না?

শ্যাম ফিরে এলে তার সব দুঃখই তো ঘুচে যায়! তার সব তৃষ্ণাই মিটতে পারে!

দুঃখে, অভিমানে দু-হাতে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল কামিনী-বৌ। শরীরটা ফুলে ফুলে উঠতে লাগল।

॥ ২৩ ॥

পালার নাম 'কলঙ্কভঞ্জন'।

দলের নাম 'লক্ষ্মণ অপেরা'। দলটা খাসা গায়। সেই সন্ধ্যেরাত্তিরে গান

শুরু হয়েছিল। মাঝরাত্তিরে শেষ হল। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দলটা আসরটাকে মাতিয়ে রেখেছিল।

পালা ভাঙতেই আসর ছেড়ে দু জনে বেরিয়ে এল। দু জনে, অর্থাৎ সখারাম আর তিতাসী।

শীত এবার বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে। এখান থেকে সমুদ্র খুব দূরে নয়। দক্ষিণে মাইল পঞ্চাশেক গেলেই বঙ্গোপসাগর।

সমুদ্রের দিক থেকে হু-হু বাতাস ছুটে আসছে। কনকনে, হিম-হিম বাতাস। শীতের বাতাসে যেন দাঁত বেরিয়েছে। মুখ-হাত-পা, শরীরের যে অংশগুলি কাপড় দিয়ে ঢাকা যায় নি, সেগুলির ওপর বাতাসটা কেটে কেটে বসছে।

মোহনপুরের গঞ্জে লাল শালুর সামিয়ানার তলায় পালাগানের আসর বসেছিল।

গঞ্জটার শিয়র ঘেঁষে ইউনিয়ন বোর্ডের সড়ক। সড়কটা এঁকেবেঁকে রূপসী নদীর দিকে চলে গিয়েছে।

সখারাম আর তিতাসী সড়কে এসে উঠল।

খানিকটা আগে পালা ভেঙেছে। কিন্তু স্নায়ুগুলির ওপর তার রেশটা এখনও রয়েছে।

চলতে চলতে সখারাম বলল, 'দলটা বেশ গাইলে—'

তিতাসী অস্ফুট একটা শব্দ করল, 'হুঁ—'

'অনেকদিন এমন গান শুনি নি।'

শীতের সড়কটা কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে। আকাশে হয়তো চাঁদ আছে। কুয়াশা আর অন্ধকারের জন্য দেখা যাচ্ছে না।

সামনের দিকে একবার তাকাল সখারাম। কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

সড়কের গা ঘেঁষে উঁচু বাঁধ। অন্ধকারে বাঁধটার সীমাহীন-দেহ একটা আদিম পশুর মত পড়ে আছে। সড়কের একপাশে বাঁধ। আরেক পাশে কন্টিকারির ঝোপ আর বেঁটে বেঁটে গেমো গাছের বন। ঝোপ আর বন সড়কের সঙ্গে সমান্তরাল হয়ে পাশাপাশি নদীর দিকে চলেছে। মাঝে মাঝে তাল কেটেছে এক একটা অস্বাভাবিক লম্বা চেহারার তাল গাছ।

চাঁদ দেখা যাচ্ছে না। কুয়াশা আর অন্ধকারের স্তরের ওপারে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে আছে।

চাঁদ দেখা না যাক। কিন্তু তার যে আলো আছে, তিতাসীরা বুঝতে পারছে।

সে আলো এত নিস্তেজ, যা শীতের রাত্রির কোন কিছুকেই স্পষ্ট করে তুলতে পারে নি। অন্ধকার আর কুয়াশার সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে সব কিছুকেই রহস্যময় করে রেখেছে।

বেশ খানিকক্ষণ তারা চুপচাপ হাঁটল।

হঠাৎ একসময় সখারাম বলল, 'একটা কথা শুদোব ?'

'কী কথা ?'

মুখ তুলে সখারামের দিকে তাকাল তিতাসী।

'তোমার ভাই-বৌ পালা শুনতে এল নি কেন ?'

তিতাসী চুপ করে রইল। জবাব দিল না।

সখারাম বলল, 'কী, কথা কইচ না যে !'

'কী কইব ?'

'এত সাজগোজ করল তোমার ভাই-বৌ। আর বেরুবার মুখে বললে, আসবে না। কী হল, ঠিক বুঝতে পারলম নি।'

'মেয়েমানষের মন !'

তিতাসী বলতে লাগল, 'সে বড় বিষম জিনিস। মেয়েমানুষ নিজের মন নিজেই বোঝে না। পরে কেমন করে বুঝবে !'

একটু চুপচাপ।

তিতাসীই আবার শুরু করল, 'সেজেগুজে কেন সে এল না, তাকেই শুদিও। ঠিক জবাব পাবে।'

গেমো বনের ভেতর কী একটা পাখি যেন ডানা ঝাপটাল। দূরের তাল-গাছটার মাথায় একটা প্যাঁচা কর্কশ গলায় ডেকে উঠল। কন্টিকারির ঝোপে একরাশ জোনাকি অন্ধকারকে বিঁধে বিঁধে জ্বলল, নিবল।

বাঁধটা সড়কের গা ঘেঁষাঘেঁষি করে চলেছে তো চলেছেই। অন্ধকারে মনে হচ্ছে, বাঁধটার শেষ নেই।

একসময় তারা রূপসী নদীর পারে এসে পড়ল।

আসার সময় ছোট একটা নৌকোয় নদী পার হয়ে এসেছিল দুজনে। নৌকোটাকে বিন্নাবনের ভেতর লুকিয়ে রেখে তারা পালা শুনতে গিয়েছিল।

সখারাম বলল, 'তুমি এট্টু দাঁড়াও। আমি নৌকোটাকে নিয়ে আসি।'

হাঁটু সমান জলে নেমে বিন্নাবনের ভেতর থেকে নৌকোটাকে বার করে আনল সখারাম। ডাকল, 'এস—'

তিতাসী নৌকোয় এসে উঠল।

শীতের নদী নিঃস্রোত, তিরতিরে। তার বেগ নেই, ঢল নেই। এমন কি একটা ঢেউ পর্যন্ত না।

একটু আগে সমুদ্রের দিক থেকে বাতাস ছুটে আসছিল। বাতাসটা এখন পড়ে গিয়েছে।

খুব আস্তে, জলে প্রায় শব্দ না করে বৈঠে চালাচ্ছে সখারাম। ছোট নৌকোটা ভাসতে ভাসতে ওপারে, সায়েবঘাটের দিকে চলেছে।

নৌকোর ঠিক মাঝখানে কাঠের পাটাতনের ওপর বসে রয়েছে তিতাসী।

বৈঠে চালাতে চালাতে তিতাসীর দিকে একবার তাকাল সখারাম। মুখ, কালো পালকে-ঘেরা চোখ, ভুরু, ঠোঁট, হাত, হাতের আঙুল—আলাদা আলাদা করে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। অন্ধকার আর কুয়াশায় খুব অস্পষ্ট একটা নারী-দেহের আদল ছাড়া কিছুই বুঝতে পারল না সখারাম। তবু সে তাকিয়ে রইল।

তিতাসীও কি তার দিকে তাকিয়ে আছে? সখারাম নিজের মনকেই শুধলো। সঠিক জবাব মিলল না। একবার মনে হল, তাকিয়ে আছে। আবার মনে হল, না।

নৌকোয় ওঠার পর কেউ একটা কথাও বলে নি। ঠোঁটে কুলুপ এঁটে দু জনে চুপচাপ রয়েছে।

সখারাম ভাবছে, তিতাসীই আগে কথা বলবে। খুব সম্ভব, তিতাসীও ঐ একই কথা ভাবছে। সখারাম আগে বলবে।

ভাসতে ভাসতে নৌকোটা একসময় মাঝ নদীতে এসে পড়ল।

অসহ্য ঠাণ্ডা। গায়ের মোটা চাদরটাকে আরো ঘনিষ্ঠ করে জড়িয়ে নিল তিতাসী। নাক-ঠোঁট-মুখ—সব যেন অবোধ, অসাড় হয়ে গিয়েছে। বুকের কোন্ গভীর থেকে সির সির করে অদ্ভুত এক কাঁপুনি উঠে আসছে। হিমে মুখ-চোখ, মাথার চুল, এমন কি গায়ের চাদরটা পর্যন্ত ভিজে উঠেছে।

তিতাসীই প্রথম শুরু করল, 'বড্ড ঠাণ্ডা! একেবারে জমে গেলম। তাড়াতাড়ি নৌকোটাকে ওপারে নে চল।'

'হ্যাঁ—'

বারকতক ঘন ঘন বৈঠে চালাল সখারাম।

তিতাসী আবার বলল, 'হাত-পায়ে একদম সাড় নি। ঘরে ফিরে আগুন জেলে সেঁকতে হবে।'

খানিকটা চুপচাপ।

এতক্ষণ তিতাসীর দিকে তাকিয়ে ছিল সখারাম। এবার নদীটার দিকে তাকাল।

নদীটা এখন দুর্বোধ্য। তার গেরুয়া জলের রঙ বোঝা যাচ্ছে না। দু পারের শর আর বিন্নার বন দুটো সীমাহীন কালো রেখার মত কত দূর যে গিয়েছে, কে বলবে।

হেমন্তের শুরুতে নদীর ঠিক মাঝখানে একটা চর ফুটি-ফুটি করে। একটু একটু করে মাথা তুলতে তুলতে সেই চরটা এই শীতে তার বিপুল দেহ দিয়ে নদীর অনেকখানি জুড়ে বসে।

চরের বালুকণা এত অন্ধকারেও চিকচিক করে। ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাকি কোথা থেকে যেন উড়ে এসেছে। নদীর মাঝখানের এই চরটাকে ঘিরে তাদের নাচানাচির শেষ নেই। চর, জোনাকি, অন্ধকার, কুয়াশা, আবছা আবছা জল—সব মিলিয়ে শীতের নদীটা রহস্যময় হয়ে আছে।

খুক খুক করে একটু কাশল সখারাম। কেশে গলাটাকে সাফ করে নিল। তার পর ডাকল, 'তিতাসী—'

খুব আস্তে তিতাসী বলল, 'কী কইচ?'

'একটা কথা ভাবচি।'

'কী ভাবচ?'

তিতাসীর গলাটা ফিস ফিস করে উঠল।

'কতদিন হয়ে গেল তোমাদের এখেনে এসেচি।'

'তা অনেক দিন হল।'

মনে মনে তিতাসী হিসেব করল। তার পর বলল, 'সেই কাত্তিক মাসে ঝড়ের দিনে এসেচ। এটা পোষ। তা হলে কার্তিক, অঘ্রান, পোষ—এক, দুই, তিন—হ্যাঁ, পেরায় (প্রায়) তিন মাস হল।'

'তিন মাস!'

হঠাৎ একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল সখারাম। হাতের বৈঠেটা স্থির হয়ে গেল। একটু পর আবার সে বলল, 'তোমাদের এখেনে অনেক দিন কাটিয়ে দিলম।'

'কেন, আপসোস হচ্চে?'

'না, এতে আপসোসের কী আছে? তবে—'

'তবে কী?'

সখারামের দিকে একটু সরে এল তিতাসী।

'আমার স্বভাবের কথা তো শুনেচ।'

শব্দ করে হেসে উঠল সখারাম। একটু থেমে বলল, 'কোথাও যে দু-দিন থির হয়ে বসব, তা আমার ধাতে নি।'

তিতাসী বলল, 'কেন, এখেনে থাকতে তোমার ভাল লাগচে না?'

'ওই ছাখো!'

সখারাম ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'আমি কি সে কথা বলেচি!'

'সব কথা কি মুখ ফুটে বলতে হয়। আমরা কি কিছুই বুঝতে পারি না!'

ধরা ধরা অদ্ভুত গলায় তিতাসী বলতে লাগল, 'দিনরাত তোমায় খাটিয়ে নিচ্চি। এত বড় সোমসারের বোঝা তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েচি! আমাদের এখেনে তোমার কত কষ্ট। কষ্ট করতে কারু কি ভাল লাগে!'

'কী সব কইচ! মাথামুণ্ডু নেই কথার।'

সখারাম খুব বিব্রত হয়ে পড়ল। ক্ষুব্ধ গলায় সে বলল, 'তোমাদের সোমসারটাকে যদি বোঝাই ভাবতম, তা হলে কবে সরে পড়তম।'

একটু চুপ।

একসময় খুব গাঢ় গলায় তিতাসী বলল, 'জান, সবাই চায়, তুমি এখেনে থাক।'

'সবাই চায়!'

সখারামের গলাটা ফিস ফিস, আবেগে অস্থির।

'হ্যাঁ গো, সবাই চায়।'

তিতাসীর গলাটা কেমন যেন কাঁপা-কাঁপা।

কী একটু ভাবল সখারাম। তারপর বলল, 'সবাই চায়, শুধু একজন ছাড়া—'

'তাই নাকি?'

তিতাসীর গলায় অস্ফুট স্বর ফুটল।

হঠাৎ রিনরিনে একটু শব্দ হল। তিতাসী হাসল কি? সখারাম বুঝতে চেষ্টা করল।

খানিকটা সময় কেটে গেল।

উন্মুখ হয়ে বসে রইল সখারাম। কিন্তু না, তিতাসী আর কিছু বলল না। চুপ করে রইল।

একবার নদী আর একবার তিতাসীর দিকে তাকাল সখারাম। শীতের আবছা নদীটার মতই তিতাসীকে দুর্জ্ঞেয় মনে হতে লাগল।

॥ ২৪ ॥

সখারাম আসার পর কয়েকদিনের জন্য রানীর হাট চঞ্চল হয়েছিল। তিতাসীদের নামে দুর্নাম রটেছিল। আজান বুড়োর দোকানে জোর গুলতানি বসেছিল।

কামিনী-বৌরা সখারামকে নিজেদের ঘরে নিয়ে তুলেছে। রানীর হাটের বাসিন্দারা এটা খুব সুনজরে দেখে নি। তারু ঘড়ুই শাসিয়েছিল, কামিনী-বৌদের বিচার করবে।

আশ্চর্য!

এখন আর উত্তেজনা নেই, চাঞ্চল্য নেই। কয়েকদিনের জন্য রানীর হাটের ঢিমে তালের জীবন ক্ষুব্ধ হয়েছিল। এখন শান্ত হয়ে গিয়েছে।

এখানকার বাসিন্দারা তিতাসীদের সংসারের একজন হিসেবে সখারামকে মেনে নিয়েছে।

রানীর হাটের জীবনযাত্রা এখন আগের মতই নিরুত্তেজ, মন্থর, ক্লান্তগতি।

আজকাল প্রায়ই আজান বুড়োর দোকানে আড্ডা দিতে আসে সখারাম।

সখারামকে দেখলেই আজান বুড়োর বাঁ চোখটা কুঁচকে ছোট হয়ে যায়। ঠোঁটের ফাঁকে অদ্ভুত একটু হাসি ফোটে। দুই হাঁটুর মাথায় আঙুল দিয়ে তাল ঠোকে সে। বলে, 'আয় আয়, তোর কথাই ভাবছিলম।'

'আমার কথা!'

দোকানের সামনের দিকে বাঁশের মাচান। তার ওপর বসতে বসতে সখারাম বলে, 'হঠাৎ আমার কথা ভাবচ যে?'

জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করে আজান বুড়ো, 'তুই ই বল না, কেন তোর কথা ভাবচি?'

'কী করে কইব!'

অবাক চোখে তাকিয়ে রইল সখারাম।

পেল্লায় উনুনটার কাছে বসে থাকে আজান বুড়ো। হাঁটুর মাথায় অনেকক্ষণ তাল ঠোকে। গুজ গুজ করে একটু হাসে। তারপর বলে, 'ঠিক তোর কথা

ভাবচি না। তোর কপালটার কথা ভাবচি। কী একখানা কপাল নিয়েই না জন্মেছিলি! ভারি হিংসে হয়।'

'আমার আবার কপাল! তার জন্যে লোকের হিংসে! এমন কথা এই পেরথম (প্রথম) শুনলম।'

সখারাম শব্দ করে হেসে ওঠে।

আজান বুড়ো সামনের দিকে ঝুঁকে আসে। এ-সময়টা তাকে একটা হেঁতেল ঘুঘুর মত দেখায়। ফিস ফিস্ করে বলে, 'কপাল যদি ভাল না-ই হবে, দু-দুটো যুবুতী মেয়ের ভেতর সেঁদুলি (ঢুকলি) কী করে? গুরুদেব লোক তুই। রোজ এট্টু করে পায়ের ধুলো দে যাস।'

'কী যে কও—'

সখারাম যেন একটু লজ্জা পায়।

কোনদিন বা আজান বুড়ো বলে, 'দু-দুটো সোমত্ত ছুঁড়ী! তা, হ্যাঁরে সখারাম, কোন্‌টার সন্‌গে মজেচিস? বল না—'

'কী কইব?'

'কী আবার কইবি! যা শুদোচ্ছি, তার জবাব দিবি।'

'যাও, তোমার মুখে শুদু এক কথা! মেয়েছেলের কথা—'

'মেয়েছেলে ছাড়া পিরথিমীতে আর কিচু আছে যে অন্য কথা কইব?'

ঠোঁট টিপে টিপে হাসে আজান বুড়ো। তার পর হঠাৎ খুশিতে গেয়ে ওঠে—

'ধিনিক ধিনা, পাকা নোনা,
দুধে পড়ল গোরুর চোনা—'

সখারাম বলে, 'খুব ফুর্তি যে, একেবারে গান জুড়ে দিলে—'

'তা দিলম—'

আজান বুড়ো হাঁটুর মাথায় তাল ঠুকতে লাগল।

গুজ গুজ হাসি, গান, হাঁটুতে তাল ঠোকা, দিনরাত মেয়েমানুষের কথা বলা —এসবের মধ্যে আজান বুড়োর চরিত্রটা লুকিয়ে আছে।

আজান বুড়োর চরিত্রের অনেকখানিই বুঝে ফেলেছে সখারাম।

এক একদিন আজান বুড়ো সখারামকে হুঁশিয়ার করে দেয়। বলে, 'আই শুয়োটা—'

কারো ওপর খুশি হলে আদরে 'গুয়ে' বলে ডাকে সে।

সখারাম বলে 'কী কইচ?'

'খুব যে ডগমগ হয়ে আচিস্! কিন্তুক খুব সাবধান—'

'সবধানের কী হল?'

'আরে গুয়োটা, ঐ দুটো ছুঁড়ী তোকে শেষ করবে—'

'ছাখো বুড়ো, তুমি যা ভেবেচ তা ঠিক না। ওদের সন্গে আমার অন্য সম্পক্ক—'

'অন্য সম্পক্ক! হেঁ-হেঁ—'

খ্যাঁক খ্যাঁক করে খানিকটা হাসল আজান বুড়ো। তার পর বলল, 'আমাকে সম্পক্ক বোঝাতে আসিস নি ছোঁড়া। যুবুতী মেয়ের সন্গে জোয়ান ছেলের একটা সম্পক্কই হয়। সেই সম্পক্কটা যে কী, তা আমি বুঝি। অনেক বয়েস হয়েচে রে সখারাম। জানতে বুঝতে কিচু আর বাকী নি—'

সখারাম কী যেন বলতে যাচ্ছিল। তাকে থামিয়ে আজান বুড়ো বলতে লাগল, 'হুঁশ না থাকলে একেবারে দ'য়ে পড়বি সখারাম। বেরুবার আর পথ পাবি না।'

'এ-কথা কইচ কেন?'

'কইচি কি আর সাধে রে! উই যে শ্যামের বউ আর বোন, ওরা ভাল না।'

'কী করে বুঝলে?'

'সাত বচ্ছর হল শ্যাম লড়াইতে গেচে। ঘরে একটা পুরুষমানুষ নি। তুই আসার আগে অবদি (অব্ধি) কী করে ওদের সোমসার চলেচে, সে খপর জানিস্?'

'কেমন করে জানব?'

'সে খপর পরে আমার কাচে শুনিস। তবে এটুকুন শুনে রাখ, ওদের চরিত্তির ভাল না। সাত বচ্ছর ওদের আমি দেখচি।'

একটু থেমে আজান বুড়ো বলে, তাই কইচিলম, খুব সাবধান—'

জবাব না দিয়ে চুপ করে বসে থাকে সখারাম।

সখারামকে একদিন অবাক করে দিল আজান বুড়ো। তিতাসীদের কথা শুধোল না। মেয়েমানুষ সম্বন্ধে কোন অশ্লীল প্রসঙ্গ তুলল না। একেবারে নতুন কথা পাড়ল, 'আঁই সখারাম, তোর সন্গে আমার একটা দরকারী কথা আচে।'

'কী কথা ?'

'এতবড় পিরথিমীতে আপন কইতে আমার কেউ নি। বয়েসও অনেক হল। বেশীদিন বাঁচবও না।'

একদৃষ্টে সখারামের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল আজান বুড়ো। এক সময় আবার শুরু করল, 'তোরও তো কেউ নি। আমার কাচে এসে থাক না? এই বুড়োবয়সে আমার এট্টু দেখাশোনা করবি। মরার সময় এই দোকানখানা তোকে দিয়ে যাব।'

আজান বুড়ো বলে কী! বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেল সখারাম।

আজান বুড়ো তাড়া দিল, 'কী রে, মুখ বুজে বসে রইলি যে ?'

বিস্ময়ের ঘোরটা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারে নি সখারাম। আস্তে আস্তে সে বলল, 'কী কইব ?'

'ঐ যে শুদোলম, আমার কাচে এসে থাকবি তো ?'

কী করে থাকি বল ?'

এতক্ষণে ধাতস্থ হয়ে উঠছে সখারাম।

'কেন, অসুবিদেটা কী ?'

'ওদের সোমসারে আচি। ওরা আমার পেরান বাঁচিয়েচে। ওরা না ছাড়লে তোমার কাচে এসে থাকি কেমন করে ?'

নীরস গলায় আজান বুড়ো বলল, 'বুঝেচি।'

'কী বুঝেচ ?'

'ওদের ওজোর তুলচিস, আসলে তোরই আমার কাচে থাকার ইচ্ছা নি। থাকবিই বা কেন ? দু-দুটো যুবুতীর কাচে থাকার কত মজা! আমার এখেনে সে মজা তো নি। কী বলিস—আঁই—'

সখারাম জবাব দিল না। চুপ করে বসে রইল।

॥ ২৫ ॥

এক বিছানায় তিনজন শুয়েছে। তিনজন অর্থাৎ সুখী বুড়ী, তিতাসী আর কামিনী-বৌ।

ও-পাশে বেড়ার গা ঘেঁষে সুখী বুড়ী শুয়েছে। এ-পাশের ঝাঁপের কাছে তিতাসী। মাঝখানে কামিনী-বৌ।

এখন অনেক রাত।

ঘুমে বেহুঁশ হয়ে আছে সুখী বুড়ী। শীতে তার ছোট্ট শরীরটা কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে। নাকমুখ দিয়ে শ্বাসটানার ঘড়ঘড়ে আওয়াজ বেরিয়ে আসছে।

তিতাসী এখনও ঘুমোয় নি। বিছানায় এপাশ-ওপাশ করছে।

পাশের ঘরে সখারামও ঘুমোয় নি। একটার পর একটা বিড়ি ধরাচ্ছে, আর ফুক ফুক করে টানছে।

কে কী করছে, সব টের পাচ্ছে কামিনী-বৌ। তার চোখেও আজ ঘুম নেই। শীতের রাত, ভারী কাঁথার ভেতর উষ্ণ আরাম—ইচ্ছা করলে মসৃণ এক ঘুমে রাতটা কাবার করে দেওয়া যায়। কিন্তু কে জানে কেন, নিজের ত্রিসীমানায় ঘুমটাকে ঘেঁষতে দিচ্ছে না সে।

অনেকক্ষণ ছটফট করল তিতাসী। এক সময় ফিস ফিস গলায় ডাকল, 'এই ভাই-বৌ, এই—'

কামিনী-বৌ সাড়া দিল না।

কাছে এগিয়ে এল তিতাসী। কামিনী-বৌর মুখের ওপর ঝুঁকে বলল, 'ঘুমিয়ে পড়লি নাকি, এই—'

এবারও চুপ করে রইল কামিনী-বৌ।

একটু সময় চুপ করে রইল তিতাসী। অন্ধকারে কামিনী-বৌ আর সুখী বুড়ীর দিকে একবার তাকাল। এখন অনেক রাত আর প্রচুর শীত। নিশ্চয়ই ওরা ঘুমিয়ে পড়েছে। নিঃসন্দেহ হয়ে উঠে পড়ল তিতাসী। সন্তর্পণে, একটুও শব্দ না করে ঘরের ঝাঁপটা খুলে ফেলল।

ঘুমের ঘোরে বিড় বিড় করতে করতে হঠাৎ পাশ ফিরল সুখী বুড়ী।

তিতাসী চমকে উঠল। পড়েই যেত, হাতের সামনে ঝাঁপটা পেয়ে আঁকড়ে ধরল।

সুখী বুড়ীর এই এক রোগ। ঘুমের ঘোরে সে বিড় বিড় করে।

ঝাঁপটা ধরে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল তিতাসী। বুকের ভেতরটা ঢিব ঢিব করছে।

সুখী বুড়ী সমানে বিড় বিড় করছে।

খানিকটা পর সামলে উঠল তিতাসী। চমক ভাবটা এখন কেটে গিয়েছে। আস্তে আস্তে ঘরের ঝাঁপটা আটকে সে বেরিয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে কামিনী-বৌ উঠে পড়ল। ঝাঁপটার কাছে এসে টের পে

তিতাসী পাশের খুপরিটায় ঢুকেছে।

তিতাসী ডাকল, 'হেই গো ব্যাটাছেলে—'

চাপা গলায় সখারাম সাড়া দিল, 'হ্যাঁ—'

'জেগে আচ ?'

'আচি।'

একটু চুপচাপ।

হঠাৎ সখারাম বলল, 'খুব সাহস তো ?'

'কেন ?'

'এত রাতে উঠে এসেচ! কেউ টের পায় নি তো ?'

'না।'

ফিস ফিস গলায় তিতাসী বলল, 'মা আর ভাই-বৌ মড়ার মতন ঘুমুচ্চে। নাও চল—'

'কোথায় যাব ?'

'বাইরে।'

'এই শীতে বাইরে বেরুব!'

সখারামের গলাটা করুণ শোনাল।

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, তোমার সন্‌গে অনেক দরকারী কথা আচে।'

'তবে চল।'

পাশের খুপরি থেকে তিতাসী আর সখারাম বেরিয়ে পড়ল। পায়ের আওয়াজে বোঝা গেল উঠোন পেরিয়ে তারা ছাইটিবিটার দিকে চলেছে।

একটুক্ষণ অপেক্ষা করল কামিনী-বৌ। তার পর ঝাঁপ খুলে সে-ও বেরিয়ে এল।

বাইরে শীতের রাত্রিটা আচ্ছন্নের মত পড়ে আছে। কোথাও এতটুকু শব্দ নেই।

তিতাসীদের ঘর দুখানা, উঠোন, ছাইটিবি, দূরে কুঠির মাঠ, ফরাসীদের গির্জে, অনেক উঁচুতে কুয়াশা-বিলীন আকাশ—এখন যত দূর তাকানো যায়, সমস্ত কিছু একটা অথৈ ঘুমের ভেতর তলিয়ে রয়েছে।

ঘর থেকে দাওয়া। দাওয়া থেকে উঠোনে নেমে এল কামিনী বৌ। আতি পাঁতি করে চার পাশ খুঁজল। কিন্তু না, তিতাসী আর সখারামকে কোথাও পাওয়া গেল না।

একটু আগে দু জনের পায়ের শব্দ শুনেছে কামিনী-বৌ। এর মধ্যে তারা কোথায় উবে গেল।

তবে কি ?

হঠাৎ মনের ওপর একটা ভাবনার ছায়া পড়ল। তবে কী সবার ঘুমের সুযোগে তিতাসীকে নিয়ে সখারাম পালিয়ে গেল!

কামিনী-বৌ চমকে উঠল। এই মুহূর্তে কী করা উচিত, বুঝে উঠতে পারল না। এক বার ভাবল, সুখী বুড়ীকে ডেকে তোলে। কী ভেবে ডাকল না।

বিমূঢ় কামিনী-বৌ উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইল।

এখন মাঘমাসের শেষাশেষি। শীতের দাপট অনেক কমে এসেছে। আজকাল কুয়াশা আগের মত ঘন হয়ে পড়ে না।

ফিকে কুয়াশা অন্ধকারের সঙ্গে মিশে চারদিক রহস্যময় করে রেখেছে। আচমকা কোথায় যেন একটা রাতজাগা স্বৈরিণী পাখি ডানা ঝাপটাল। শব্দে ঘুরে দাঁড়াল কামিনী-বৌ। সঙ্গে সঙ্গে তার চোখে পড়ল।

ছাইটিবির পাশেই জামরুল গাছটা। পাতার ফাঁক দিয়ে চিকরি-কাটা ছায়া এসে পড়েছে। সেই ছায়ার মধ্যে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে আছে দু জন—সখারাম আর তিতাসী।

হঠাৎ অসহ্য এক কৌতূহল কামিনী-বৌকে পেয়ে বসল। গুটি গুটি পায়ে, বিড়ালীর মত নিঃশব্দে, ছাইটিবিটার মাথায় গিয়ে উঠল সে।

ছাইটিবির মাথায় একজোড়া পেঁপে গাছ। একটা গাছের গায়ে ঠেসান দিয়ে উদ্‌গ্রীব কামিনী-বৌ দাঁড়িয়ে রইল।

সখারাম আর তিতাসী ফিসফিস করছে। খিসখিসিয়ে হাসছে। শীতের রাতে রানীর হাট যখন ঘুমে বিভোর, জামরুলের চিকরি-কাটা ছায়ায় দুজনে মজে আছে।

ফিসফিসানিটাই শুনতে পাচ্ছে কামিনী-বৌ। কিন্তু ঠিক কী বলছে, বুঝতে পারছে না।

কামিনী-বৌ একবার ভাবল, এ বেশ ভালই হয়েছে। সখারাম যদি তিতাসীকে বিয়ে করে, তাদেরই লাভ। এ সংসারের সব দায় পাকাপাকিভাবে তার মাথায় চাপিয়ে দেওয়া যাবে। কিন্তু মন মানল না। অপার এক দুঃখ প্রাণের কোন্ গভীর থেকে উঠে আসতে লাগল।

এই ভাল। তিতাসীর বিয়ের বয়েস হয়েছে। আজ হোক, কাল হোক,

বিয়ে তার দিতেই হবে।

ভগবান যখন মিলিয়েই দিয়েছে, সখারামের সঙ্গেই তিতাসীর বিয়ে হোক। অন্যের সঙ্গে হলে এ-সংসারের কোন উপকারই হবে না। সখারামের সঙ্গে হলে তাদের সব দুঃখই ঘুচবে।

নিজেকে অনেক বোঝাল কামিনী-বৌ। কিন্তু মনটা বড় অবুঝ, অবোধ। কিছুতেই কি সে বুঝ মানবে?

তারই চোখের সামনে তিতাসী আর সখারাম—একজন আরেক জনকে মজাবে, জাদু করবে—এ সইতে পারছে না কামিনী-বৌ।

জামরুলের ছায়ায় দুজনকে দেখতে দেখতে কামিনী-বৌ ভাবল, চলে যাক সখারাম। রানীর হাট ছেড়ে যেদিকে খুশি চলে যাক।

সখারাম চলে গেলে তাদের সংসার প্রায় অচল হয়ে যাবে। আবার সেই দুঃখের দিন, সেই আধপেটা খাওয়া, সেই ছেঁড়া শাড়ি শেলাই করে পরা—তবু, তবু সখারাম চলে যাক। কামিনী-বৌ একটু শান্তি পাক। চোখের সামনে এ আর সে দেখতে পারছে না।

বুকের ভেতরে কোথাও কি একটা কাঁটা লুকিয়ে আছে? তিতাসী আর সখারামকে ঘনিষ্ঠ হতে দেখলেই কি সেটা বিঁধতে থাকে?

জামরুল গাছটার তলায় একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে কামিনী-বৌ ভাবল। ভাবল, আজ হোক, কাল হোক, যেমন করে হোক, সখারামকে রানীর হাট থেকে তাড়াবে সে।

॥ ২৬ ॥

সকাল হলেই পেল্লায় উনুনটার পাশে এসে বসে আজান বুড়ো। এটা তার দশ বছরের অভ্যাস।

অভ্যাসবশে আজও সে এসে বসেছে। সারা গায়ে একটা ময়লা কাঁথা জড়ানো। শীতে আজান বুড়োর ছোট্ট শরীরটা আরো ছোট আর কুঁজো হয়ে গিয়েছে।

চোখ দুটো টকটকে লাল। ঘোর ঘোর, আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে সামনের সড়কটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে আজান বুড়ো।

অন্য অন্য দিন এ-সময়টা তার দোকানে ভিড় লেগে যেত। তার বন্ধুই,

লোটন কুঞ্জ—সবাই চা খেতে আসত। চা খেয়ে খানিকটা আড্ডা দিয়ে যে যার কাজে চলে যেত।

কিন্তু দু দিন হল উনুন জ্বালছে না আজান বুড়ো। খদ্দের পত্তরও আসছে না।

দু দিন ধরে জ্বরে ভুগছে সে। জ্বরটা একেবারে ছেড়ে যাচ্ছে না। সকালের দিকে একটু কমে। কিন্তু বেলা যেই চড়ে, জ্বরও বাড়তে থাকে।

দু দিনের জ্বরে খুব কাহিল হয়ে পড়েছে আজান বুড়ো। মাথা খাড়া রেখে বসে থাকতে পারছে না। মাথাটা অল্প অল্প কাঁপছে।

মাত্র দু দিনের জ্বরে মানুষ এতটা কাবু হয়ে পড়ে না। কিন্তু আজান বুড়োর শরীরটা বড় অশক্ত, বড় দুর্বল। এবং তার ভেতরে কত জাতের আদি ব্যাধি যে রয়েছে, কে তার হিসেব রাখে। জ্বরের সামান্য একটা উপলক্ষ্য পেয়ে শরীরটা বিকল হয়ে পড়েছে।

এমনিতেই সারা শীতকালটা খুব কষ্ট পায় আজান বুড়ো। তার বুকের ভেতর একটা বনেদী রোগ বাসা বেঁধে আছে। রোগটার নাম হাঁপানি। যখন হাঁপানির টান ওঠে, শরীরটা বেঁকে ধনুকের মত হয়ে যায়। শ্বাসটা আটকে আটকে আসতে থাকে। মনে হয়, পাঁজরের সরু সরু, জীর্ণ হাড়গুলো ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।

এখন সকাল।

অনেকক্ষণ উনুনটার পাশে বসে রয়েছে আজান বুড়ো। বসে থাকতে থাকতে কোমরটা টন টন করছে। ঘাড় ভেঙে মাথাটা বারবার সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ছে।

আজ শুধু অভ্যাসবশেই উনুনটার পাশে এসে বসে নি আজান বুড়ো। ঘরে একটু সাবু কি বার্লি নেই। সামনের সড়কটা ধরে অনেকেই হাটে যায়। তাদের কারুকে ধরে একটু সাবু আনিয়ে নেবে। এই আশায় সে বসে রয়েছে।

কিন্তু না, কারুকেই দেখা যাচ্ছে না। রানীর হাটের মানুষগুলো আজ যেন জেদ ধরেছে, এদিকে আসবে না।

বেশ খানিকটা আগে রোদ উঠেছে। কিন্তু শীতের রোদের তেজ নেই। তাপ নেই। কেমন যেন নিরুত্তেজ, নির্জীব।

গেরুয়া নদীটা স্থির হয়ে রয়েছে। এক ঝাঁক সুরুলে পাখি উড়তে উড়তে আকাশের নীল ছুঁয়েছে। নীলের ওপারের রহস্যটাকে তারা বুঝি দেখে আসতে চায়।

কোনদিকে লক্ষ্য নেই আজান বুড়োর।

হঠাৎ একসময় হাঁপানির টান উঠল। কাশতে কাশতে আজান বুড়োর মনে হল, রুগ্ণ পঙ্গু দেহটা মুচড়ে দুমড়ে দলা পাকিয়ে যাবে। বুকের ভেতর থেকে জলহীন হুঁকো টানার মত একটা সাঁ সাঁ আওয়াজ বেরিয়ে আসতে লাগল।

অনেকক্ষণ কাশল আজন বুড়ো। কাশল আর হাঁপাল। কেশে কেশে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে শরীরটা ক্লান্ত হয়ে পড়ল।

মাথাটা এখন ঝিম ঝিম করছে। কিছুই দেখতে পাচ্ছে না সে, কিছুই বুঝতে পারছে না। গেরুয়া নদী, রোদ, সামনের সড়ক, সুরুলে পাখি—সব কিছু নিরাকার হয়ে অথৈ এক অন্ধকারে তলিয়ে যেতে লাগল।

এখন বেশ খানিকটা বেলা হয়েছে। জ্বরও বাড়তে শুরু করেছে। আজান বুড়োর মনে হল, পেল্লায় উনুনটার পাশে বসে থাকা আর নিরাপদ নয়। মাথাটা যা কাঁপছে, যে কোন সময় সে পড়ে যেতে পারে।

উনুনটা থেকে একটু দূরে একটা বাঁশের মাচান। তার ওপর ছেঁড়া এক বালিশ আর অনেকগুলো ময়লা কাঁথা স্তূপাকার হয়ে আছে। এটাই তার বিছানা।

প্রাণ বাঁচাবার অন্ধ আর জৈব তাগিদে ধুঁকতে ধুঁকতে নীচে নেমে পড়ল আজান বুড়ো। তার পর হামাগুড়ি দিয়ে একসময় বিছানার ওপর উঠল। উঠেই নির্জীব হয়ে পড়ে রইল। শুধু শ্বাস টানার অস্বাভাবিক তাড়নায় বুকটা দ্রুত তালে ওঠানামা করতে লাগল।

স্নায়ুগুলো ঝিমিয়ে পড়ছে। নিবিড় আর গভীর এক ঘুম শরীরের অনুভূতিগুলিকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে আজান বুড়ো একবার ভাবল, মাত্র একবারই সে ভাবতে পারল, এত বড় পৃথিবীতে সে বড় একা, বড় নিঃসঙ্গ। তার পাশে কেউ নেই।

কতক্ষণ যে আচ্ছন্নের মত পড়ে ছিল, হুঁশ নেই। হঠাৎ একসময় আজান বুড়োর মনে হল, কে যেন খুব ঠাণ্ডা একটা হাত তার কপালে রেখে শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

জ্বরের ঘোরেই চোখ মেলল আজান বুড়ো। প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারল না। অস্পষ্ট গলায় বলল, 'কে?'

'আমি—সখারাম।'

'সখারাম, সখারাম—'

বারকতক বিড় বিড় করল আজান বুড়ো। এমনভাবে তাকিয়ে রইল, যেন সখারামকে চিনতেই পারছে না।

আজান বুড়োর মুখের ওপর ঝুঁকে নরম গলায় সখারাম শুধলো, 'খুব কষ্ট হচ্চে ?'

আজান বুড়ো জবাব দিল না। তাকিয়েই রইল।

সখারামও আর কিছু বলল না। বিছানাটার একধারে বসে আস্তে আস্তে আজান বুড়োর বুকে আর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

একটু পর আচ্ছন্ন ভাবটা অনেকখানি কাটিয়ে উঠল আজান বুড়ো। এবার সখারামকে সে চিনতে পেরেছে। নির্জীব গলায় সে বলল, 'তুই সখারাম—'

'হ্যাঁ—'

দু হাতে ভর দিয়ে উঠে বসতে চাইল আজান বুড়ো। সখারাম ব্যস্ত হয়ে উঠল। তাকে উঠতে দিল না। হাত ধরে আস্তে আস্তে শুইয়ে দিল। বলল, 'উঠো না। এত জ্বর—উঠলে মাথা ঘুরে পড়ে একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসবে।'

আজান বুড়ো কিছু বলল না।

সখারামই আবার শুরু করল, 'এখেন দিয়ে যাচ্ছিলম। তোমায় দেখতে না পেয়ে ঘরে ঢুকলম। ঢুকে দেখি, তুমি শুয়ে শুয়ে গেঙাচ্চ (গোঙাচ্ছ)। কাছে এসে গায়ে হাত দিলম। দেখি, গা তোমার পুড়ে যাচ্চে।'

সখারামের একটা হাত নিজের দুর্বল মুঠির ভেতর চেপে ধরল আজান বুড়ো। ফিস ফিস গলায় বলল, 'তুই তো তবু এলি! দু দিন ধরে জ্বরে ভুগচি। মরেচি কি বেঁচে আচি, কেউ একবার এসে খোঁজটাও নে যায় না।'

একটু চুপ।

হঠাৎ আজান বুড়ো ডাকল, 'সখারাম—'

'বল।'

'তুই কি আজ হাটে যাবি ?'

'হাটে যাব কি গো!'

একটুক্ষণ অবাক হয়ে রইল সখারাম। তার পর বলল, 'হাট ঠেঙে এইমাত্তর তো ফিরে এলম।'

'বলিস কী! এখন তা হলে কত বেলা ?'

'বেলা আর নি। এটু পরে সনঝে হয়ে যাবে।'

আজান বুড়ো বলল, 'আমি তো কিছুই টের পাই নি।'

'টের পাবে কেমন করে। জ্বরের তাড়সে সারাদিন তো বেহুঁশ হয়ে পড়ে আচ।'

কী একটু যেন ভাবল আজান বুড়ো। তারপর করুণ গলায় বলল, 'বড্ড খিদে পেয়েচে। সারাদিন পেটে কিছু পড়ে নি। এট্টু সাবু কি বার্লি যদি পেতম—'

'সারাদিন কিছু খাও নি! আচ্ছা, তুমি এট্টু একলা থাক। আমি তোমার খাবার নিয়ে আসচি।'

সখারাম বাইরে বেরিয়ে গেল।

একটু পরেই সন্ধ্যে নামবে। দিনের শেষ আলোটুকু ঘুড়ির সুতোর মত কে যেন অদৃশ্য লাটাইতে গুটিয়ে নিতে শুরু করেছে। সারাদিন পাখিতে পাখিতে আকাশটা জমকালো হয়ে থাকে। একটি দুটি করে পাখিরা এখন যে যার আশ্রয়ে ফিরে যেতে শুরু করেছে। একটু পরে আকাশে আর একটা পাখিও থাকবে না।

সন্ধ্যের মুখে মুখে সখারাম ফিরে এল। প্রকাণ্ড একটা কলাইর বাটি ভর্তি করে সে সাবু এনেছে।

চোখ বুজে পড়ে ছিল আজান বুড়ো। সখারামের ডাকাডাকিতে তাকাল। বলল, 'এনেচিস—'

'হ্যাঁ।'

সখারাম বলল, 'তোমার জন্যে সাবু জ্বাল দিয়ে এনেচি।'

আজান বুড়ো কিছু বলল না। বলতে পারল না। কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে সখারামের দিকে তাকিয়ে রইল। সখারাম তার আত্মীয় না, বান্ধব না, কেউ না। তার সঙ্গে ক'দিনেরই বা পরিচয়! তবু এই প্রায় অপরিচিত, অনাত্মীয় মানুষটা তার বিপদের দিনে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সাধ্যমত তার সেবা করছে।

অথচ দশ বছর সে এই রানীর হাটে কাটিয়ে দিল। এখানকার বাসিন্দা-দের সঙ্গে তার কত দিনের আলাপ, কত কালের ঘনিষ্ঠতা। সে ভাবত, এদের সবাই তার আপন জন। বিপদের দিনে, দুঃখের দিনে সবাই তার কাছে আসবে। কিন্তু তাদের কেউ একবার এসে উঁকি দিয়েও দেখল না। তার একটা খোঁজ পর্যন্ত নিল না।

রানীর হাটের বাসিন্দাদের সম্বন্ধে তার মনে কী ধারণাই না ছিল! কিন্তু আজ সেই ধারণাটা একটা মাটির বাসনের মত ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে।

আজান বুড়োর এই জ্বর রানীর হাটের বাসিন্দাদের স্বরূপটা চিনিয়ে দিয়েছে। আশ্চর্য! এদের ওপর নির্ভর করে জীবনের এতগুলো বছর সে এখানে কাটিয়ে দিল! ভাবতে কেমন যেন তাজ্জব লাগে।

এই দশ বছরে হাঁপানি আর পুরনো দু-চারটে রোগ ছাড়া, সাঙ্ঘাতিক কোন অসুখ হয় নি আজান বুড়োর। হলে, এতদিনে রানীর হাটের মানুষ-গুলোকে সে চিনে ফেলতে পারত।

আজান বুড়োর দোকানের ভেতরটা অন্ধকার হয়ে গিয়েছে।

সখারাম ডাকল, 'শুনচ—হেই গো—'

'কী কইচিস?'

'সাবুটুকু খেয়ে নাও।'

'খাচ্চি। আগে একটা আলো জ্বাল দিকি সখারাম। বড্ড আঁধার। কিছু দেখতে পাচ্চি না।'

'আলো তো জ্বালব। কিন্তুক টেমি কোথায়, দেশলাই কোথায়?'

'সব উই উনুনটার কাছে আচে।'

খুঁজে খুঁজে দেশলাই আর টেমি বার করল সখারাম। আলো জ্বালল। তার পর আজান বুড়োর কাছে এল। তার পিঠের তলায় আলগোছে একটা হাত রেখে আস্তে আস্তে উঠিয়ে বসাল।

সাবুর বাটিটা মুখের কাছে ধরতেই করুণ গলায় আজান বুড়ো বলল, 'কত সাবু এনেচিস সখারাম! এত খেতে পারব না।'

'এটুকু খেয়ে নাও দিকি। পেট পুরে না খেলে রোগের সনগে যুঝবে কেমন করে? নাও, খেয়ে নাও।,

আর কথা বাড়াল না আজান বুড়ো। চোঁ চোঁ করে একটানে সাবুটুকু শেষ করে ফেলল।

আজান বুড়োর মুখ মুছিয়ে আবার শুইয়ে দিল সখারাম।

আজান বুড়ো বলল, 'সাবু খেয়ে বাঁচলম।'

একটু থেমে আবার, 'আর জন্মে তুই আমার মা'র পেটের ভাই ছিলি সরাখাম। তুই না এলে আমার কী যে হত!'

'আ, চুপ কর দিকি।'

আস্তে একটা ধমক দিল সখারাম।

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, চুপ করচি। তুই আমার কাচে এসে বোস দেখি।'

কথামত তার পাশে এসে বসল সখারাম।

আজান বুড়ো বলল, 'বুকটা জ্বলে যাচ্চে। এট্টু হাত বুলিয়ে দিবি সখারাম?'

'দিচ্চি। তুমি এবেরে চুপ কর দিকি। আর একটা কথাও কইতে পারবে না।'

'আচ্চা—আচ্চা—এই চুপ করলম।'

পরম স্নেহে আজান বুড়োর রোগ-জিরজিরে, শুকনো বুকে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল সখারাম।

সখারাম তাকে কথা বলতে বারণ করেছে। চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করল আজান বুড়ো। কিন্তু পারল না। বুকের কোন গভীরে একটা স্নেহলোভী, স্পর্শাতুর প্রাণ বার বার মুখর হয়ে উঠতে চাইল।

ভয়ে ভয়ে আজন বুড়ো ডাকল, 'সখারাম—'

'না, তোমাকে নিয়ে পারা যাবে না।'

হাল ছেড়ে হেসে ফেলল সখারাম। বলল, 'বল, কী বলবে—'

'দশ বছর রানীর হাটে আচি। তোর মতন এমন করে কেউ আমার বুকে হাত বুলিয়ে ছায় নি।'

'এই কথা!'

'না, আরো আচে। কইব?'

'কও। মনের সাধ মিটিয়ে বক বক কর।'

'দশ বছর আগে আর একজন তোর মতন এমনি করে আমার বুকে হাত বুলিয়ে দিত। একদিন তার সনগে সব সম্পক্ক চুকিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লম। তার পর এখেনে-ওখেনে বার ঘাটের জল খেয়ে রানীর হাটে এসেচি।'

আজান বুড়োর দুর্বল বুকের ভেতর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। অনেকক্ষণ চুপ করে রইল সে। তারপর খুব আস্তে বলল, 'তার কথা শুনবি সখারাম?'

আগ্রহে তার গলাটা কাঁপতে লাগল।

সখারাম জবাব দিল না।

আজান বুড়ো কী বুঝল, সে-ই জানে। ভীরু গলায় বলল, 'আই সখারাম রাগ করলি?'

'রাগ করি আর যাই করি, কথা তো তুমি থামাবে না।'

'এই মুখে কুলুপ আঁটলম। আর একটা কথাও বলব না। ভগমানের দিব্যি।'

এখন বেশ খানিকটা রাত হয়েছে। কুয়াশা আর অন্ধকার পৃথিবীর সব কিছু থেকে আজান বুড়োর এই ছোট্ট চায়ের দোকানটাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে।

হাত বুলোতে বুলোতে সখারাম চমকে উঠল। একবার আজান বুড়োর মুখের দিকে তাকাল সে। আজান বুড়োর চোখ দুটো বোজা।

সন্তর্পণে টেমিটা সামনে নিয়ে এল সখারাম। যা সে সন্দেহ করেছিল, ঠিক তাই। আজান বুড়োর বুকটা বসন্তের গুটিতে ছেয়ে গিয়েছে। শুধু বুক কেন, হাত-মুখ-কপাল—সমস্ত দেহে ছোট ছোট আসংখ্য গুটি উঠছে। সখারাম শিউরে উঠল।

আজান বুড়ো ঘুমোয় নি। সখারাম টেমিটা কাছে আনতেই সে চোখ মেলল। বলল, 'অমন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমার গায়ে কী দেখছিস?'

কী বলবে, সখারাম ঠিক বুঝে উঠতে পারল না।

আজান বুড়ো আবার বলল, 'কী রে, চুপ করে রইলি যে—'

বসন্তের কথাটা আজান বুড়োকে জানানো উচিত হবে কি? নিজের মনকেই শুধলো সখারাম। একবার ভাবল, বলেই ফেলে। পরক্ষণেই ভাবল, না বলবে না।

আস্তে আস্তে হাতের ভর দিয়ে উঠে বসল আজান বুড়ো। নিজের খসখসে গায়ে হাত বুলাল। তার পর খুব শান্ত গলায় বলল, 'মায়ের দয়া হয়েচে সখারাম।'

বলেই হাসল।

সখারাম জবাব দিল না।

আজান বুড়ো তার পর শুরু করল, 'আগে বুঝতে পারি নি। এই জন্যেই বুঝি কেউ আমার কাছ ঘেঁষচে না!'

সখারাম বলল, 'বকবকানি থামিয়ে শুয়ে পড় দিকি—'

আজান বুড়ো শুল না। কথাও থামাল না। সখারামের গায়ে মৃদু একটা ঠেলা মেরে বলল, 'আঁই—'

'বল।'

'তুই চলে যা।'

'কেন ?'

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল সখারাম।

'বড্ড ছোঁয়াচে রোগ।'

সরারামের একটা হাত ধরে বলল, 'যা দাদা, যা।'

সখারাম গেল না। যেমন বসেছিল, তেমনিই রইল। ভাবগতিক দেখে মনে হল, সে যাবে না।

'গুয়োটা আমার জন্যে মরবি নাকি ?'

আজান বুড়োর গলায় উদ্বেগ ফুটল।

'মরব কি বাঁচব, সে কথা আমাকেই ভাবতে দাও।'

'গোঁয়াত্তমি করিস নি সখারাম।'

'আ, চুপ করে শোও দিকি।' ব্যারাম হলে মানষে কোথায় চুপ করে পড়ে থাকবে, তা না। এর আচে শুধু বক বক—'

বিরক্ত গলায় গজ গজ করতে লাগল সখারাম।

আর একটা কথাও বলল না আজান বুড়ো। চুপচাপ শুয়ে পড়ল। সখারাম তিনটে মোটা ভারী কাঁথা তার গায়ে চাপিয়ে দিল।

ঘরটার মাথায় গোলপাতার চাল। তিন পাশে হোগলার বেড়া। সামনের দিকে বাঁশের বাতার ঝাঁপ।

বেড়া আর চালের ফাঁক দিয়ে সরু সরু ধোঁয়ার রেখার মত কুয়াশা ঢুকছে। বাইরে শীতের রাত্রিটা অসাড় হয়ে পড়ে রয়েছে।

ফুঁ দিয়ে টেমিটা নিবিয়ে দিল সখারাম। তার পর আজান বুড়োর গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

সমস্ত রাত আজান বুড়োর শিয়রে বসে ছিল সখারাম। ভোরের দিকে তন্দ্রামত এসেছিল। ঢুলতে ঢুলতে কখন যে সে পাশের মাচানটায় গিয়ে শুয়ে পড়ে ছিল, হুঁশ নেই। শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের ঘুম তার দু চোখে ভেঙে পড়েছিল।

গোঙানির আওয়াজে হঠাৎ ঘুমটা ছুটে গেল। ধড়মড় করে উঠে বসল সখারাম।

ও-পাশের মাচানে ছটফট করছে আজান বুড়ো। টেনে টেনে অদ্ভুত শব্দ করে গোঙাচ্ছে। বুকটা হাপরের মত ওঠানামা করছে। শ্বাস টানতে কষ্ট হচ্ছে।

তাড়াতাড়ি আজান বুড়োর কাছে এল সখারাম তার কপালে একটা হাত রেখে শুধলো, 'কী হয়েচে ?'

'বড্ড কষ্ট সখারাম, বড্ড কষ্ট—'

গলার স্বর শুনেই চমকে উঠল সখারাম। এক রাত্রেই গলাটা বসে গিয়েছে।

বাইরে সকাল হয়েছে। গেরুয়া নদীর ওপর দিনের প্রথম রোদ এসে পড়েছে। আজান বুড়োর কপাল থেকে হাতটা সরিয়ে নিল সখারাম। তারপর দোকানের ঝাঁপটা খুলে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভেতর শীতের নরম রোদ এসে পড়ল।

দুটো হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে ভাঙা-ভাঙা বসা গলায় আজান বুড়ো চেঁচিয়ে উঠল, 'সখারাম—সখারাম—'

পেছন ঘুরে সখারাম বলল, এই তো আমি—'

'কোথায় ?'

'এই তো দোকানের ঝাঁপ খুললম।'

'আমার কাচে আয় দাদা।'

'ঝাঁপটা বেঁধে রেখে যাচ্চি।'

কাছে আসতেই দু হাতে তাকে জড়িয়ে ধরল আজান বুড়ো। তার পর ফুঁপিয়ে উঠল। রুগ্ণ, বিকল দেহটা ফোঁপানির আবেগে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল।

নরম গলায় সখারাম বলল, 'কাঁদচ কেন ?'

এতক্ষণ ফোঁপাচ্ছিল। এবার হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল আজান বুড়ো। ধরা-ধরা গলায় বলল, 'আমি আর বাঁচব না সখারাম।'

'আরে বাঁচবে, বাঁচবে—'

সখারাম আশ্বাস দিতে লাগল, 'রোগ হলেই কি মানুষ মরে নাকি ? রোগ যেমন হয়, তেমনি সেরেও যায়। কেন মিছিমিছি ভয় পাচ্চ !'

'মিছিমিছি না—'

আজান বুড়ো শান্ত গলায় বলল, 'মরণ দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েচে। আমাকে সে নেবেই। মরতে তো ভয় পাই না। কিন্তুক শেষবারের মতন তাকে যদি একবার দেখতে পেতম—'

আজান বুড়োর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ল সখারাম। শুধলো, 'কাকে দেখতে চাও ? বল—'

'সেই দশ বচ্ছর আগে যার সনগে সব সম্পক্ক চুকিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলম।'

'ঠিকানা দাও। তাকে নে আসচি।'

'ঠিকানা!'

অদ্ভুত একটু হাসল আজান বুড়ো।

এমন অনেক হাসি আছে, যাদের আসল মানে কান্না। আজান বুড়োর হাসিটা অবিকল সেই জাতের।

একটু থেমে সে বলল, দশ বছর আগে তার ঠিকানা জানতম। এখন জানি না। এত বড় পিরথিমীতে কোথায় সে আচে, কেমন করে দিন কাটাচ্চে, ভগবান জানে।'

এর পর কেউ আর কিছু বলল না। না সখারাম, না আজান বুড়ো।

অনেকটা সময় কেটে গেল।

একসময় আজান বুড়ো ডাকল 'আঁই সখারাম—'

'বল।'

'এখন বুঝি অনেক রাত? অজকের রাতটা বড্ড আঁধার। কিছুই ঠাওর (ঠাহর) করতে পাচ্চি না।'

'রাত! কী বলচ গো—'

সখারাম অবাক হয়ে গেল।

'কেন, কী হল!'

'রাত কখন পুইয়ে গেচে। ঘরের ভেতর রোদ এসে পড়েচে।'

'রাত পুইয়ে গেচে!'

আজান বুড়ো ভাঙা গলায় ককিয়ে উঠল, 'কিন্তুক আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্চি না সখারাম!'

'আমাকে দেখতে পাচ্চ না!'

সখারামের গলার স্বরটা চমকে উঠল।

'না, দেখতে পাচ্চি না। সব আঁধার সখারাম, সব আঁধার—'

হাতড়ে হাতড়ে সখারামের একটা হাত খুঁজে বার করল আজান বুড়ো। সেটা দু হাতে আঁকড়ে ধরল।

গুটিগুলো কেমন হয়েছে, বুঝবার জন্য আজান বুড়োর গা থেকে কাঁথার ঢাকনি সরিয়ে দিল সখারাম। আজ আর তার দিকে তাকানো যাচ্ছে না। শরীরের কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই। মুসুর দানার মত ছোট ছোট লক্ষ লক্ষ

গুটি আজান বুড়োর থসথসে, ঢিলে চামড়া ঢেকে ফেলেছে।

শুধু কী চামড়ার ওপর, সখারাম আন্দাজ করল, জিভে তালুতে-গলার ভেতর, এমন কী চোখের তারায় পর্যন্ত গুটি উঠেছে। এই গুটিগুলো তাকে অন্ধ করে ফেলেছে।

সখারামের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। কাঁথা দিয়ে আজান বুড়োর শরীরটা ঢেকে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল সে।

এখন কী করবে, কী করা উচিত, ঠিক বুঝে উঠতে পারল না সখারম। হঠাৎ একজনের কথা তার মনে পড়ল। সেই একজন—হ্যালিডে সায়েব।

রোগের চিকিৎসা, রুগীর সেবা—হ্যালিডে সায়েবের কাছে গেলে সব ব্যবস্থাই হবে।

সখারাম উঠে পড়ল। বলল, 'আমি এট্টু বেরুচ্চি, খানিক বাদে ফিরব।'

থ্যাসথেসে, করুণ গলায় কেঁদে উঠল আজান বুড়ো। বলল, 'বুঝেচি—'

'কী বুঝেছ?'

'তুই ভয় পেয়েচিস। আমায় ফেলে পালিয়ে যাচ্চিস। কিন্তু আমার যে আর কেউ নি সখারাম। তুই আমায় ফেলে যাস নি।'

আশ্চর্য! এই আজান বুড়োই কাল রাত্রে তাকে চলে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করেছিল! আজ তাকে ছাড়তে চাইছে না।

সখারাম বলল, 'ডর নি। তোমায় ফেলে যাব না। ঘরে বসে থাকলে তো রোগ সারবে নি। ডাক্তার বদ্যি ডাকতে হবে। ওষুধ-পথ্যির বেবোস্থা করতে হবে। তুমি এট্টুখানি একলা থাক। আমি যাব আর আসব।'

'আসবি তো?'

'আসব—আসব, নিঘ্যাৎ আসব। ভগমানের দিব্যি।'

আজান বুড়োকে বুঝিয়ে, শান্ত করে সখারাম বেরিয়ে পড়ল।

॥ ২৭ ॥

প্রথমেই ভাঙা গির্জে-বাড়িটায় এল সখারাম। কিন্তু না, হ্যালিডে সায়েবকে পাওয়া গেল না। একবার ভাবল স্কুলে গিয়ে তার খোঁজ নেয়।

গির্জে থেকে বেরুলেই কুঠির মাঠ। অন্যমনস্ক হয়ে হাটতে লাগল সখারাম।

দিনের বয়স বাড়তে শুরু করেছে। বয়স যতই বাড়ুক, শীতের দিনের তাপ

নেই, তেজ নেই। এখনও মাটের ঘাসে মুক্তোর দানার মত কুয়াশা টল টল করছে।

পথে লোটনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সে শুধলো, 'উদিকে কোথায় গেছলে?'

'সায়েব খুড়োর কাচে।'

'সায়েব খুড়ো তো এখেনে নি। দু দিন হল কলকাতায় গেচে। কবে ফিরবে, ঠিক নি।'

'ও।'

বিষণ্ণ গলায় সখারাম বলল, 'বড্ড মুস্কিল হল দেখচি। আচ্ছা, বলতে পার, এখেনে কোন ডাক্তার-কোবরেজ আছে কি না?'

লোটনকে নিরুৎসাহ দেখাল। সে বলল, 'না, দশ কোশের মধ্যে কেউ নি। তবে সায়েব খুড়োর হাসপাতালে সদর ঠেঙে একজন ডাক্তারবাবু আসে। সে-ও হপ্তায় একদিন। মঙ্গলবার মঙ্গলবার আসে। আজ হল গে তোমার বুধবার। আসচে হপ্তায় ফিরে মঙ্গলবার সে আসবে।'

'তাই তো, এখন কী করি!'

অসহায় গলায় বিড় বিড় করল সখারাম।

ডাক্তার কী জন্যে দরকার, সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই লোটনের। সখারামের গা ঘেঁষে অন্তরঙ্গ গলায় সে বলল, 'আমার কথাটা মনে আচে তো সখাদাদা—'

'কী কথা?'

'ঐ দ্যাখো, কী ভুলো মন তোমার! সেদিন তোমায় যে বললম, একটা যাত্রার দল খুলচি। তোমায় মূল গায়েন করে নোব। মনে পড়চে?'

আরো একটু ঘন হয়ে এল লোটন। গাঢ় গলায় বলল, 'আমার দলে আসচ তো?'

'এখনো কিছু ভাবি নি। ভেবে পরে বলব।'

আর দাঁড়াল না সখারাম। লোটনকে পেছনে রেখে হন হন করে হাঁটতে শুরু করল।

হাঁটতে হাঁটতে একসময় সে তিতাসীদের বাড়ি এসে উঠল।

এখন সূর্যটা অনেকখানি ওপরে এসে উঠেছে। জামরুল আর পেঁপে গাছের মাথায় রোদ পড়েছে।

শীতের রোদে জ্বালা কম, জেল্লা বেশি। জামরুলগাছের সবুজ পাতাগুলি চিক চিক করছে।

কামিনী-বৌ উঠোন নিকোচ্ছে। দাওয়ার এক কোণে বসে চাল থেকে ধান আর কাঁকর বাছছে তিতাসী। সুখী বুড়ীকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

বসে বসে উঠোন নিকোচ্ছিল কামিনী-বৌ। সখারামকে দেখে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'কাল সেই যে সাবু নিয়ে গেলে, তার পর আর ফিরলে না। মাঝরাত অবদি (পর্যন্ত) তিতাসী আর আমি জেগে বসে আচি—'

'কী করব!' সখারাম বলল, 'সমস্ত রাত আজান বুড়োর কাচে বসে কাটাতে হল। খুব জ্বর, তার ওপর সারা গায়ে মায়ের দয়া বেরিয়েচে।'

'মায়ের দয়া!'

কামিনী-বৌ আঁতকে উঠল।

'হ্যাঁ—সারা গা ছেয়ে গেচে। চোখেও গুটি উঠেছে। কিছু দেখতে পাচ্চে না আজান বুড়ো। একেবারে আঁধা (অন্ধ) হয়ে গেচে।'

আর কিছু বলল না কামিনী-বৌ।

সখারাম আবার শুরু করল, 'একটা কাজ করে দেবে ?

'কী কাজ ?'

'আজান বুড়োর জন্যে এট্টু সাবু ফুটিয়ে দাও না।'

'আবার তুমি আজান বুড়োর ওখেনে যাবে নাকি ?'

চাল বাছতে বাছতে দাওয়া থেকে শুধলো তিতাসী।

'নিচ্চয় যাব। কথা দিয়ে এসেচি।'

সখারামের গলাটা দৃঢ় শোনালো।

'কিন্তুক—'

তিতাসীর স্বর কাঁপল, 'মায়ের দয়া যে বড্ড ছোঁয়াচে রোগ! যদি ভালমোন্দ কিছু হয়!'

'যাই হোক, আমি যাবই।'

স্থির গলায় সখারাম বলল, 'জান, কেউ আজান বুড়োর কাচে ঘেঁষচে না। একটা লোক চোখের সামনে মরে যাবে! ওষুধ পাবে না, পথ্যি পাবে না। তেষ্টায় ছাতি ফাটলেও এক ফোঁটা জল দেবার কেউ নি। এ সময় তার কাচে না গেলে নিজের কাচে, ভগমানের কাছে দুষী হয়ে থাকব।'

একটু চুপ। কেউ কথা বলছে না।

সখারামই আবার শুরু করল, 'কটা দিন তোমাদের এখেনে আসতে পারব না। যদিও আসি, কখন আসব তার ঠিক নি।'

এতক্ষণে কামিনী-বৌ মুখ খুলল, 'আজান বুড়ো মরুক বাঁচুক, তাতে তোমার কী ? তোমার কোন্ দায় ?'

'কিচ্ছু না—'

বারকতক মাথা নাড়ল সখারাম। অল্প একটু হাসল। তার পর খুব নিরীহ গলায় বলল, 'দোষ বল, গুণ বল, আমার স্বভাবই ওই। কোথাও কোন দায় নি, স্বাথ নি, তবু জড়িয়ে পড়ি। বুঝলে কি-না—'

গলা যতই নিরীহ হোক, সখারামের কথাগুলো তত নিরীহ না। কথাগুলোর মধ্যে কোথায় যেন সুঁচের মুখের মত সূক্ষ্ম অথচ তীক্ষ্ণ একটা খোঁচা আছে।

যা বলেছে ঠিক তা নয়। সখারাম হয়তো এই কথাই বলতে চেয়েছে, ত্যাখ বাপু, তোমাদের সম্বন্ধেও তো আমার কোন দায়িত্ব নেই। তবু তোমাদের সংসারের সব দায় মাথায় তুলে নিয়েছি। নিজেদের বেলায় তো বেশ চুপ করে থাক। কিন্তু যেই আজান বুড়োর দায় নিতে গেছি, অমনি বেজার হয়ে গেলে। কেন বেজার হয়েছ, বুঝি।

আজান বুড়োর বসন্ত হয়েছে। কবে তার রোগ সারবে, কে বলবে। যতদিন তার রোগ না সারে, ততদিন ফিরব না। তোমাদের সংসারও দেখতে পারব না। তোমাদের ভয়, আমাকে দিয়ে কয়েকটা দিন তোমাদের সংসারের কোন উপকারই হবে না।

বুঝি, সবই বুঝি। আমাকে ঘিরে তোমাদের অনেক স্বার্থ। সেই স্বার্থের কথাটা আমার কাছে গোপন নেই।

খুব সম্ভব, সখারামের মনের কথাগুলো এ-ই।

ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক খোঁচাটুকু দিয়ে ফেলেছে সখারাম। এবং সঠিক লক্ষ্যে সেটা বিঁধেছে।

কামিনী-বৌ ফুঁসে উঠল, 'কী কইলে ব্যাটাছেলে ?'

'যা বলেচি, তা তো শুনেচই।'

হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠল সখারাম, 'আজান বুড়ো অনেকক্ষণ একলা রয়েচে। তাড়াতাড়ি এট্টু সাবু ফুটিয়ে দেবে ?'

'দিচ্চি।'

থমথমে গলায় কামিনী-বৌ বলল, 'কিন্তুক তার আগে একটা কথার জবাব দাও দিকি।'

'এখন না। এখন জবাব দেবার সময় নি।'

সখারামের গলার স্বরে এমন কিছু আছে, যাতে কামিনী-বৌ আর কথা বাড়াতে ভরসা পেল না। তাড়াতাড়ি সাবু জ্বাল দিয়ে আনল।

সাবু নিয়ে সখারাম চলে যাচ্ছিল। কামিনী-বৌ ডাকল, 'শোন—'

'বল।'

সখারাম ঘুরে দাঁড়াল।

'তোমার ঐ কথাটা নিয়ে পরে বোঝাপড়া আচে।'

'কোন্ কথাটা ?

'ঐ যে বললে, দায় না থাকলেও, স্বাত্থ না থাকলেও জড়িয়ে পড়।'

সখারাম জবাব দিল না। হাসতে লাগল।

হঠাৎ কামিনী-বৌ ক্ষেপে উঠল, 'দাঁত বার করে হাসলে চলবে নি। তোমার ঐ কথা নে বোঝাপড়া করবই।'

এবারও কিছু বলল না সখারাম। হি-হি করে হাসতে হাসতে চলে গেল।

॥ ২৮ ॥

এখন দুপুর।

সূর্যটা সরাসরি মাথার ওপর এসে উঠেছে।

গেরুয়া নদীটা ঝিম মেরে পড়ে আছে। ছোট ছোট ঢেউগুলি চিক চিক করছে। নদীর মাঝখানে যে চরটা মাথা তুলেছে, তার ওপর এক ঝাঁক বালিহাঁস বসে আছে। চোখ বুজে তারা রোদ পোহাচ্ছে। ডানাগুলো একটু গরম হলেই উড়ে যাবে।

নদীর ওপর তিনটে চিল শিকারের আশায় উড়ে বেড়াচ্ছে। কোথায় যেন একটা ঘুঘু ডেকে সারা হয়ে যাচ্ছে।

ইউনিয়ন বোর্ডের সড়কের দু পাশে শিশুগাছের সারি। গাছের ছায়াগুলি এখন ছোট হয়ে গিয়েছে।

এক রকম দৌড়তে দৌড়তে আজান বুড়োর দোকানে এসে ঢুকল সখারাম। বলল, 'আমি এসেচি—শুনচ—হেই গো—'

'কে, সখারাম—'

আজান বুড়োর গলাটা নির্জীব শোনালো।

'ফিরতে বড্ড দেরি হয়ে গেল—'

বলতে বলতে আজান বুড়োর কাছে এসে দাঁড়াল সখারাম। তার কপালে একটা হাত রাখল।

জ্বর বেশ বেড়েছে। গায়ের গুটিগুলি লাল হয়ে উঠেছে। গালের কষে সাদা ফেনার মত কী যেন জমে রয়েছে। চোখদুটো কেমন যেন আচ্ছন্ন, উদ্‌ভ্রান্ত।

দু হাতে কী যেন খুঁজতে লাগল আজান বুড়ো।

সখারাম বলল, 'কী খুঁজচ?

আজান বুড়ো জবাব দিল না। বিড় বিড় করে বকতে লাগল।

দোকান-ঘরে জলভর্তি একটা টিন ছিল। তাড়াতাড়ি টিনটা সামনে নিয়ে এল সখারাম। তার পর আজান বুড়োর মাথা ধুয়ে দিল।

মাথা ধোবার পর অনেকটা সুস্থ হল আজান বুড়ো।

এখন ঘোর ঘোর, আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে যাচ্ছে। চোখের দৃষ্টি, যদিও কিছু দেখতে পাচ্ছে না আজান বুড়ো, স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে।

জলের টিনটা একপাশে সরিয়ে আজান বুড়োর শিয়রের কাছে এসে বসল সখারাম। একটা হাতপাখা দিয়ে আস্তে আস্তে হাওয়া করতে লাগল।

আরামে চোখ বুজে এল। একসময় ঘুমিয়ে পড়ল আজান বুড়ো।

এক ঘুমে দুপুর কাবার হয়ে গেল।

এখন বিকেল।

ঘুম ভাঙতেই চোখ মেলল আজান বুড়ো। হাত বাড়িয়ে বুঝতে পারল, শিয়রের কাছে ঠায় বসে আছে সখারাম। পাখা নেড়ে বাতাস করছে।

আজান বুড়ো বলল, 'হেই ত্যাখন ঠেঙে হাওয়া করচিস?'

'না। তুমি ঘুমিয়ে পড়তে খেতে গিচলম। খানিক আগে ফিরেচি।'

একটু চুপ।

হঠাৎ গাঢ় গলায় আজান বুড়ো ডাকল, 'সখারাম—'

'বল।'

'তুই যতই করিস, এ যাত্রা আমার নিস্তার নি।'

কী একটু ভাবল আজান বুড়ো। আবার শুরু করল, 'মরব, সে জন্যে ডরাই না। কিন্তুক বড্ড দুঃখু হচ্চে রে সখারাম।'

'কার জন্যে ?'

'নিজের জন্যে।'

'নিজের জন্যে !'

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল সখারাম।

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, নিজের জন্যে ছাড়া আর কার জন্যে !'

খুক খুক করে একটু কাশল আজান বুড়ো। কেশে গলাটা সাফ করে বলল, 'সারা জীবন কত পাপ যে করেচি ! কত লোকের মনে যে কষ্ট দিয়েচি !'

আজান বুড়ো চুপ করল। সখারাম কিছু বলে কি না, শোনার জন্য উন্মুখ হয়ে রইল। কিন্তু না, কিছুই বলল না সখারাম।

ভারী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল আজান বুড়ো। তার পর বলতে লাগল, 'কু-কথা ছাড়া কিছু বলি নি। কু-পথ ছাড়া ভুলেও সু-পথ মাড়াই নি। সুন্দোর মেয়েছেলে আমার জ্বালায় ঘরের বার হতে পারত নি। যদি তাদের পেতম, ভালই। নইলে তাদের নামে মিথ্যে দুন্নাম রটাতম। কত পাপ যে করেচি !'

অর্ধস্ফুট গলায় সখারাম বলল, 'এখন ও সব কথা থাক।'

'না-না, থকেবে না।'

জোরে জোরে বারকতক শ্বাস টানল আজান বুড়ো। ফুসফুসের সঙ্গে বাতাসের যোগাযোগ রাখতে ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে। কিছুক্ষণ ঝিম মেরে পড়ে রইল সে।

সখারাম জোরে জোরে হাওয়া করতে লাগল।

খানিকটা পর সামলে উঠল আজান বুড়ো। সঙ্গে সঙ্গে শুরু করল, 'বুঝলি সখারাম—'

'আঃ—'

বিরক্ত গলায় সখারাম বলল, 'বলচি, এখন চুপ কর। রোগ সারলে যত পার বকবক করো।'

'আমায় বারণ করিস নি সখারাম। কইতে দে—'

আজান বুড়োর মুখটা বড় করুণ দেখাল। সে বলতে লাগল, 'সব কথা বললে বুকটা হাল্কা হবে। এট্টু শান্তি পাব।'

'তবে বল।'

সখারাম আর বাধা দিল না।

নিজের শুকনো, নীরস বুকটায় আঙুল ঠেকিয়ে আজান বুড়ো বলল, 'এই খাঁচাটার ভেতর একটা নরক আচে। সেই নরকটা আমায় কোনদিন ভাল হতে দ্যায় নি। তাড়িয়ে তাড়িয়ে শুদু খারাপ পথে নে গেচে।'

একটু থেমে আবার, 'আমি কু-চরিত্তির, অখাদ্য খাই, কু-কথা কই, কু-জায়গায় রাত কাটাই—এই নে তার সন্‌গে রোজ বাঁধত। সে কইত, তুমি ভাল হও। কিন্তু বুকের ভেতর থেকে সেই নরকটা কইত, না না, ওর কথা শুনিস নি।'

'কে তোমায় ভাল হতে কইত?'

সখারামের গলায় কৌতূহল ফুটল।

'কে আবার? সেই যে দশ বছর আগে যার সন্‌গে সব সম্পক্ক চুকিয়ে ফেলেচি।'

'অ।'

'কত কষ্ট যে তাকে দিয়েচি, তার—'

কথা শেষ করতে পারল না আজান বুড়ো। হাঁপানির টান উঠল। কাশতে কাশতে রুগ্‌ণ, পঙ্গু দেহটা দুমড়ে যেতে লাগল।

এক সময় হাঁপানির টান কমলো। নির্জীবের মত পড়ে রইল আজান বুড়ো। ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে আছে। তার মধ্য দিয়ে গোঙানির মত একটানা আওয়াজ বেরিয়ে আসতে লাগল।

এখন আর কথা বলার মত সামর্থ্য নেই আজান বুড়োর।

দিন পাঁচেক এক রকম কাটাল। তার পরই আজান বুড়োর গ-ময় গুটিগুলো পাকতে শুরু করল।

অসহ্য যন্ত্রণা। গুটির ভেতর পুঁজ ঘন হতে শুরু করেছে। সেই সঙ্গে জ্বরও বেড়েছে। দিনরাত অস্থির, বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকে আজান বুড়ো। যেটুকু সময় হুঁশ থাকে, বিছানায় ছটফট করে।

সমস্ত দেহে এত যে যন্ত্রণা, আশ্চর্য, আজান বুড়োর মুখে তার লেশমাত্র চিহ্ন নেই। খুব শান্ত গলায় সে বলে, 'কপালের লেখা সখারাম। জন্মাবার সময় ভগমান কপালে যে আঁক কেটে দিয়েচিল, তা খণ্ডাব কেমন করে?'

আজান বুড়ো কী বলতে চায়, ঠিক বুঝে উঠতে পারল না সখারাম। তবু

মাথা নেড়ে সে বলল, 'ঠিক কথা।'

'এই যে এত কষ্ট পাচ্ছি, এ আমার কপালে ছিল।'

আজান বুড়ো বলতে লাগল, 'কষ্ট পাচ্চি, সে জন্যে দুঃখু নেই। এ কষ্ট আমার পাওনা। সারা জীবন মানুষকে অনেক ভুগিয়েচি, অনেক দুঃখু দিয়েচি। মরার সময় এটুকু কষ্ট যদি না পাই, তা হলে বলতে হবে, ভগমানের রাজত্বিতে বিচার নি।'

একটু চুপচাপ।

কথা বলতে গিয়ে শ্বাস আটকে আটকে আসছে। তবু থামছে না আজান বুড়ো, 'আমার এট্টা কথা মনে রাখিস সখারাম।'

'কী কথা?'

'কারু মনে কোনদিন দুঃখু দিস নি।'

'এই কথা।'

'না-না, আরো একটা কথা আচে।'

পরম আগ্রহে আজান বুড়ো বলতে লাগল, 'তিতাসী মেয়েটা খুব ভাল। তাই না রে!'

সখারাম চমকে উঠল। তিতাসীদের সম্পর্কে কোনদিন ভাল কথা বলে নি আজান বুড়ো। এর আগে যত বার দেখা হয়েছে, কামিনী বৌ আর তিতাসীর সঙ্গে তার নাম জড়িয়ে চূড়ান্ত অশ্লীল মন্তব্য করেছে। জঘন্য ইঙ্গিত দিয়েছে। আজান বুড়ো আবার তাড়া দিল, 'কি রে চুপ করে আচিস যে? তিতাসী কেমন মেয়ে?'

'কেমন করে কই?'

'তোর কিছু কইতে হবে নি। দশ বছর এই রানীর হাটে কাটালম। কে কেমন, সব জানি।'

একটু থেমে আজান বুড়ো বলল, 'তিতাসী খুব ভাল মেয়ে।'

আশ্চর্য! যে মানুষটা সারা জীবন পরের নামে দুর্নাম রটিয়েছে, লোকের নামে নিন্দে রটানোই ছিল যার বিলাস, আজ যেন তার কী হয়েছে!

প্রাণের ভেতর কোথায় যেন একটা তৃষ্ণা লুকিয়ে ছিল, এত কাল বুঝতে পারে নি আজান বুড়ো। তার নিজের অজান্তেই সেই তৃষ্ণাটা আকণ্ঠ হয়ে উঠেছিল।

কিসের তৃষ্ণা? কিসের পিপাসা?

এত দিন আজান বুড়ো জানত না। কিন্তু আজ, জীবনের এই অন্তিম মুহূর্তে জেনেছে, সেটা হল একটু ভাল হওয়ার পিপাসা।

আজ লোকের সম্বন্ধে একটু ভাল কথা বলতে কি ভাল কিছু ভাবতে বেশ লাগছে। দেহের রোগটা আজান বুড়োর রুগ্‌ণ, বিকল মনটাকে একেবারে নীরোগ করে ফেলেছে।

আজান বুড়ো বলল, 'হ্যাখ সখারাম, আমি আর বাঁচব না। আমার নিদেন এসেচে। এসময় একটা কথা রাখবি ?'

'কী কথা ?'

কী একটু ভাবল আজান বুড়ো। তার পর বলে ফেলল, 'তিতাসীকে তুই বে করে ফ্যাল।'

'কী কইচ !'

সখারাম অবাক হয়ে গেল।

'ঠিকই কইচি।'

গাঢ় গলায় আজান বুড়ো বলতে লাগল, 'তিতাসীদের বড্ড দুঃখু। শ্যাম লড়াইতে যাবার পর কী কষ্টে যে তাদের দিন কাটচে ! অবিশ্যি তুই আসার পর ওদের দুঃখু খানিকটা ঘুচেচে। তিতাসীকে বে করে ওদের সোম্‌সারে থেকে যা। তোরও তো তিন কুলে কেউ নি।'

একটু থেমে বলল, 'আমার এই কথাটা রাখিস সখারাম।'

সখারাম জবাব দিল না।

দিনকতক পর গায়ের গুটিগুলো পেকে হলুদ হয়ে উঠল। জ্বর আরও বেড়েছে। যন্ত্রণায় আজান বুড়োর শরীরটা অসাড়, অবোধ।

এই ক'দিন আজান বুড়োর দোকান ছেড়ে কোথাও এক পা বেরোয় নি সখারাম। দিনরাত রুগীর শিয়রে বসে ছিল !

আজান বুড়ো একটু সুস্থ থাকলে কি ঘুমিয়ে পড়লে এখানেই চাট্টি ফুটিয়ে খেয়ে নিয়েছে।

আজ রুগীর অবস্থা খুব খারাপ। গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুচ্ছে না। স্বরভঙ্গ হয়েছে। মাঝে মাঝে টকটকে লাল চোখ মেলে তাকায়। কিন্তু কিছুই দেখতে পায় না। চোখের মণিতে অনেকগুলি গুটি উঠেছে। তার কাছে এখন সব কিছু একটা আকারহীন অন্ধকার মাত্র।

কথা বন্ধ হয়েছে। খাওয়া বন্ধ হয়েছে। এমন কি নড়াচড়া করার শক্তি -

পর্যন্ত তার নেই।

পঙ্গু দেহটার ভেতর জীবনীশক্তি খুব কম। রোগটার সঙ্গে বেশীদিন যুঝে উঠতে পারল না আজান বুড়ো।

দু দিন পর এক সকালে আজান বুড়োর গায়ে হাত দিয়ে চমকে উঠল সখারাম। গা-টা আশ্চর্য ঠাণ্ডা। তাড়াতাড়ি হাতটা তার নাকের কাছে নিয়ে এল। এবার সমস্ত সন্দেহ ঘুচল। নিঃশ্বাস পড়ছে না।

গুটিগুলো এখনও ফাটে নি। তার আগেই আজান বুড়ো মরে গেল।

রানীর হাটে আসার পর এই প্রথম মৃত্যু দেখল সখারাম।

আজান বুড়োর সঙ্গে তার মৌখিক পরিচয় ছিল। হয়তো খানিকটা ঘনিষ্ঠতাও হয়েছিল। কিন্তু তার জীবনের তার স্বভাবের অনেক কিছুই জানে না সখারাম। জানার জন্য মাথাব্যথাও নেই।

দশ বছর আগেকার সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে আজান বুড়ো এখানে এসেছিল, কে বলবে। মরার আগে সখারামকে নিজের জীবন সম্বন্ধে সে যতটুকু বলেছে তার চেয়ে অনেক বেশী গোপন রেখেছে।

আজান বুড়ো তার আত্মীয় না, বন্ধু না, উপকারী সুহৃদও না। খুব বেশীদিনের পরিচয়ও তার সঙ্গে ছিল না। রানীর হাটে আসার পর দিনকতক তার দোকানে গিয়ে আড্ডা মেরেছে, এই পর্যন্ত। পরিচয়টা কোন সময় অন্তরঙ্গতার খুব গভীরে পৌঁছতে পারে নি।

তবু আজান বুড়োর মৃত্যুতে সখারামের মনটা ভারী উদাস হয়ে গেল।

॥ ২৯ ॥

দেখতে দেখতে শীত চলে গেল। শুধু কি শীত? বছরের শেষ ঋতুটিও এখন যায় যায়।

এটা চৈত্র মাস। আর ক'দিন পরেই নতুন বছর শুরু হবে।

এখানে, এই রানীর হাটে সব ঋতুই বেশ সমারোহ করে আসে। বছরের শেষ ঋতুটির বেলায় তার ব্যতিক্রম নেই।

ফাল্গুন আর চৈত্র—এই দুটো মাস রানীর হাট ফুল আর পাখিতে জমকালো হয়ে থাকে।

সারা বছর রানীর হাটের গাছগুলি উন্মুখ হয়ে কামনা করে। কবে তাদের গর্ভ হবে, এই আশায় আশায় উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে।

বছরের শেষ ঋতুতে রানীর হাটের গাছগুলি গর্ভিণী হয়। অজস্র ফুলে তারা ছেয়ে যায়।

এই ঋতুতে সুন্দরবনের দিক থেকে পাখিরা আসে। নানাজাতের পাখি। সুরুলে, মদনটাঙ, বখারি। কত যে নাম, কত যে জাত, লেখাজোখা নেই।

রানীর হাটের এই ঋতুটা হচ্ছে, ফুল আর পাখির ঋতু।

এখন সকাল।

ফুল কি পাখি—কোনদিকে নজর ছিল না সখারামের। কুঠির মাঠের ওপর দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে সে নদীর ঘাটের দিকে যাচ্ছিল।

আজকাল সখারাম নৌকো বায়।

তিতাসীদের একটা নৌকো ছিল। দিন গেলে আট আনা দেবে, এই কড়ারে নৌকোটা গোকুল সাপুইর কাছে ভাড়া খাটতে দেওয়া হয়েছিল।

গোকুল রানীর ঘাটেরই মাঝি। কিন্তু লোক খুব সেয়ানা। তার কাছ থেকে ভাড়া আদায় করা দুরূহ ব্যাপার। সখারাম আসার পর নৌকোটা গোকুলের কাছ থেকে নিয়ে এসেছে কামিনী-বৌ।

নৌকোটার তলি ফাঁসিয়ে ফেলেছিল গোকুল। সখারাম মেরামত করে নিয়েছে। ইদানীং সে-ই নৌকোটা বাইছে। সওয়ারী নিয়ে এখানে সেখানে যাচ্ছে। ভাড়া মোটামুটি ভালই পাওয়া যাচ্ছে।

খেয়াঘাটা থেকে খানিকটা দূরে মাঝিঘাটা। এখানে সারি সারি নৌকোর জটলা।

মাঝিঘাটায় একটা গাছের সঙ্গে সখারামের নৌকোটা বাঁধা ছিল।

এসেই সওয়ারী পেয়ে গেল সখারাম। নদীর ওপারে সেই মহারাজগঞ্জে যেতে হবে।

সখারাম নৌকো ছেড়ে দিল।

এখন চৈত্রের রোদ তেতে উঠতে শুরু করেছে। গেরুয়া নদীটা জলছে। ইউনিয়ন বোর্ডের সড়কে লাল ধুলো উড়িয়ে ক্ষ্যাপা বাতাস ছুটেছে। নদীপারের শিশুগাছগুলি নাস্তানাবুদ হয়ে যাচ্ছে।

মহারাজগঞ্জে এসে যখন সখারামের নৌকো পৌছল, তখন দুপুর। এখন আর আকাশের দিকে তাকানো যাচ্ছে না। অসহ্য তাপে আকাশটায় গলা কাঁসার রং ধরেছে।

খুব খিদে পেয়েছে সখারামের। এখন রানীর হাটে ফিরে তিতাসীদের বাড়ি যেতে যেতে বিকেল হয়ে যাবে।

তাড়াতাড়ি সওয়ারী নামিয়ে হিসেব করে ভাড়া গুনে নিল সখারাম। তার পর ফিরবার জন্য যখন বৈঠেটা হাতে তুলে নিয়েছে, ঠিক সময় ডাকটা কানে এল।

'শুনচ—অ্যাই মাঝি—'

সখারাম ঘুরে তাকাল। মনে মনে সে বিরক্ত হয়েছে।

নদীর পাড়ে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। পরনে খাকির প্যান্ট, সাদা জামা। পায়ে লাল কাপড়ের জুতো। বছর তিরিশেক বয়স। চৌকো মুখ, হনুর হাড়দুটো ফুঁড়ে বেরিয়েছে। তামাটে চামড়া। জামার একটা বোতাম নেই। তার ফাঁক দিয়ে রোমশ বুকের আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

লোকটার সঙ্গে প্রকাণ্ড একটা টিনের বাক্স। একটা বেতের ঝোড়া, ছোট ছোট গোটা দুই বোঁচকা।

'কী কইচেন?'

মনের বিরক্ত ভাবটা সখারামের গলার স্বরে ফুটে বেরুল। মনে মনে এর মধ্যেই সে ঠিক করে ফেলেছে, এখন যত টাকাই দিক, সওয়ারী সে নেবে না। পেটের ভেতর খিদেটা চনচন করছে।

লোকটা বলল, 'ভাড়া যাবে?'

পরিষ্কার জবাব দিল সখারাম, 'না।'

'পয়সা দোব, ভাড়া যাবে না কেন? মাগনা তো আর যাচ্চি না।' লোকটা বলতে লাগল, 'সেই কতক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে আচি। একটা নৌকোরও পাত্তা নেই। আমায় নদীটা পার করে দাও। তোমার ন্যাষ্য ভাড়া আমি দোব।"

অনিচ্ছাসত্ত্বেও সখারাম বলল, 'কোথায় যাবেন?'

'রানীর হাট।'

ভেতরে ভেতরে খুশীই হয় সখারাম। খালি নৌকো নিয়ে তাকে রানীর হাট ফিরতে হচ্ছিল। সওয়ারী পেয়ে লাভই হল। ফাঁকতালে কিছু রোজগার হবে।

খুশির ভাবটা বুঝতে দিল না সখারাম। যেন গরজ নেই, এমনভাবে বলল,

'দু টাকা ভাড়া লাগবে।'

'তাই দোব।'

'মালপত্তোর নিয়ে আসুন।'

টানাটানি করে বাক্স-বুঁচকি নৌকোয় এনে তুলল লোকটা। সখারাম নৌকো ছেড়ে দিল।

বরাত ভাল। এখন উত্তর দিক থেকে বাতাস দিতে শুরু করেছে। সুযোগ বুঝে পাল খাটিয়ে দিল সখারাম। গেরুয়া জলের ওপর দিয়ে তরতর করে নৌকো এগুতে লাগল।

লোকটা এবার আলাপ জমাতে চাইল, 'তোমার ঘর কোথায় গো মাঝি?'

'আমার ঘর নি।' নিস্পৃহ গলায় জবাব দিল সখারাম।

একটুক্ষণ অবাক হয়ে রইল লোকটা। তার পর অবিশ্বাসের হাসি হাসল। বলল, 'ঘর নেই, তাই কখনো হয়!'

পেটের ভেতর খিদেটা এখন দাপাদাপি শুরু করেছে। কথা বলার বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই সখারামের। তবু তাকে বলতে হচ্ছে।

একজন যদি ক্রমাগত বক বক করে, আরেক জন কতক্ষণ মুখ বুজে থাকতে পারে? অগত্যা সখারাম বলল, 'সত্যি ঘর নি। তবে মাস কতক হল, রানীর হাটে আচি।'

আগ্রহে লোকটার চোখদুটো যেন চকচক করে উঠল।

সখারাম খেয়াল করল না। হালের বৈঠেটা শক্ত মুঠোয় চেপে চুপচাপ বসে রইল। অর্ধেকটা পথ পেরিয়ে এসেছে তারা। আরো অর্ধেকটা যেতে পারলে রানীর হাটে পৌছনো যাবে। সখারামের মাথায় এখন সেই চিন্তাটাই ঘুরছে।

লোকটা শুধলো, 'কদিন রানীর হাটে আচ বললে?'

'মাস চার পাঁচ—'

'ওখেনকার সবাইকে চেন?'

নাঃ, লোকটাকে নিয়ে পারা যাচ্ছে না। যতই চুপচাপ থাকতে চাইছে সখারাম, খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কথা বলাচ্ছে।

কথা এড়াবার জন্য সখারাম বলল, 'না, দু-এক জন ছাড়া কাউকেই চিনি না।'

'ও।'

এবার লোকটা চুপ করে গেল।

এক সময় নৌকোটা রানীর হাট পৌছে গেল। এখন সূর্যটা পশ্চিম দিকে

অনেকখানি নেমে এসেছে। রোদ আর আকাশের রং বদলাতে শুরু করেছে। আর একটু পরেই বিকেল হবে যাবে।

মোটঘাট পারে নামিয়ে ফেলল লোকটা। তার পর সখারামের ভাড়া চুকিয়ে দিল।

ভাড়া বুঝে নিয়ে নৌকোটাকে একটা গাছের সঙ্গে বাঁধল সখারাম। আকাশের দিকে একবার তাকাল। খুব সম্ভব, দিনের বয়স এখন কত হয়েছে, আন্দাজ করতে চেষ্টা করল। তার পর পারের মাটিতে নেমে হন হন করে তিতাসীদের বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করল।

লোকটা বলল, 'চললে যে! একটা কথা ছিল—'

'কী কথা?'

'একটা লোক খুঁজে দাও না। এই মালপত্তরগুলোন নিয়ে যাবে।'

'এখন লোক খোঁজার সময় নি।'

আর দাঁড়াল না সখারাম। হন হন করে হাঁটতে শুরু করল।

খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে আবার মাঝিঘাটার দিকে ফিরছিল সখারাম। আজান বুড়োর দোকানের কাছে এসে সেই লোকটার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

এর মধ্যে লোকটা একটা ছোকরা যোগাড় করে ফেলেছে। টিনের পেল্লায় বাক্সটা তার মাথায় চাপিয়ে পিছু পিছু হেঁটে আসছে।

সখারামের সঙ্গে লোকটার একবার চোখাচোখি হল। চোখাচোখিই শুধু হল। কেউ কথা বলল না। পাশ কাটিয়ে দু জনে দু দিকে চলে গেল।

॥ ৩০ ॥

খিদেটা মাত হয়ে গিয়েছিল। তার ওপর অবেলায় খেয়েছে। শরীরটা খুব খারাপ লাগছে। মাঝিঘাটায় এসে নৌকোর ওপর শুয়ে পড়ল সখারাম।

এবেলা একেবারেই সওয়ারী নেই। সারি সারি নৌকো দাঁড়িয়ে রয়েছে।

পাশের নৌকোর মাঝিরা ডাকল, 'আয় সখারাম, "ফড়" খেলি।'

'ফড়' এক ধরনের জুয়া। 'ফড়' খেলায় সখারামের খুব উৎসাহ। কিন্তু আজ তাও ভাল লাগছে না। শরীর বেজুত হলে কী-ই বা ভাল লাগে।

সখারাম বলল, 'তোরা খেল। আজ আমায় বাদ দে।'

'আচ্ছা।'

মাঝিরা আর ডাকাডাকি করল না। পারে 'ফড়ে'র আসর পেতে ফেলল। একটুক্ষণের ভেতর খেলা জমে উঠল। হুল্লোড়ে মাঝিঘাটা এখন সরগরম।

নৌকোয় শুয়ে শুয়ে হুল্লোড়ের আওয়াজ শুনতে লাগল সখারাম।

একটু পরেই সন্ধ্যে হয়ে গেল।

অন্য অন্য দিন সন্ধ্যের পরও মাঝিঘাটায় বসে অনেকক্ষণ গুলতানি করে সখারাম। আজ বেশ তাড়াতাড়িই সে বাড়ির দিকে রওনা হল। মনে মনে ইচ্ছে, এখন গিয়েই ভাত খেয়ে শুয়ে পড়বে। টানা ঘুমে রাত কাবার করে দেবে।

অন্য মাঝিরা 'ফড়' খেলায় মেতে আছে। তাদের পাশ দিয়ে আস্তে আস্তে ইউনিয়ন বোর্ডের সড়কে গিয়ে উঠল সখারাম।

ষষ্ঠ ঋতুর শেষাশেষি, এই সময়টায় অর্থাৎ সন্ধ্যের ঠিক পর পর, উত্তর দিক থেকে ঝিরঝিরে একটু হাওয়া দেয়। সুখস্পর্শে গা যেন জুড়িয়ে যায়।

এই এক স্বভাব সখারামের। সঙ্গে যখন কেউ থাকে না, যখন সে একেবারেই একলা এবং নির্জন, কী এক খেয়ালে গুন গুন শুরু করে দেয়। গুনগুনানিটা প্রাণের কোন গভীর থেকে উঠে আসতে থাকে।

গুন গুন করতে করতে ইউনিয়ন বোর্ডের সড়ক, আজান বুড়োর দোকান এবং কুঠির মাঠ পেরিয়ে বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়ল সখারাম।

এখান থেকে দাওয়াটা দেখা যায়। ঠিক মাঝখানে একটা টেমি জ্বলছে। তিতাসী, সুখী বুড়ী, কামিনী-বৌ আর—আর একজন কে যেন দাওয়ায় বসে রয়েছে।

হ্যাঁ, পুরুষমানুষই তো মনে হচ্ছে। মুখের আদলটা যেন চেনা-চেনা ঠেকছে। একটু চমকেই উঠল সখারাম।

তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে উঠোনে এসে পড়ল সখারাম।

সখারাম কিছু বলার আগে কামিনী-বৌ বলল, 'এতোক্ষণ তোমার কথাই হচ্ছিল গো ব্যাটাছেলে।'

কামিনী-বৌর কথায় কান নেই। দূর থেকে সখারাম যা আন্দাজ করেছিল, ঠিক তাই। সেই লোকটাই। দুপুর বেলা একে মহারাজগঞ্জ থেকে রানীর হাটে নিয়ে এসেছিল সে।

দাওয়ার এক কোণে খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে জাঁকিয়ে বসে আছে লোকটা। একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে রইল সখারাম।

লোকটা বলল, 'তুমিই তা হলে সখারাম? তোমার নৌকোয় আজ এখেনে এসেচি—'

'হ্যাঁ।'

'তোমার সব খবর শুনলম। তা খুব উবগার করেচ আমাদের। এস, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? এখেনে এসে বসো।'

আস্তে আস্তে দাওয়ায় গিয়ে বসল সখারাম। বলল, 'আপনাকে ঠিক চিনতে পারলম নি—'

ওপাশ থেকে সুখী বুড়ী হঠাৎ বলে উঠল, 'ও শ্যাম গো, আমার ছেলে।' একটু থেমে দম নিয়ে আবার শুরু করল, 'সাত বচ্ছর পরে লড়ুই ঠেঙে আজ ফিরল।'

বলতে বলতে হঠাৎ হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল সুখী বুড়ী।

সেই শ্যাম! সাত বছর আগে যে যুদ্ধে গিয়েছিল! সুখী বুড়ীর মুখে, কামিনী-বৌর মুখে, রানীর হাটের তাবত মানুষের মুখে কত বার যে শ্যামের নাম শুনেছ সখারাম, হিসেব নেই।

সেই শ্যাম এতকাল পর হঠাৎ রানীর হাটে ফিরে এসেছে! কারণ নেই, তবু কেন যেন সখারামের বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল।

শ্যাম বলতে লাগল, 'তোমার উবগার জীবনে ভুলব না।'

সখারাম অল্প একটু হাসল। বলল, 'কী আর এমন উবগার করেচি!'

'ও কথা বলো না ভাই।'

শ্যাম বলল, 'আমি সব শুনেচি। সাত-সাতটা বচ্ছর আমি বাড়ি নেই। তিনটে অবোলা মেয়েছেলে কত কষ্টে দিন কাটিয়েছে! এই রানীর হাটে তো কত লোক ছিল। কই, কেউ এসে তো একবারও বলে নি, কি গো কেমন করে তোমাদের দিন চলচে!'

একটু থামল শ্যাম। কী যেন ভাবল। তার পর আবার শুরু করল, 'তুমি আমাদের কেউ না, আত্মীয় না, কুটুম না, তবু সোম্‌সারের সমস্ত দায় মাথায় তুলে নিয়েচ।'

অস্ফুট গলায় সখারাম কী যে বলল, বোঝা গেল না।

শ্যাম বলতে লাগল, 'বুঝলে কি-না ভাই, মন। মনই হল আসল কথা। মনটা যেখেনে বড় সেখেনে আপন-পর নেই। পেল্লায় মন পেয়েচ ভাই, নইলে পরের দায় কি মাথায় নিতে পারতে?'

একটু চুপচাপ।

এখন বেশ খানিকটা রাত হয়েছে। ছাইটিবির মাথায় পেঁপেগাছ দুটো একপায় দঁড়িয়ে আছে। তাদের ফাঁক দিয়ে একফালি পাণ্ডুর চাঁদ দেখা দিয়েছে। অনেক, অনেক দূরে ওগুলো কি জোনাকি? জোনাকি যদি, এক বারও নেভে না কেন? ভাল করে দেখলে বোঝা যাবে, ওগুলো তারা। তারায় তারায় আকাশটা ছেয়ে আছে।

এবার অন্য কথা পাড়ল শ্যাম। যুদ্ধের সময় তারা কোথায় কোথায় চলে গিয়েছিল। মালয়, সিঙ্গাপুর, রেঙ্গুন—বিচিত্র দেশের বিচিত্র সব কথা শোনাতে লাগল সে। কোথায় নাকি মেয়েরা কাছা দিয়ে কাপড় পরে, কোথায় যেন বিয়ের পর মেয়েরা শ্বশুরবাড়ি যায় না, ছেলেরাই মেয়েদের বাড়িঘর করতে যায়। কোথায় যেন এক রকম খাবার আছে যার নাম 'ডাপ্পি'। কোথায় যেন মেয়ে-পুরুষ সবাই চরস খেয়ে বুঁদ হয়ে পড়ে থাকে।

সাত বছর পর পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে আজব আজব খবর নিয়ে ঘরে ফিরছে শ্যাম। তিতাসী, সুখী বুড়ী, কামিনী-বৌ আর সখারাম অবাক বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। এই মুহূর্তে শ্যামকে অদ্ভুত রহস্যময় মনে হচ্ছে।

মালয়, সিঙ্গাপুর, পেনাঙ—সুখী বুড়ীরা কোনদিন এসব নাম শোনে নি। সুখী বুড়ীরা না হয় মেয়েছেলে, রানীর হাট ছেড়ে কোথাও তারা বেরোয় না। তারা না-ও শুনতে পারে। কিন্তু সখারাম? সখারাম তো এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়। কত লোকের সংসর্গে আসে। সে-ও কোনদিন এসব নাম শোনে নি।

গল্পে গল্পে অনেকটা সময় কেটে গেল।

এক সময় কামিনী-বৌ বলল, 'কত রাত হয়েচে হুঁশ আচে? নাও, এবেরে খাওয়া চুকিয়ে ফেল।'

খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে অভ্যাসবশে নিজের খুপরিতে ঢুকতে যাচ্ছিল সখারাম। সুখী বুড়ী তাকে ডাকল, 'হেই বাছা, শোন—'

সখারাম ঘুরে দাঁড়াল।

কত্ কত্ করে ভাত গিলছিল সুখী বুড়ী। জড়ানো জড়ানো গলায় বলল, 'একটা কথা কইচিলম—'

'কী কথা?'

'অ্যাদ্দিন পর ছেলেটা যুদ্ধু ঠেঙে ফিরে এয়েছে—'

কথা শেষ না করে ঘোলাটে চোখে সখারামের দিকে তাকাল সুখী বুড়ী। নিদাঁত, কোকলা মুখে একটু হাসল।

সুখী বুড়ী কী বলতে চায়, ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না সখারাম। চুপচাপ সে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সুখী বুড়ী আবার বলল, 'তাই কইচিলম, ছেলে আর বউ আজ তোমার ঘরে শোবে। তুমি যদি—'

বলতে বলতে মাঝপথেই থেমে গেল সুখী বুড়ী।

সখারাম এবার বুঝে ফেলল। বলল, 'ঠিক আচে। আমি অন্য কোথাও গিয়ে শোব।'

'রাগ করলে না তো?

'না-না, রাগের কী আচে!'

সখারাম তিতাসীদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। হাঁটতে হাঁটতে দূরের কুঠির মাঠে চলে এল।

মাঠটা চোরকাঁটায় ছেয়ে গিয়েছে। চলতে গেলেই পায়ে পায়ে তারা জড়িয়ে যাচ্ছে। সেদিকে লক্ষ্য ছিল না সখারামের। এখন কোথায় যাবে, কোথায় গিয়ে শোবে, ঠিক ভেবে উঠতে পারছিল না সে।

অবশ্য শোবার আস্তানার অভাব নেই। আজ অনেকদিন পর হঠাৎ হ্যালিডে সায়েবের কথা মনে পড়ল। হ্যালিডে পাদ্রী তাকে বলেছিল, যখন ইচ্ছা হবে, তখনই যেন সখারাম তার কাছে চলে যায়।

সখারাম একবার ভাবল, হ্যালিডে সায়েবের কাছে চলে যায়। আবার ভাবল, খেয়াপারানির মাঝি লোটনের ঘরে গিয়েই শুয়ে থাকে। শেষ পর্যন্ত কোনটাই মনে ধরল না।

এলোমেলো, অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে হাঁটতে একসময় সে আজান বুড়োর দোকানের কাছাকাছি এসে পড়ল।

এবার সখারাম স্থির করে ফেলল। আজান বুড়োর দোকানেই সে রাত কাটাবে। ঝাঁপ ঠেলে দোকানের ভেতর ঢুকে পড়ল সখারাম। একরাশ চামচিকে ফর ফর করে উড়তে লাগল। গোটা দুই কুকুর দৌড়ে বেরিয়ে গেল।

কদিনই বা আজান বুড়ো মরেছে! এর মধ্যেই তার দোকানঘরটা কুকুর আর চামচিকের আস্তানা হয়ে উঠেছে।

অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে বাঁশের মাচানটার কাছে এল সখারাম। এটার ওপরেই আজান বুড়ো শুত।

একরাশ ময়লা, বেওয়ারিশ কাঁথা মাচানটার ওপর স্তূপাকার হয়ে আছে। তার ওপর শুয়ে পড়ল সখারাম।

কুকুর, চামচিকে, আজান বুড়ো, তার দোকান—এখন কোন কথাই ভাবছে না সখারাম। শুয়ে শুয়ে এই মুহূর্তে একটা কথাই ভাবতে পারছিল সে।

সাত বছর পর শ্যাম লড়াই থেকে ফিরে এসেছে। হয়তো রানীর হাটে আর তার দরকার নেই।

সত্যিই কি দরকার নেই? নিজের মনকে শুধলো সখারাম। কোন সদুত্তর মিলল না।

॥ ৩১ ॥

অন্য দিনের মত রোদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আজও খেয়াঘাটে এল লোটন। একটা গেমো গাছের সঙ্গে খেয়ানৌকোটা বাঁধা ছিল। খুলতে যাবে, এমন সময় ডাকটা কানে এল, 'হেই লোটন—'

ঘুরে দাঁড়িয়ে লোটন দেখল, জমাবাবু তাকে হাতের ইশারায় ডাকছে।

নৌকোটা আর খুলল না লোটন। পায়ে পায়ে জমাবাবুর কাছে এল। বলল, 'কী কইচেন?'

'ভিতরে আয়। কথা আচে।'

জমাবাবুর পিছু পিছু তার ঘরে গিয়ে ঢুকল সখারাম।

জমাবাবু বলল, 'বোস।'

এককোণে উঁচু হয়ে বসল লোটন।

জমাবাবু বলল, 'পঁচিশ বচ্ছর পর আজ আমার চিঠি এয়েচে। এই ছাখ—' বলেই একটা মুখছেঁড়া খাম দেখাল সে।

চিঠিটা কোথা থেকে কবে এসেছে, কে লিখেছে, কিছুই বলল না জমাবাবু। শুধু বলল, 'আজই আমি চলে যাব লোটন।'

'কোথায় যাবেন?'

'বদ্ধমান (বর্ধমান)।'

'কবে ফিরবেন?'

অল্প একটু হাসল জমাবাবু। আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল। তারপর বলল, 'এখেনে আর কোনদিন ফিরব না।'

একটু চুপচাপ।

'তা হলে—'

লোটনের গলাটা কেঁপে উঠল।

'তা হলে কী?' জমাবাবু শুধলো।

'খেয়া পারানির কী হবে? খেয়া নৌকোটা কী করবেন?'

'সে জন্যে ভাবনা নি।'

অদ্ভুত একটু হাসল জমাবাবু। বলল, 'সব বন্দোবস্ত করে ফেলেচি। এট্টু পর মোহনপুর ঠেঙে মন্মথ মোহাজন আসবে। চিনিস তো?'

'কোন্ মন্মথ মোহাজন?'

'ছুই যে যার ধান-চালের বড় বড় আড়ত আচে।'

লোটন বলল, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, চিনি। তা মন্মথ মোহাজন আসবে কেন?'

'খেয়া নৌকোটা তার কাচে বেচে দিয়েচি। আজ এসে নৌকাটা নিয়ে যাবে।'

লোটন চমকে উঠল। কালও সে খেয়া পারাপার করে গিয়েছে। এর ভেতর কখন জমাবাবু নৌকো বিক্রীর বন্দোবস্ত করেছে, ঘুণাক্ষরেও টের পায় নি। জমাবাবু আবার শুরু করল, 'আমি চলে যাচ্চি। খেয়াও এখেন ঠেঙে উঠে যাবে। অবিশ্যি অন্য কেউ যদি জায়গাটা ইজারা নিয়ে খেয়া বসায়, সে হল আলাদা কথা।'

কী বলবে লোটন বুঝে উঠতে পারল না। বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছে সে। অবাক চোখে তাকিয়ে আছে।

জমাবাবু বলতে লাগল, 'খেয়া উঠে গেলে তোর ক্ষেতি হবে। কিন্তুক কী করব? যেতে আমার হবেই।'

অস্ফুট গলায় লোটন কী বলল, বোঝা গেল না।

এরপর জমাবাবু তার বিছানা-প্যাঁটরা, লটবহর গোছাতে শুরু করল।

একসময় ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল লোটন। এলোমেলো পায়ে হাঁটতে হাঁটতে ইউনিয়ন বোর্ডের সড়কে উঠল। ঠিক এই মুহূর্তে কোন্ দিকে যাবে, ঠিক করে উঠতে পারল না। এখন তার নির্দিষ্ট কোন লক্ষ্য নেই।

নদীর পার ধরে লাল ধুলোর সড়ক। চৈত্রের ক্ষ্যাপা বাতাসে পাক খেয়ে খেয়ে ধুলো উড়ছে।

বেশ খানিকটা বেলা হয়েছে। বাতাস তেতে উঠতে শুরু করেছে। কয়েক টুকরো সাদা মেঘ পণ করেছে, আকাশটা সাঁতরে পাড়ি দেবে। এখন তারা উত্তর থেকে পুবে চলেছে।

আজ খেয়া পারানির কাজটা গিয়েছে। চলতে চলতে মনটা খারাপ হয়ে গেল লোটনের।

সব মিলিয়ে আড়াই শ টাকা জমিয়েছিল লোটন। আর শ আড়াই জমাতে পারলেই একটা যাত্রাদল খুলতে পারত। কিন্তু তার এতদিনের সাধটা মিটল না। এতদিনের স্বপ্নটা সার্থক হল না।

বাকী আড়াই শ টাকা কোথায় পাবে লোটন? কে দেবে?

চৈত্রের রোদ অসহ্য হয়ে উঠেছে। চাঁদি পুড়ে যাচ্ছে, কিন্তু কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। দুঃখে আর হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে হেঁটে চলেছে লোটন।

বিকেলের দিকে জমাবাবু, রওনা হল। পঁচিশ বছর আগে কেন সে এখানে এসেছিল, আজ আবার কেনই বা চলে যাচ্ছে, কেউ জানে না।

নিজের চারপাশে গাম্ভীর্যের একটা মলাট এঁটে জীবনের সমস্ত রহস্যকে লুকিয়ে রেখেছিল জমাবাবু।

রানীর হাটে পঁচিশ বছর কাটিয়ে গেল সে। কিন্তু এখানকার বাসিন্দারা তার জীবনের কোন রহস্যের খবরই পেল না।

॥ ৩২ ॥

সব সেই আগের মতই চলছে। শ্যাম আসার পর বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নি।

সারাদিন সখারাম নৌকো বায়। সওয়ারী নিয়ে এখানে সেখানে যায়। কোনদিন বা ডালা-কুলো নিয়ে হাটে বেচতে যায়। রোজগার যা করে, সমস্ত এনে কামিনী-বৌর হাতে দেয়।

সারা দিনে বার দুই তিতাসীদের বাড়ি আসে সখারাম। দুপুরে আর সন্ধ্যে বেলায়। খাওয়া চুকিয়েই চলে যায়।

সব কিছুই আগের নিয়মে চলছে শুধু একটি ব্যতিক্রম ছাড়া।

শ্যাম আসার আগে রাত্রিবেলায় খাওয়া চুকিয়ে চট-টিন-পিচবোর্ডের খুপরিতে

ঢুকে শুয়ে পড়ত সখারাম। আজকাল আজান বুড়োর দোকানে শুতে যেতে হয়।

তিতাসী আর সুখী বুড়ী ইটের পাঁজাটার ভেতর শোয়। শ্যাম আর কামিনী-বৌ চট-টিনের খুপরিটা দখল করে বসেছে।

খানিকটা আগে রাত্রির খাওয়ার পালা চুকেছে।

সখারাম আজান বুড়োর দোকানে চলে গিয়েছে। সুখী বুড়ী আর তিতাসী ইটের পাঁজায় ঢুকেছে।

শ্যাম আর কামিনী-বৌও শুয়ে পড়েছে।.

স্বামীর বুকের ওপর একটা হাত রেখে কামিনী-বৌ বলল, 'তোমায় যে আবার কোনদিন ফিরে পাব, ভাবতে পারি নি।'

'কেন ?'

ফিস ফিস গলায় শ্যাম শুধলো।

'সাত বচ্ছর তুমি যুদ্ধুতে গিয়ে রইলে। এর ভেতর তোমার কোন খপর নি, একটা চিঠি পয্যন্ত নি।'

শ্যামের বুকের কাছে আরো একটু ঘন হয়ে কামিনী-বৌ বলতে লাগল, 'লোকে কত কি কইত।'

'কী কইত ?'

'কইত, সাত বচ্ছরের ভেতর যে ফেরে নি, সে আর ফিরবে না। তোমার নাম করে কইত, ওর আশা ছাড়। ও কি আর—'

বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল কামিনী-বৌ।

'থামলি কেন, বল্—'

'না, সে কথা আমি কইতে পারব না।'

'বুঝেচি ওরা কী কইত—'

অল্প একটু হাসল শ্যাম। তারপর বলল, 'ওরা কইত, শ্যাম কি আর বেঁচে আচে, মরে ভূত হয়ে গেছে। তাই না বউ ?'

'চুপ কর। ও কথা আমার কাচে কইবে না। আমার বুক কাঁপে।

শ্যাম আর কিছু বলল না। নিবিড় স্নেহে কামিনী-বৌর গলাটা জড়িয়ে চুপ করে রইল।

অনেকটা সময় কেটে গেল। ইটের পাঁজাটা থেকে সুখী বুড়ীর শ্বাস টানার

ঘর্ঘর আসছে। বাইরে, জামরুলগাছের ভেতর থেকে কী একটা পাখি যেন ডেকে উঠল।

চট-পিচবোর্ডের খুপরিটার এখানে-ওখানে ছোট-বড় অনেক ফুটো। তার ভেতর দিয়ে গলা রুপোর মত চাঁদের আলো এসে পড়েছে।

একসময় কামিনী-বৌ বলল, 'ভাগ্যিস তুমি ফিরে এসেচ, নইলে আমাদের কী যে হত—'

'কেন, সখারাম তো ছিল।'

'সখারাম—'

অস্ফুট গলায় নামটা উচ্চারণ করল কামিনী-বৌ। একটু চুপ করে থাকল। আবার শুরু করল, 'সে আমাদের সোমসারের কেউ না। সে হল পর।

'হোক পর তবু লোক ভাল। নইলে পরের দায় কে মাথায় নেয়—'

কামিনী-বৌ বলল, 'পরের দায় কেউ কি সাধ করে মাথা পেতে নেয়! স্বাত্থে (স্বার্থে) নেয়।'

'এর ভেতর তার স্বাত্থ কী?' শ্যাম শুধলো।

'কী স্বাত্থ, আমি কেমন করে জানব? তার মনে কি আচে, সে-ই জানে।' কামিনী-বৌ বলতে লাগল, 'তা ছাড়া চিরকাল তো তাকে ধরে রাখতে পারি না। যেদিন খুশি হবে, সে চলে যাবে। কিসের জোরে তাকে আটকাবো।'

'যাতে চিরকাল থেকে যায় সেই বন্দোবস্ত করতে হবে।' শ্যাম বলল, 'কদিন ধরে একটা কথা ভাবচি।'

'কী কথা?' কামিনী-বৌর গলাটা কেঁপে গেল।

'ভাবচি, তিতাসী তো বড় হয়েচে। ওকে সখারামের সন্‌গে বে দিয়ে দোব। তুই কী বলিস?'

অন্ধকারেই কামিনী-বৌর দিকে তাকাল শ্যাম।

নীরস, তীক্ষ্ন গলায় কামিনী-বৌ বলল, 'না, এই বে'তে (বিয়েতে) আমার মত নি।'

'সে কী! সখারাম অমন ভাল ছেলে। ওর সন্‌গে বে হলে তিতাসী সুখেই থাকবে। সোম্‌সারেরও উবগার হবে।' একটু থেমে শ্যাম আবার বলল, 'তুই অমত করিস নি বউ।'

'কিছুতেই না।'

কামিনী-বৌ জেদ ধরল, 'এই বে হতে দোব না।'

'কেন ?'

'সে তুমি বুঝবে না।'

সত্যিই তো, কামিনী-বৌর মনের গভীরে কী আছে, শ্যাম কেমন করে বুঝবে। কার্তিক মাসের ঝড় তুফানে নৌকোডুবি হয়েছিল। গেরুয়া কাদার ভেতর সখারাম পড়ে ছিল। সেখান থেকে কামিনী-বৌ তাকে তুলে আনে। গায়ের কাদা ধুয়ে বাড়ি নিয়ে আসে। এসব কথা শ্যাম শুনেছে।

কিন্তু গায়ের কাদা ধোবার পর যখন সখারামের সুন্দর, সুপুরুষ চেহারাটা ফুটে বেরুল, কামিনী-বৌর চোখ দুটো চিকচিক করে উঠেছিল। বুকের ভেতরটা ধক ধক করেছিল। এসব কথা শ্যামকে বলে নি কামিনী-বৌ।

সখারাম তাদের সংসারে ঠাঁই পেল। একথা শ্যাম জানে। কিন্তু সখারামের গোরা গোরা চেহারা, টানা-টানা চোখের দিকে তাকিয়ে কামিনী-বৌ যখন মুগ্ধ হয়ে যেত, যখন সখারাম গাইত, সে উন্মুখ হয়ে শুনত, সে কথা তো কেউ তাকে বলে নি।

যেদিন তিতাসী সখারামের সঙ্গে যাত্রা শুনতে মোহনপুর গেল, অসহ্য দুঃখে বুকটা ফেটে যাচ্ছিল কামিনী-বৌর। নিদারুণ এক কান্না তার প্রাণটাকে ফাটিয়ে চৌচির করে ফেলছিল। আবার যেদিন রাত্তিরে তিতাসী সখারামের সঙ্গে দেখা করতে গেল, যন্ত্রণায় ঈর্ষায় অস্থির হয়ে উঠেছিল কামিনী-বৌ। এসব কথা পৃথিবীর কারুকেই বলে নি কামিনী-বৌ। এমন কি শ্যামকেও না।

যে মানুষ কিছুটা বলে অনেকটা গোপন রাখে, তার দুর্জ্ঞেয় চরিত্র শ্যাম কেমন করে বুঝবে।

একসময় শ্যাম বলল, 'এই বে'তে (বিয়েতে) কেন অমত করচিস, বুঝিয়ে বল্। তুই কইচিস, বুঝব না। বুঝিয়ে কইলে বুঝব না কেন ?'

কী বলবে, ঠিক করে উঠতে পারল না কামিনী-বৌ। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তার পর ফিস ফিস করে বলল, 'সখারামের কী জাত, কে তার বাপ-মা, কিছুই ঠিক নি। নাম শুদোলে বলে, সখারাম। সখারাম কী, সাপুই না গায়েন না বেরা, কিছুই বলতে পারে না।'

একটু থেমে বলল, 'এমন লোকের সনগে বোনের বে দিতে চাও ? মনে রেখো সোমাজ আচে সোম্‌সার আচে—'

সখারামের সঙ্গে তিতাসীর বিয়ে হওয়ার বিপক্ষে এটাই আসল কারণ না। আসল কারণটা আছে কামিনী-বৌর মনে। সেটা সে গোপন রেখেছে।

সখারামকে সে কোনদিনই পাবে না। না পাক, সে ক্ষতি হয়তো সইবে। কিন্তু তিতাসী যদি পায়, সে দুঃখ একেবারেই সইতে পারবে না। নিজেও যেমন সে পাবে না, তিতাসীকেও পেতে দেবে না।

শ্যামের গলায় অস্ফুট একটা শব্দ ফুটল।

'তুমি যাই বল, এ যে কিছুতেই হবে নি।'

কামিনী-বৌর গলাটা কঠিন শোনাল।

শ্যাম আর কিছু বলল না। শ্যাম হচ্ছে সেই চরিত্রের পুরুষ, স্ত্রীর কাছে যাদের ব্যক্তিত্ব খাটে না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

শ্যামকে আস্তে একটা ঠেলা মেরে কামিনী-বৌ ডাকল, 'হেই গো—'

'কী?' শ্যাম সাড়া দিল।

'এখনও জেগে আচ?'

'হ্যাঁ—কেন?'

'একটা কথা কইচিলম।'

'কী কথা?'

'তুমি এবেরে একটা কিছু কাজকম্ম কর।'

বুঝতে না পেরে শ্যাম শুধলো, 'কী কাজ?'

'এই রোজগারের কাজ।' কামিনী-বৌ বলতে লাগল, 'সোম্‌সারের সব কিছু নিজের হাতে নাও। সখারামকে এবেরে ছেড়ে দোব।'

শ্যাম কিছু বলল না।

॥ ৩৩ ॥

আজকাল সখারামের প্রতি কেমন যেন অবহেলা শুরু হয়েছে। ঠিক যে অবহেলা তা নয়, ঔদাসীন্য বলাই হয়তো উচিত।

তিতাসীকে বাদ দিলে সবাই, বিশেষ করে কামিনী-বৌ তার সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশী উদাসীন। শুধু উদাসীনই নয়, বিরূপও।

আগে আগে সখারাম কাজ সেরে ফিরলে কামিনী-বৌরা খেত। যতক্ষণ সে না ফিরত, তারা বসে থাকত। ইদানীং আগে আগেই খেয়ে নেয়। সখারামের জন্য ঠাণ্ডা ভাত ঢাকা দেওয়া থাকে। যে ভাত-তরকারি রাখা হয়,

তাতে তার পেট ভরল কি-না, সে খোঁজ কামিনী-বৌ নেয় না।

শ্যাম আসার আগে তার সঙ্গে কত কথাই না বলত কামিনী-বৌ। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার জীবনের সমস্ত খবর নিত। আজকাল দরকারের বেশি একটি কথাও বলে না।

কামিনী-বৌর উদাসীনতাটা অনুভব করতে পারছিল সখারাম। সুখী বুড়ী এমনিতেই কথা কম বলত। মাঝে মাঝে তিতাসীর জন্য তার যে খুব ভাবনা, সে কথা সখারামকে শোনাত। কী একটা কথা যেন বার বার সে বলতে চাইত। কথাটা যে কী, সখারাম আন্দাজ করতে পারছিল। শ্যাম আসার পর সেও চুপ করে গিয়েছে। এখন তার আর কোন চিন্তা নেই। শ্যামই তিতাসীর ভাবনা ভাববে।

তিতাসীর মনোভাব আজও বুঝতে পারে নি সখারাম। বাড়িতে তার সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা হয় না। মাঝে মাঝে লুকিয়ে সে দেখা করে। তখন অনেক কথাই হয়। রসের কথা, হাসির কথা। কিন্তু সব কথা ছাপিয়ে আরো যেন কিছু বলতে চায় তিতাসী। কী সে বলতে চায়, সখারাম বোঝে না।

শ্যামও প্রথম প্রথম তার সঙ্গে খুব কথা বলত। ইদানীং সামান্য দু-একটা কথা ছাড়া বিশেষ কিছুই বলে না। (সেদিন রাত্রে কামিনী-বৌকে শ্যাম বলেছিল তিতাসীর সঙ্গে সখারামের বিয়ে হোক। বিয়েতে অমত করেছিল কামিনী-বৌ। তার পর থেকেই সখারামের সঙ্গে কথা কমিয়ে দিয়েছে শ্যাম।)

সখারাম বুঝতে পারছিল—শ্যাম কামিনী-বৌ সুখী বুড়ী, তিন জনের কেউ হয়তো তাকে আর চায় না। এ সংসারে তার হয়তো আর দরকার নেই। কিন্তু মুখ ফুটে এখন পর্যন্ত কেউ তাকে কিছু বলে নি। যত দিন তাকে কেউ কিছু না বলে, সে যাবে না। অপেক্ষা করবে। কামিনী-বৌর সঙ্গে কথাই আছে, যত দিন তারা সখারামকে ছেড়ে না দেবে, সে যেতে পারবে না।

এখন দুপুর। সূর্যটা ঠিক মাথার ওপর এসে উঠেছে। রোদটা খাড়াভাবে পড়ছে। যত দূর তাকানো যায়, আগুনের একটা হল্কা যেন তির তির করে কাঁপছে।

নদীর ওপার থেকে এইমাত্র সওয়ারী নিয়ে এপারে এল সখারাম। লগি পুঁতে নৌকোটাকে বেঁধে ফেলল। তার পর সওয়ারীর কাছ থেকে ভাড়া বুঝে নিয়ে হন হন করে তিতাসীদের বাড়ির দিকে রওনা হল।

বাড়ি এসে অবাক হয়ে গেল সখারাম।

সুখী বুড়ী, শ্যাম আর কামিনী-বৌ বসে রয়েছে। তিতাসীকে কোথাও দেখা গেল না। খুব সম্ভব সে বাড়ি নেই।

কামিনী-বৌ বলল, 'তোমার জন্যেই বসে আছি। আজ সবাই এক সমুগে খাব।'

দাওয়ার এক পাশে বসে পড়ল সখারাম। চড়া রোদে অনেকটা পথ হেঁটে এসেছে। মুখটা লাল হয়ে উঠেছে। দরদর করে ঘাম ঝরছে।

কোঁচার খুঁট দিয়ে কপালের আর ঘাড়ের ঘাম মুছল সখারাম। পাশে একটা হাত-পাখা পড়ে ছিল। সেটা নেড়ে নেড়ে হাওয়া খেতে লাগল।

অন্য অন্য দিন কামিনী-বৌরা আগেই খেয়ে নেয়। তার ভাত দাওয়ার এক কোণে ঢাকা দেওয়া থাকে। আজ তার জন্য সবাই বসে আছে। ব্যাপার কী, ঠিক বুঝে উঠতে পারল না সখারাম।

একসময়ে চারটে থালায় ভাত বেড়ে ফেলল কামিনী-বৌ। প্রত্যেকের সামনে একটা করে থালা এগিয়ে দিল। নিজেও একটা টেনে নিল।

খেতে খেতে কামিনী-বৌ বলল, 'তোমায় একটা কথা কইব।'

মুখ নামিয়ে ভাত খাচ্ছিল সখারাম। কামিনী-বৌর কথাটা সে খেয়াল করে নি।

কামিনী-বৌ আবার ডাকল, 'হেই গো—শুনচ?'

এবার মুখ তুলল সখারাম। বলল, 'আমায় কইচ?'

'হ্যাঁ।'

'কী?' জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে রইল সখারাম।

কী একটু ভাবল কামিনী-বৌ। মনের ভেতর কথাগুলিকে গুছিয়ে নিল। তার পর শুরু করল, 'কদিন তোমায় আটকে রাখলম। তোমার স্বভাব তো জানি। কোথাও দু দিন থির থাকতে পার না।'

সখারাম চুপ করে বসে রইল।

কামিনী-বৌ অল্প একটু হাসল। আবার শুরু করল, 'তোমায় কত কষ্ট দিলম। সোম্‌সারের সব দায় তোমার মাথায় চাপিয়ে দিয়েছিলম।'

অস্ফুট গলায় সখারাম কী বলল, বোঝা গেল না।

কামিনী-বৌ বলতে লাগল, 'তিতাসীর ভাই এখন ফিরে এসেচে। তার সোম্‌সারের দায় সে নিক। তোমায় আর কষ্ট দোব না।'

সখারাম এবার সুখী বুড়ী আর শ্যামের দিকে তাকাল। মুখ দেখে বোঝা গেল, কামিনী-বৌর কথায় তাদের সায় আছে।

কামিনী-বৌ তখনও থামে নি, 'মনে মনে তুমি হয়তো ঠিক করে রেখেচ, কোথাও যাবে। আমাদের জন্যে যেতে পারচ না। আর তোমায় ধরে রাখব না।'

সখারাম এবারও কিছু বলল না। কামিনী-বৌদের সংসারে তার প্রয়োজন শেষ হল।

॥ ৩৪ ॥

অন্য অন্য দিন দুপুরের খাওয়া চুকিয়ে মাঝিঘাটায় চলে যায় সখারাম। আজ আর সেখানে গেল না। অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে হাঁটতে আজান বুড়োর দোকানে এসে পড়ল।

এখন সূর্যটা পশ্চিমদিকে অনেকখানি ঢলে পড়েছে। রোদের রঙ বদলাতে শুরু করেছে। দিনের তাপ জুড়োচ্ছে। একটু পরেই বিকেল হয়ে যাবে।

আজান বুড়োর দোকানে ঢুকে দুই হাঁটুর ভেতর মুখ গুঁজে বসে রইল সখারাম। সামনের দিকে ইউনিয়ন বোর্ডের সড়ক। সড়কটায় লাল ধুলো উড়ছে। দূরে গেরুয়া নদীটা ঝিম মেরে পড়ে রয়েছে।

নদীর দিকে তাকিয়ে আছে সখারাম। মনটা ভারী উদাস হয়ে গিয়েছে। কামিনী-বৌদের সংসারে তার আর প্রয়োজন নেই। সখারাম ভাবতে চেষ্টা করল, এখন সে কী করবে?

অনেকক্ষণ সে ভাবল, কিন্তু কিছুই ঠিক করে উঠতে পারল না। একবার ভাবল, আজই এই মুহূর্তেই সে এখান থেকে চলে যায়। আবার ভাবল, দেখা যাক আর ক'টা দিন।

ভাবতে ভাবতে একটা কথা মনে পড়ল। কামিনী-বৌ, শ্যাম আর সুখী বুড়ীর কাছে তার প্রয়োজন হয়তো ফুরিয়েছে। কিন্তু তিতাসী এখনও তাকে কিছু বলে নি। তিতাসীকে এখনো সে বুঝতে পারে নি।

সখারাম স্থির করল, রানীর হাট ছেড়ে সে যাবে না। যত দিন তিতাসী তাকে কিছু না বলে, এখানেই থেকে যাবে। তিতাসীকে না বোঝা পর্যন্ত তার থাকতেই হবে।

পরক্ষণেই সখারাম ভাবল, থাকবে তো, খাবে কী? এতদিন যা রোজগার করেছে, সবই তো কামিনী-বৌকে দিয়ে দিয়েছে। তার নিজের কাছে একটা পয়সাও নেই।

হঠাৎ আরো একটা কথা মনে পড়ল সখারামের। এই রানীর হাটে আরো কয়েকটি মানুষ আছে যেমন হ্যালিডে সায়েব, লোটন, আজান বুড়ো, যারা তাকে চেয়েছিল। আজান বুড়ো অবশ্য বেঁচে নেই। তার কথা বাদই দেওয়া হোক। কিন্তু লোটন আছে, হ্যালিডে সায়েব আছে।

কামিনী-বৌ, শ্যাম আর সুখী বুড়ী—মাত্র তিনটি মানুষ তাকে আর চায় না। কিন্তু রানীর হাটের আরো অনেক মানুষ আছে, যাদের কাছে সখারামের প্রয়োজন এখনও হয়তো ফুরোয় নি। তাদের কাছেই যাবে সখারাম।

হ্যালিডে সায়েব কিংবা লোটন—যার কাছেই যাক, আশ্রয় একটা মিলবেই। এ ব্যাপারে সখারাম নিশ্চিন্ত।

তিতাসীকে বোঝার জন্য আজই তার একটা আশ্রয় দরকার। ভাবতে ভাবতে উঠে পড়ল সখারাম।

॥ ৩৫ ॥

সন্ধ্যের মুখে মুখে গির্জে-বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল সখারাম। হ্যালিডে সায়েবের ঘরে একটা হ্যারিকেন জ্বলছে। সুর করে বাইবেল পড়ছে সে। হ্যালিডে সায়েবের সুরে এমন কিছু আছে যা চৈত্রের এই সন্ধ্যেটাকে উদাস করে ফেলেছে।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সখারাম। তার পর আস্তে আস্তে ডাকল 'সায়েব খুড়ো—'

এক ডাকেই সাড়া পাওয়া গেল, 'কে?'

'আমি সখারাম—'

হ্যারিকেন নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল হ্যালিডে সায়েব। বলল, 'ভেতরে এসো।'

হ্যালিডে সায়েবের পিছু পিছু হাঁটতে শুরু করল সখারাম। একসময় তারা ঘরের ভেতরে এসে ঢুকল।

হ্যালিডে সায়েবের ঘরখানা সেই আগের মতই রয়েছে। তক্তাপোশে সেই

এলোমেলো ধামসানো বিছানা, টেবিলের উপর সেই স্তূপাকার বই, সামনের দিকে সেই খ্রীষ্ট মূর্তি। কোথাও এতটুকু পরিবর্তন নেই।

তক্তাপোশটার ওপর দু জনে বসল।

হ্যালিডে সায়েব বলল, 'অ্যাদ্দিন তোমায় দেখি নি যে—'

'নানা ধান্দায় জড়িয়ে ছিলম, তাই আসতে পারি নি।'

'তার পর এই সন্দেবেলায় কী মনে করে—'

'তোমার সন্‌গে কথা আচে।'

'কী কথা?'

'সেই যে তুমি বলেচিলে, তাতে রাজী আচি।'

'কী বলেছিলম?'

'আমায় লেখাপড়া শিখিয়ে তোমার ইস্কুলের ভার দেবে বলেছিলে—তোমার কাচে আমায় রাখবে।'

পরম আগ্রহে হ্যালিডে পাদ্রার মুখের দিকে তাকাল সখারাম। তার পর বলল, 'তোমার কাচে থাকতে এসেচি।'

'বড্ড দেরি করে ফেলেচ সখারাম। এখন আর তোমার দরকার নেই।' হ্যালিডে সায়েব বলল।

'কেন?' সখারামের গলাটা কাঁপল।

'দিন সাতেক হল ইস্কুল আর হাসপাতালটা জেলাবোর্ডকে দিয়ে দিয়েচি। ওরাই দেখাশোনা করবে।'

বিষণ্ণ গলায় হ্যালিডে সায়েব বলতে লাগল, 'তখন তোমায় কত করে বললম, তুমি এলে না। এদিকে মনের মতন একটা লোকও পেলম না। বয়েস হয়েচে, আগের মতন খাটতেও পারি না। কী করব, অনেক ভেবে জেলাবোর্ডকে ও-দুটোর ভার দিলম।'

'ও।'

অস্ফুট একটা শব্দ করল সখারাম।

অনেকটা সময় কেটে গেল।

একসময় শুকনো গলায় সখারাম বলল, 'আচ্ছা, তা হলে যাই।'

গির্জেবাড়ি থেকে সখারাম বেরিয়ে পড়ল। খুবই হতাশ হয়েছে সে।

হাঁটতে হাঁটতে চোরকাঁটা-ভরা মাঠটায় এসে পড়ল সখারাম। এই মুহূর্তে

কী করবে, কোথায় যাবে, ঠিক করে উঠতে পারল না।

বেশ খানিকটা রাত হয়েছে। চন্দনের পাটার মত গোল একটি চাঁদ দেখা দিয়েছে। উত্তর দিক থেকে ঝির ঝিরে হাওয়া দিয়েছে।

লক্ষ্যহীনভাবে খানিকটা ঘুরল সখারাম। হঠাৎ লোটনের কথা মনে পড়ল। তার কাছে গেলে নিশ্চয়ই আশ্রয় মিলবে।

আশায় ভর করে লোটনের বাড়ির দিকে পা চালিয়ে দিল সখারাম। একটু পর পৌঁছেও গেল।

রূপসী নদীর পার ঘেঁষে লোটনের ঘর। ওপরে গোলপাতার চাল, চার পাশে কঁ্যাচা বাঁশের বেড়া। সামনের দিকে ঝাঁপ।

ঝাঁপটা আটকানো রয়েছে।

বাইরে দাঁড়িয়ে সখারাম ডাকল, 'লোটন—হেই গো লোটন—'

'কে ?' ঘরের ভেতর থেকে একটা গলা ভেসে এলে।

'আমি।'

'আমি কে ?'

'সখারাম।'

'সখাদাদা, আরে দাঁড়াও—দাঁড়াও, ঝাঁপ খুলচি।'

খেয়ে দেয়ে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়েছিল লোটন। তাড়াতাড়ি উঠে টেমি জ্বালল। ঝাঁপ খুলে সখারামকে ভেতরে নিয়ে গেল। বলল, 'কোনদিন এস না। আজ হটাৎ যে এলে—'

'কথা আচে।'

একটু কেশে গলাটা সাফ করে নিল সখারাম। তার পর বলল, 'তুমি সেই যাত্রার দল খুলবে বলেছিলে। তার কী হল ?'

'নাঃ!'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল লোটন। করুণ গলায় বলল, 'সাধটা মিটল নি সখাদাদা। ঠিক করেচি, যাত্রার দল খুলব না।

'কেন ?'

'কেন আবার। দল খুলতে হলে টাকা তো চাই। নগদ পাঁচ শ টাকা দরকার। খেয়ার মাঝিগিরি করে আড়াই শ জমিয়ে ছিলম। আশা ছিল অমনি করেই বাকী টাকাটা যোগাড় করব। কিন্তক—'

'কিন্তক কী!' সখারাম শুধল।

'কেন, তুমি জান না ?'

'কী জানব ?'

'জমাবাবু খেয়ানৌকো বেচে এখেনে ঠেঙে চলে গেচে।'

একটু থেমে লোটন বলল, 'খেয়াপারানির চাকরিটা গেচে। যাত্রার দল খুলব বলে যে কটা টাকা জমিয়েছিলম, এখন তাই ভেঙে ভেঙে খাচ্চি। দল খুলব কী দিয়ে—

'ঠিকই তো।'

ফিস ফিস করে সখারাম বলল, 'আচ্ছা এবেরে যাই। তুমি শুয়ে পড়।' সখারাম বেরিয়ে এল।

আগে আগে দেখা হলেই লোটন তাকে বলত, একটা যাত্রার দল খুলবে। সখারামকে মূল গাইয়ে করে নেবে। তার কোন ওজর কোন আপত্তিই শুনবে না।

বড় আশা নিয়ে লোটনের কাছে এসেছিল সখারাম। তার ধারণা ছিল, এখানে আশ্রয় মিলবেই। কিন্তু নিরাশ হয় তাকে ফিরতে হল।

আজান বুড়োর দোকানের দিকে হাঁটতে শুরু করল সখারাম।

রাত আরো বেড়েছে। চাঁদটা মাথার ওপর এসে উঠেছে।

দু পাশে শিশুগাছের সারি। মাঝখান দিয়ে ইউনিয়ন বোর্ডের সড়ক। শিশুগাছের পাতার ফাঁক দিয়ে চিকরি-কাটা চাঁদের আলো এসে পড়েছে। সড়কটা কেমন যেন রহস্যময় হয়ে উঠেছে।

নদীর দিক থেকে হু-হু বাতাস ছুটে আসছে।

চলতে চলতে সখারামের মনে হল, চারপাশে কোথাও কিছু নেই। আকাশে চাঁদের আলো, দু পাশের শিশুগাছ, কিছুই দেখতে পাচ্ছে না সে। মনে হচ্ছে, চারপাশটা ফাঁকা, শূন্য। পায়ের তলায় যেন মাটি নেই।

এলোমেলো পায়ে হাঁটছে সখারাম। আর ভাবছে, রানীর হাটে আর তার প্রয়োজন নেই। আশ্চর্য! যতদিন দরকার ছিল, তাকে পাবার জন্য সবাই উন্মুখ হয়ে ছিল। আজ দরকার নেই। তাই কোথাও ঠাঁই হল না।

রানীর হাটের মানুষগুলির স্বরূপ বুঝে ফেলেছে সখারাম। শুধু একজন বাকী আছে। সেই একজন তিতাসী। তিতাসীকে এখনও বুঝতে পারে নি সে। তাকে বুঝতে পারলেই রানীর হাটের সবটুকু বোঝা হয়ে যাবে।

সখারাম ভাবল, কালই তিতাসীর সঙ্গে দেখা করবে।

একসময় আজান বুড়োর দোকানে এসে পড়ল সখারাম। আজ রাত্তিরে তার খাওয়া হল না।

তিতাসীদের বাড়ি গেলে অবশ্য খাওয়া মিলতে পারে। কিন্তু কোন্ মুখে সেখানে যাবে সে। আজ দুপুরেই তো কামিনী-বৌ তার সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলেছে।

টান টান হয়ে আজান বুড়োর মাচানের ওপর শুয়ে পড়ল সখারাম।

॥ ৩৬ ॥

বেহুঁশ হয়ে ঘুমোচ্ছিল সখারাম। বাইরে অনেকখানি বেলা হয়েছে। বেড়ার ফুটো দিয়ে সোনার তারের মত সরু রেখায় রোদ এসে ঢুকেছে। এককোণে মাকড়সারা জাল বুনেছিল। রোদ লেগে জালগুলো ফিনফিনে রেশমী সুতোর মত চিক চিক করছে।

বাইরে থেকে কে যেন ডাকল, 'শুনচ—'

সখারামের ঘুম ভাঙল না।

আবার ডাকটা শোনা গেল, 'শুনচ—হেই গো—'

এবার ধড়মড় করে উঠে বসল সখারাম! বাঁশের মাচানটা মচমচ করে উঠল।

একটু পর চোখ রগড়াতে রগড়াতে বাইরে বেরিয়ে এল সখারাম। দেখল, তিতাসী দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সখারাম অবাক হয়ে গেল। কাল রাত্রে সে ঠিক করেছিল, তিতাসীর সঙ্গে আজ দেখা করবে। আশ্চর্য, তিতাসী যে নিজেই তার কাছে আসবে এটা আশাই করতে পারে নি সে।

বিস্ময়ের ঘোর কাটতে বেশ খানিকটা সময় লাগল। একসময় সখারাম বলল, 'তুমি—'

'হ্যাঁ, তোমার সনৃগে কথা আচে।'

'কী কথা?'

'বা রে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা হয় নাকি? ভেতরে চল।'

দু জনে আজান বুড়োর দোকানে ঢুকে মাচানের উপর বসল।

দূরে গেরুয়া নদীটা স্থির হয়ে পড়ে আছে। দিনের প্রথম রোদ তার ঢেউয়ে ঢেউয়ে দোল খাচ্ছে।

সখারাম বলল, 'কী বলবে, বল—'

'কাল রাত্তিরে খেতে যাও নি কেন?'

'এমনি।'

সখারামের চোখের দিকে তাকিয়ে তিতাসী বলল, 'এমনি নয়, কী হয়েছে তাই বল।'

একটু চুপচাপ।

তিতাসী ফিস ফিস গলায় বলল আবার, 'বলো—'

'কী করে আর তোমাদের বাড়ি যাই?'

'কেন?'

'তোমার ভাই-বৌ আমার সন্‌গে সব সম্পক্ক চুকিয়ে ফেলেচে।'

একটু ভেবে আবার শুরু করল সখারাম, 'কাল দুপুরে য্যাখন খেতে গেলম, তোমার ভাই-বৌ বললে, আমাকে আর বেঁধে রাখবে নি। যেখেনে খুশি অ্যাখন যেতে পারি।'

অস্ফুট গলায় তিতাসী কী বলল, বোঝা গেল না।

'তোমাদের সোম্‌সারে আমার দরকার নি। যেখেনে আমার দরকার নি, সেখেনে্‌ কোন্‌ মুখে যাব?'

সখারাম বলতে লাগল, 'তাই ভাবচি, এখেনে ঠেঙে চলে যাব।'

'না।'

তিতাসীর গলাটা কাঁপল, 'তোমার যাওয়া হবে নি।'

তিতাসীর দিকে সামান্য একটু ঝুঁকে সখারাম বলল, 'কেন?'

'অ্যাদ্দিন আমায় দেখচ, তুমি কি কিছুই বোঝ না?' তিতাসীর গলাটা আবেগে গাঢ় অস্থির।

সখারাম কিছু বলল না। চুপ করে রইল।

ভাই-বৌ তোমার সন্‌গে সম্পক্ক চুকিয়ে ফেলেচে। কিন্তুক আমি তো ফেলি নি। কারু কাচে তোমার দরকার না থাক, আমার কাচে আচে।'

সখারামের একটা হাত ধরে তিতাসী বলল, 'কোনদিন তোমায় কই নি, আজ তোমায় কইচি, তুমি এখেনে থাকো।'

তিতাসীর হাতের মধ্যে সখারামের হাতটা ঘেমে উঠেছে। বুকের ভেতর অসহ্য কাঁপুনি শুরু হয়েছে। কাঁপুনির বেগটাকে কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না সখারাম।

অনেকক্ষণ আচ্ছন্নের মত বসে রইল দু জনে।

একসময় আচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়ে উঠল সখারাম। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, 'না, এখেনে থাকার উপায় নি। আজই আমি চলে যাব?'

'কেন?' গলাটা ভারি বিষণ্ন শোনাল তিতাসীর।

'কেন, তা বলতে পারব নি।'

কেমন করে সখারাম বলবে, রানীর হাটের সব মানুষকেই তার চেনা হয়ে গিয়েছে। একমাত্র বাকী ছিল তিতাসী। তার জন্যেই অপেক্ষা করছিল সে। আজ তাকেও বুঝে ফেলেছে সখারাম।

সবই যেখানে জানা হয়ে যায়, বোঝা হয়ে যায়, সেখানে কী মোহে পড়ে থাকবে সে? যা চেনা হয়ে যায়, তার জন্য কোন আসক্তিই নেই সখারামের। এখানে দু দিন, ওখানে দশ দিন, এমনি করে জীবনের অপার রহস্য বুঝতে বুঝতে সমুদ্রের দিকে চলেছে সখারাম।

রানীর হাটের রহস্য তার বোঝা হয়ে গেল। এখানকার জীবনে তার ভূমিকা শেষ হল।

হঠাৎ উঠে দাঁড়াল সখারাম। বলল, 'এবার আমায় যেতে হবে।'

একটু থেমে আবার বলল, 'একটা জিনিস চাইব, দেবে?'

'কী?'

'দিন কতকের জন্যে তোমাদের নৌকোটা নোব। কোথাও মাথা গোঁজার মত এট্টু ঠাঁই পেলেই পাঠিয়ে দোব।'

তিতাসী কিছু বলল না।

'আচ্ছা যাই—'

আজান বুড়োর দোকান থেকে বেরিয়ে পড়ল সখারাম। মাঝিঘাটার দিকে হাঁটতে শুরু করল। তিতাসীও পিছু পিছু এল।

মাঝিঘাটায় এসে তিতাসী আবার বলল, 'থেকে যাও ব্যাটাছেলে। অন্তত আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে যাও।'

তিতাসীর গলাটা ধরা-ধারা, দু চোখে দু বিন্দু জল টলমল করছে।

একবার তিতাসীর দিকে তাকাল সখারাম। তার পর নৌকোয় গিয়ে উঠল। তার রক্তের ভেতর থেকে সেই অস্থির বেদেটা বলল, চোখের জলে মজে যেও না।

সময় হয়েছে, এবার ভেসে পড়।

একটু পর নৌকোটা ছেড়ে দিল।

হেমন্তের প্রথম দিকে রানীর হাটে এসেছিল সখারাম। বছরের শেষে ঋতুতে চলে গেল।

উত্তর দিক থেকে জোর বাতাস দিয়েছে। নৌকোটা মাঝ নদীর দিকে চলেছে।

নৌকো বাইতে বাইতে সখারাম গান ধরল,

তুমি গুরু বিষম নদী,
পার-কূল তার পেতম যদি
সারা জীবন ভেসে ভেসে মরতম না।
হেই গো গুরু—
তোমার মনের খপর পেলম না।

তিতাসী মাঝিঘাটায় দাঁড়িয়ে রইল।

দক্ষিণে সমুদ্র। সখারামের নৌকোটা ভাসতে ভাসতে সমুদ্রের দিকে চলেছে।

—শেষ—